মুসলমান সমাজ

বাংলা নাটক

(১৮৫২-১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ)

ড. উষাপতি বিশ্বাস
অধ্যাপক নিস্তারিণী (মহিলা) মহাবিদ্যালয়, পুরুলিয়া,
প্রাক্তন অধ্যাপক রামসদয় কলেজ, হাওড়া

মুখার্জি পাবলিশিং
৮বি/২ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রকাশক	:	রাখালরাজ মুখোপাধ্যায় মুখার্জি পাবলিশিং ৮বি/২ টেমার লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯
প্রাপ্তিস্থান	:	এ. কে. ডিস্ট্রিবিউটর্স, পুরুলিয়া
প্রথম প্রকাশ	:	২০০০
প্রচ্ছদ	:	সুমন চক্রবর্তী
মুদ্রক	:	লক্ষ্মীনারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস কলকাতা- ৬
লেজার কম্পোজ	:	এম.সি. এন্টারপ্রাইজ কলকাতা-৪

।। উৎসর্গ ।।

আমার জীবনের সবার উর্দ্ধে —
যাঁদের প্রেরণা ও আশীর্বাদ
আমার জীবনে চির পাথেয়,
সেই পরম আরাধ্য 'পিতৃদেব'
স্বর্গীয় ডা. উপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস
এবং
পরম আরাধ্যা মমতাময়ী 'মা'
শ্রীমতি বিদ্যুৎলতা বিশ্বাস-এর
উদ্দেশ্যে নিবেদিত বিনম্র-শ্রদ্ধার্ঘ্য।

সূচিপত্র

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে বিশেষত বাংলা নাট্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মৌলিক গবেষণামূলক একটি গ্রন্থ 'মুসলমান সমাজ ও বাংলা নাটক' (১৮৫২-১৯৫০) প্রকাশিত হতে চলেছে। বিষয়টি নিয়ে এমন পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এ যাবৎ হয়েছে বলে আমার জানা নেই। লেখক ড. উষাপতি বিশ্বাস আমার ছাত্র, স্বভাবতই এ-গ্রন্থের মূল্যায়ণ আমার পক্ষে শোভন নয়। এর প্রশংসা বা নিন্দা করবেন সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা সমালোচকগণ। ছাত্রাবস্থা থেকেই শ্রীমান বিশ্বাসের কৌতূহল, আকাঙ্খা, নতুন বিষয় অনুসন্ধানে নিষ্ঠা আমি লক্ষ্য করেছি। গ্রন্থটিতে প্রায় শতবর্ষের বাংলা নাটকে বিধৃত মুসলমান সমাজের পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রত্যক্ষভাবে সহায়ক কোন গ্রন্থ তিনি পান নি। বিদগ্ধ পন্ডিতদের অনেক গ্রন্থ, গোঁড়া ও উদার হিন্দু মুসলমান সমাজ - বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ও উপদেশ অবশ্য এক্ষেত্রে তাঁর সহজাত প্রবণতাকে পুষ্ট করেছে।

গ্রন্থের শুরুতেই ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণে সমকালীন বাংলার বিশেষত: বাংলার মুসলমানের সমাজ-ধর্ম-অর্থনীতি-রাজনীতি-সংস্কৃতির গতিপ্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অনুসারে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে কাল ও দৃষ্টিভঙ্গির পাশাপাশি নাট্যধারার মূল্যায়ণ করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে সমকালীন সামগ্রিক পটভূমির রূপরেখা রয়েছে এবং আলোচিত নাট্যকার ও নাটকগুলি সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে তিনি এসেছেন।

শতবর্ষের পটভূমি ও সিদ্ধান্ত গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধিই করেছে। আলোচিত শতাধিক নাটকের বেশ কিছু নাট্যকার ও নাটকের খবর অনেকেই সেভাবে রাখেন না। সেই দুস্প্রাপ্য নাটকগুলো বিশ্লেষিত হয়েছে অত্যন্ত সর্তকতা ও ধীশক্তির সাহায্যে। লেখকের একক প্রয়াসে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে মূল নাটকগুলি পাঠ করেই তাঁর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত। দেখা যায় ১৮৭৬ পর্যন্ত নাটকে যুগ প্রভাবে মুসলমান 'সমাজ' অপেক্ষা 'রাষ্ট্রনেতিক দ্বন্দ্বে'র কথাই বেশী; মুসলমান বৈরিতাও কম নয়।

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কারণে সামগ্রিকভাবে নাট্যকারদের ঐক্য ভাবনাতেই মুসলমান মর্যাদা পেয়েছে। গিরিশচন্দ্রে মুসলমান চরিত্র (কালাপাহাড়) আশ্রয়ে সর্বধর্ম সমন্বয়ের ভাবনাও প্রকাশিত। বিশ শতকের শুরু থেকে ব্যক্তি ও শ্রেণী মুসলমান কর্তব্যপরায়ণ, সাচ্চা, ধার্মিক ও সুন্দর। ১৯২৩ পরবর্তী নাটকগুলোতে মুসলমান সমাজ আরো স্পষ্টরূপ পেয়েছে। বস্ত

অধ্যায়টিতে মুসলমান নাট্যকারদের নাটকের মুসলমান সমাজ-পরিচয় যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

একথা সত্য একত্রিশ জন হিন্দু নাট্যকার সকলে মুসলমান সমাজের যথাযথ বিবরণ সর্বদা দিতে পারেননি, গ্রন্থকার তা নানা তথ্য প্রমাণে দেখিয়েছেন। পাশাপাশি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের মৌলিকত্বের বিষয়, হিন্দু হয়েও তুলসী লাহিড়ীর মুসলমান সমাজ অভিজ্ঞতার যথাযথ ব্যাখ্যাও মূল্যবান। ন'জন মুসলমান নাট্যকারের আলোচনা এই সমাজকে জানতে বহুলাংশে সহায়তা করে।

উল্লেখ্য সব সমাজেই ভালো-মন্দ মানুষ থাকে, বাংলা নাটকেও আছে। নাটকে যেখানে যেমনটি রয়েছে তা সেভাবেই আলোচিত হয়েছে। লেখকের নির্ভীক লেখনী যথার্থ সত্যকে উদঘাটিত করতে সচেষ্ট হয়েছে, কোথাও আপোষ করেনি। সার্বিকভাবে, হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষ দেখা গেলেও সামাজিক ঐক্য ভাবনাই প্রবল, গ্রন্থটি পাঠ করলে তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

পরিশেষে, বাংলা ভাষায় রচিত নাট্যধারায় নব নব ভাবনার বিষয়টির বিস্তৃতি ও নাট্যকারদের প্রচেষ্টার অগ্রগতির রূপচিত্র পরবর্তী গবেষণার পথকে অনেকখানি সুগম করবে সন্দেহ নেই। গ্রন্থ শেষে গ্রন্থ-পত্রিকাদির তালিকা, পরিশিষ্ট অংশ ও সময়-সারণী গবেষক-পাঠককে আগ্রহান্বিত করবে। লেখকের প্রয়াস নাট্যক্ষেত্রে ও সাহিত্য অঙ্গনে নতুন দরজা খুলে দেবে বলে মনে হয়। গ্রন্থটি সুধী মহলে আদরণীয় হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

শ্রীমান ঊষাপতির এইটি প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। তাঁর গবেষক সুলভ মন আরো মৌলিক ভাবনাসমৃদ্ধ গ্রন্থ রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলুক — এই কামনা করি।

লেখকের কথা

বাংলা নাটকের উদ্ভবকাল থেকে দেড়শ বছরের বিকাশ-সমৃদ্ধি ও বিবর্তন ধারায় স্বতন্ত্র এক বিষয়—'মুসলমান সমাজ ও বাংলা নাটক" (১৮৫২-১৯৫০ খ্রীঃ)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি. এইচ. ডি. পাওয়া এই গবেষণাকর্মটি নব কলেবরে বেরোল। বাংলাদেশে ও নাট্যসাহিত্যে মুসলমান রয়েছে। মুসলমান চরিত্র, ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি, জীবনাদর্শ, শাস্ত্রনির্ভর জীবন চর্যা, নারী সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী, পারস্পরিক সম্বন্ধ, অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি মনোভাব ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ বাংলা নাটকে এসেছে। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে সার্বিক পর্যালোচনার অভাববোধ থেকেই আমাদের উপলব্ধির বহিঃপ্রকাশ।

বর্তমান গ্রন্থে প্রায় শতবর্ষের বহু সুলভ ও দুষ্প্রাপ্য নাটকের মুসলমান সমাজ আলোচনা স্থান পেয়েছে। নাটকে বিধৃত যথার্থ সত্যকেই তুলে ধরার চেষ্টা রয়েছে। ১৯৫০ পরবর্তী বাংলা নাটকে বিষয়টির আলোচনাক্ষেত্র বহুধা বিস্তৃত। আলোচিত নাট্যকারদের অধিকাংশই (৩১জন) হিন্দু এবং ৯জন মুসলমান, মুসলমান চরিত্র সহস্রাধিক। হিন্দু নাট্যকারের পক্ষে মুসলমান সমাজের সব বিষয় জানার কথা নয় (ব্যতিক্রম তুলসী লাহিড়ী), মুসলমান রচয়িতাদের সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। নাটকে প্রতিবিম্বিত রূপের সঙ্গে সমাজ বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য ও বহু গ্রন্থের সাহায্যে (পাদটিকা ও গ্রন্থ শেষে তালিকা রয়েছে) যথাসম্ভব একটা যথার্থ চিত্র তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছি। শ্রমসাধ্য, অন্বেষণলব্ধ বিষয়টির প্রতি সহজাত আকর্ষণেই এই প্রচেষ্টা।

গ্রন্থের সামগ্রিক বিষয় ৬টি অধ্যায় বিন্যস্ত। প্রথম অধ্যায়ে বাঙালী মুসলমানের সমাজ-ধর্ম-অর্থ-রাজনীতির একটা কালানুক্রমিক পটভূমির সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ আলোচনা রয়েছে। অধ্যায়টি আলোচ্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত সূত্রের প্রতি একটা ইঙ্গিতও বটে। পরবর্তী অধ্যায়গুলো বিশেষ কাল-ঘটনার ভিত্তিতে বিভাজিত। ষষ্ঠ অধ্যায়ে মুসলমান নাট্যকারদের নাটকগুলো স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে সমকালীন পরিবেশ পটভূমি এবং শেষে একটা উপসংহাররূপ সিদ্ধান্ত রয়েছে। মূল নাটকে ব্যবহৃত বানান এখানে গৃহীত হয়েছে।

গ্রন্থের অস্থি-মজ্জায় রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী, বাংলাদেশ হাইকমিশন লাইব্রেরী, অহীন্দ্র চৌধুরী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, ফেরদৌসিয়া মঞ্জিল (খোসশবাস পুর) এবং আমার একাধিক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ও শুভানুধ্যায়ীদের ব্যক্তিগত সংগ্রহের গ্রন্থ-পত্রিকাদির সাহায্য। বক্তব্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে অনেকেই প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন সাহায্য করেছেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য সৈয়দ আব্দুর রহমান ফেরদৌসী, সুধী প্রধান, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার অধ্যাপক ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (ইনিই বিষয়টির নামকরণ করেন), এবং আমার শিক্ষাগুরু অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু। অধ্যাপক বসু

আমাকে বইয়ের পাতা ওল্টানো শেখানো থেকে বারংবার স্নেহের ধমকে নানা উপদেশ -নির্দেশ দিয়ে পড়া-লেখার কাজকে তবান্বিত করিয়েছেন। আমার প্রাক্তন সহকর্মী অগ্রজ প্রতিম অধ্যাপক ড. অলোকনাথ পাঁজার অবদান অবর্ণনীয়। এই সুযোগে তাঁদের বিনম্র প্রণাম জানাই।

এছাড়া গ্রন্থ রচনায় অনেকেই কোন না কোন ভাবে সহযোগিতা করেছেন, প্রত্যেকের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। অনেকে আমার শিক্ষক, শিক্ষকতুল্য, আত্মীয়, ছাত্র-ছাত্রী এবং বন্ধুও অনেকে। সহকর্মীদের কথা বলাই বাহুল্য। অবশ্য সহযোগিতার পরিমাণ ও প্রকৃতি সর্বদা এক রকম নয়। নামের তালিকায় ভুল ও অতৃপ্তির সম্ভাবনা থাকাতে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও নামোল্লেখে বিরত রইলাম। অবশ্যই সকলের শুভেচ্ছা আমার পাথেয়।

সর্বাপেক্ষা বড় কথা—গবেষণা কর্ম অঙ্কুরিত পল্লবিত হত না, যদি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক আমার শিক্ষাগুরু পূজ্যপাদ ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের সানন্দ অনুমতি না পেতাম। শুধু আইনানুগ উপদেশই নয়, সার্বিক চিন্তা-চেতনা যুগিয়েছেন সর্বদা — কঠোর অথচ সুন্দরভাবে। এক্ষেত্রে আমার অনেক বিড়ম্বনা হাসিমুখে সহ্য করেছেন স্যারের সুযোগ্যা পত্নী শ্রীমতি জবা মুখোপাধ্যায়। এই অবসরে তাঁকে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করি। বিভিন্ন অসুবিধার মধ্যেও স্যার বক্ষমাণ গ্রন্থের 'ভূমিকা' লিখে দিয়ে গ্রন্থটার সৌষ্ঠব- গৌরব শুধু বাড়ান নি, আমাকে পুনরায় চিরঋণী করেছেন। শ্রদ্ধা বা প্রণাম জানিয়ে ভাষা দিয়ে তাঁর ঋণ লাঘব হবার নয়। তবুও জানাই আমার হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রণতি।

আমার প্রাণাধিকা একমাত্র কন্যা অঙ্কুরিতা সারা সপ্তাহে একদিন কাছে পেয়েও নিরন্তর ত্যাগ স্বীকার করেছে, বাবাকে নিভৃতে লিখতে দিয়ে; উৎসাহে-আনন্দে উদ্দীপিত হয়েছে সর্বদা। তাকে আমার প্রাণভরা আশীর্বাদ জানাই। আর একজন আমার বিশিষ্ট অতিথি — যাঁর আত্মত্যাগ, আকাঙ্খা, ধিক্কার প্রেরণা আমার সমস্ত পদক্ষেপে রয়েছে জড়িয়ে; তিনি ব্যতীত সমস্তই অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকত, তিনিই নেপথ্যের কারিগর। নাটকে নেপথ্যের একটা ভূমিকা থাকেই — তিনিও নেপথ্যেই রইলেন।

শেষকথা, শিল্পী সুমন চক্রবর্তী সানন্দে প্রচ্ছদ এঁকে গ্রন্থের মর্যাদা বাড়িয়ে আমাকে ঋণী করেছেন — এই সুযোগে তাঁকে ধন্যবাদ- অভিনন্দন জানাচ্ছি। তরুণ অথচ বিজ্ঞ প্রকাশক রাখালদা ও মুদ্রণ বিভাগের কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম না থাকলে গ্রন্থ প্রকাশে আরো বিলম্ব হত। চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণ প্রমাদ রয়ে গেল, সহৃদয় পাঠক নিশ্চয় তা ক্ষমার চোখেই দেখবেন। পরবর্তীকালে বাংলার সমাজ - সাহিত্য - সংস্কৃতিতে গ্রন্থটির সমাদর হলে আমার উদ্দেশ্য সার্থকতা পাবে।

সন্দীপন আবাসন

কলকাতা-৫৬

ফেব্রুয়ারি, ২০০৪

প্রথম অধ্যায়

বাঙালী মুসলমানের কালানুক্রমিক পটভূমি

বাংলার মুসলমান অধিকাংশই জন্মসূত্রে বাঙালী। তাঁদের পূর্বপুরুষ অনেকেই হিন্দু, মাতৃভাষা বাংলা। বহিরাগত মুসলমানরাও এদেশে দীর্ঘকাল বসবাস করে বাঙালীতে পরিণত। এই মুসলমানরা রাজনৈতিক রাষ্ট্রনৈতিক বিভাজিত নয় — বাংলাদেশ রাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, আসামের কাছাড়, গোয়ালপাড়া, বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া, সিংভূম, মানভূম, সাওঁতাল পরগণার কিছু অংশ, ঝাড়খণ্ড রাজ্যের কিয়দংশ এবং ত্রিপুরা রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত এর সীমা।[১] রাজনৈতিক কোন ছুরিতেই এর ভাষা ও সংস্কৃতির ধারা বিচ্ছিন্ন করা যায়নি, যাবেনা। এই বাংলার মুসলমান সমাজ-সংস্কৃতি ভারতবর্ষের সংস্কৃতির অঙ্গ।

বাঙালীর উদ্ভব বহু প্রাচীন — আর্যদের আগমণের পূর্বেই।[২] কয়েক হাজার বছরে এদেশে নানা জাতি-সম্প্রদায় এসেছে নানা কারণে, আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে। বহুকাল এদেশে অনেকেই বসবাস করে আপন স্বাতন্ত্র্য যেমন বজায় রেখেছে, তেমনি বর্জনও করেছে অনেক কিছু; গ্রহণও করেনি তা নয়। আর্য-শক-হূনদের পর ত্রয়োদশ শতক থেকে বাংলার ইসলাম ধর্মী মুসলমান, পরে ইংরেজ পর্তুগীজের আগমণ-অবস্থান। পাঁচশো বছর ব্যাপী মুসলমান সমাজে বাংলায় ঐশ্লামিক বিধি বিধানের প্রাধান্য সত্বেও রাষ্ট্রপরিচালনায় হিন্দুর ন্যায়-নীতি, সামাজিক আচারও শাসককে কিছুটা গ্রহণ করতে হয়েছে। হিন্দু-বৌদ্ধ ধারার সঙ্গে মুসলমান যুক্ত হয়েছে বাংলার সংস্কৃতিতে। বৈচিত্র্যময় ধারার মিশ্রণে ভারতীয় ঐতিহ্যের বিস্তৃতি। তবুও মধ্যযুগ থেকেই বাংলার প্রধান দুটি ধারা হিন্দু-মুসলমান।

বাংলার মুসলমানের সমাজ-সংস্কৃতি ইসলাম অনুসারী হয়েও এদেশীয়র সমীপবর্তী। 'ধর্মান্ধতা'র মধ্যযুগেও রীতি-প্রথায় পারস্পারিক বিরোধিতার মধ্যেও আপোষ মীমাংসা করে বাস করেছে হিন্দু-মুসলমান। সমাজ-সাহিত্যে তার অজস্র প্রমাণ রয়েছে। অথচ মুসলমানের ধর্ম 'ইসলাম'-যা কোরাণ হাদীস নির্ভর, কঠোর ধর্মীয় অনুশাসন নির্দেশিত। স্বভাবতই প্রাচীনতম হিন্দু-বৌদ্ধ -জৈন ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। তবুও তাঁরা পরিস্থিতি ও দেশ-কাল ভেদে মূল ইসলাম দর্শন থেকে কিছুটা সরে এসে এদেশের মতই আপনার সমাজ গঠন করেছে। আবার মূলতঃ কোরাণ নির্ভর স্বাতন্ত্র্যও বজায় রেখেছে। এর মূল বৈশিষ্ট্য খুব সংক্ষেপে এইরকম ঃ—

ক) ইসলামের ধাতুগত অর্থ 'শান্তি'; ইসলামের মূল বস্তু 'ঈমান' বা 'একিন' অর্থাৎ

১। বাংলাদেশের ইতিহাস - রমেশচন্দ্র মজুমদার, কলি-১৯৭৪

২। ঐ

দৃঢ় বিশ্বাস। এটি চার প্রকার—১। বিলগায়েব বা না দেখে বিশ্বাস, ২। আজনুল বা শুনে বিশ্বাস, ৩। ইনমূল বা পড়ে বিশ্বাস এবং ৪। আইনূল বা চোখে দেখে বিশ্বাস।[৩]

খ) আসল স্বরূপ-''লা এলাহা ইল্লালাহ মোহাম্মোদোর রসূলোল্লাহ''—অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ উপাস্য নেই। হজরত মহম্মদ তাঁরই প্রেরিত। সত্যিকার মুসলমান তিনিই, যিনি একে আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করেন।

গ) ইসলাম সাম্য-মৈত্রী ও উদারতার ধর্ম । মুসলমান সমাজে বর্ণভেদ নেই। কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলমান সমাজে নানা শাখা-প্রশাখা—শিয়া, সুন্নি, সরিয়ৎ, মারফৎ, তরিকত, হকিকত, নাজিহত, পীরিলী, ফকিরী প্রভৃতি দেখা যায়। উদারতা স্ব-সম্প্রদায়ে যতটা, অন্যত্র ততটা নয়।

ঘ) নারীর মূল্য ও অধিকার স্বীকৃত। নারীর প্রতি শ্রদ্ধা, পুত্র-কন্যা বিভেদ-হীনতা, বিধবাকে দয়ার দৃষ্টিতে দেখা ইত্যাদি। কিন্তু বাংলার মুসলমান সমাজ সর্বদা এর সঙ্গে সমতা রাখতে পারেনি।

ঙ) বিবাহে সাবালিকার মত দেবার অধিকার, ধর্ম- কর্ম-বিদ্যার্জনে-পিতার সম্পত্তিতে নারীর অধিকার স্বীকৃত। প্রয়োজনে নারী যুদ্ধক্ষেত্রে আর্ত সৈনিকদের সেবা করতে, যুদ্ধে যোগ দিতেও পারে।

চ) দাম্পত্যে বনিবনার অভাব দেখা দিলে 'ইসলামের বিধিমতে'[৪] স্বামী যেমন স্ত্রীকে 'তালাক' দিতে পারে, তেমনি স্ত্রীকেও বিবাহ বিচ্ছেদ করতে ইসলাম অধিকার দিয়েছে 'ইসমা' (ISMA) র[৫]।

ছ) ফকিরী ধর্মের উদারতা-জিকির বা ঈশ্বর চিন্তা, জাকাত বা দান ও সেবা, জেহাদ বা সত্য ধর্মের জন্য লড়াই-এ আসক্তি।

জ) ইসলাম মানুষকে যথার্থ মানুষ করার কথা বলেছে। প্রতিটি মুসলমান ব্যক্তিরা

৩। তৃপ্তি ব্রহ্ম-বাংলার ইসলাম সংস্কৃতি, কলি-১৩৯২।

৪। এছাড়া এবিষয়ে সবিস্তারে সাক্ষাৎকারে বলেছেন সৈয়দ আব্দুর রহমান ফেরদৌসি, ফেরদৌসিয়া মঞ্জিল, কান্দি, মুর্শিদাবাদ। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একত্রে বাস সমস্যা মনে হলে 'তালাক' দেয়া যায়। কিন্তু 'তালাক' উচ্চারণে আল্লাহর সিংহাসন পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। নিতান্ত বাধ্য হয়ে স্বামী একবার 'তালাক' উচ্চারণের ১মাস (ঋতুস্নান পর্যন্ত) অপেক্ষা, এর মধ্যে মিল না হলে ২ মাসে দ্বিতীয় বার, একই ভাবে তৃতীয় মাসে তালাক হলে তবেই তিন তালাক। এই তিন মাস স্বামী-স্ত্রী আলাদা থাকবে। এর মধ্যে বনিবনা হয়ে গেলে আবার মিলিত হতে পারে। তিন তালাকের পর আর নয়। তবে চুক্তি ব্যতিরেকে তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে দ্বিতীয় জন বা একই নিয়মে ঐ স্ত্রী পুনরায় পূর্বস্বামীর সঙ্গে নিকাহ্ করতে পারে। খোসবাসপুর বাসভবনে ১৮.১০.১৯৮৮

৫। সূরা ৬৫'র বলে 'ইসমা' ডির্ভোস হয়। এটা একই সঙ্গে তিনবার করতে পারে। "On drawing the marriage contract, how ever, or at any time later, the wife can be entitled by the husband to ask for divorce when she wishes, this right of the wife to divorce is called 'isma' " 'Muslim Religious Practices and how' by A. Muhammad of the Quran', Lebanon 1980.

রাষ্ট্রিক দুর্দিনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে পরপষ্পরকে সাহায্য করবে। ইসলাম বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসকে অনুমোদন করেনি। জন্মান্তরবাদ অস্বীকৃত। কিন্তু সাম্য ও বিশ্বপ্রেম ভাবনায় সকলে ভাই ভাই; মানুষ হিসাবে সকলে সমান।

ঝ) আনুষ্ঠানিক জীবনে তাঁদের 'ফরজ' বা অবশ্য কর্তব্য ৫টি, কলমা(শপথ), রোজা, (ঈশ্বর উপাসনা), নামাজ (ঐ), জাকাত (উপার্জিত আয়ের এক দশমাংশ দান), এবং হজ্ব (স্ব উপার্জিত অর্থে মক্কা দর্শন)। প্রথম তিনটির সকলের, শেষ দুটি আর্থিক সামর্থ নির্ভর।

ঞ) 'গুণাহ' থেকে দূরে থাকাও ফরজ। শাস্ত্র মতে গুণাহ হল—(১) খোদার সাথে অংশীদার করা, (২) নাক্কাহ বা অন্যায়রূপে নরহত্যা করা, (৩) পিতামাতাকে কষ্ট দেওয়া, (৪) মদ খাওয়া, (৫) অত্যাচার করা, (৬) অসাক্ষাতে অসন্তোষ জনক কথা বলা, (৭) খোদার শাস্তির ভয় না করা, (৮) প্রতিবেশী মেয়েদের প্রতি কুদৃষ্টি করা, (৯) প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা, (১০) সত্য গোপন করা, (১১) চুরি করা, (১২) সুদ খাওয়া, (১৩) অন্যায় বিচার করা, (১৪) অত্যাচারীকে তোষামোদ, (১৫) জুয়া খেলা, (১৬) ওজনে কম দেওয়া, (১৭) অন্যের দোষ অন্বেষণ করা ইত্যাদি। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধে ইসলামের আবেদন বিশ্বজনীন।

সমাজ কি? এনিয়ে পৃথিবী ব্যাপী বিভিন্ন ধারণা রয়েছে। আমরা মনে করি, মানুষ মানুষের প্রয়োজনে একটা সংস্থা-সম্পদ স্থাপন করে। যা একটা প্রয়োজনীয় প্রথা ও প্রণালীর সমবায়। অধিকাংশ লোকের যা ভালো, তাই করা হয় সমাজে। আমাদের আলোচ্য কালে (১৮৫২-১৯৫০ খ্রীঃ) সমাজ মূলতঃ প্রথমে সাম্রাজ্যবাদ নিয়ন্ত্রিত; একই সঙ্গে ধনতন্ত্রের পদ্ধতি প্রবর্তিত। আবার সমাজতান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থা চালিত —এ সমাজে একটা জটিলতা সৃস্টি করেছে। আগাগোড়া সামন্ততন্ত্রকে বাঁচিয়ে ক্যাপিটালিস্ট্‌কে ধরে একটা জটিল চরিত্র—এই দ্বৈত ভাব চলেছে।[৬] আমাদের আলোচিত নাটকে মধ্য ও আধুনিক যুগের এসব পরিচয় প্রায় সবই রয়েছে প্রত্যক্ষ, পরোক্ষভাবে।

তুর্কীনেতা বখতিয়ারের অতর্কিতে নবদ্বীপ দখলের সময় থেকেই (ত্রয়োদশ শতকের গোড়ায়) বাংলার মুসলমান শাসনের সূত্রপাত। কয়েক শতক পূর্বেই মুসলমান বনিক, ফকির দরবেশদের আগমণ ঘটেছে বাংলায়। পাঁচশ বছরের শাসনে নানা সুলতানদের অধিকাংশের আমলে বাংলা সুশাসিত হয়েছিল। আবার দৌরাত্ম্যের পরিচয় ও রয়েছে। ১৪৭৬-এর পর মোগল আমলে পুনরায় 'মাৎসন্যায়' চালু হলেও সাজাহান থেকে ঔরঙজেব পর্যন্ত (১৬২৬-১৭০৭) বাংলা মোটামুটি শান্তিতে ছিল।

৬। লবণহ্রদের বাসভবনে সাক্ষাৎকারে সুধীপ্রধান, ১৬.০৫.১৯৯০।

মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।* আবার আলীবর্দির পীড়ন ভারতচন্দ্র বর্ণনা করেছেন। সিরাজের প্রতি অত্যাচার, হাতির পিঠে তাঁর ছিন্নমুণ্ডর মিছিলের দৃশ্য বহু লক্ষ দর্শক প্রত্যক্ষ করেও প্রতিবাদ করেনি— ক্লাইভ তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে তা লিখেছেন। সিরাজ বা মীরকাসিমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী অধিকাংশই হিন্দু। পলাশীর যুদ্ধের ফল হঠাৎ নয়। সমরকৌশলের অভাব, স্বার্থপরতার চরম বিকাশ, রাজনীতিতে সাধারণ মানুষের উদাসীনতা, অসত্য, বিশ্বাসঘাতকতা, ক্রুরতা, বিলাস, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ইত্যাদি ছিল সমকালীন বাঙালীর স্বাভাবিক প্রকৃতি। হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই পৌরুষত্ব ও সৎচরিত্রের অভাবে বাংলার অধঃপতন ঘটে।[৭] তাই ইংরেজ দ্রুত বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

অন্যদিকে, ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহু পুরাতন। শুরু থেকেই গ্রাম ও কৃষি ভিত্তিক। লক্ষণ ধারাবাহিকতা, নমনীয়তা বা সহনশীলতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বা উৎকৃষ্ট সমস্ত কৃত্যই সংস্কৃতির অন্তর্গত। মানুষের পরিচয় তাঁর কৃস্টি ও সংস্কৃতিতে। আর বিভিন্ন কালের সভ্যতাই সংস্কৃতি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'সংস্কৃতি সমগ্র মানবের চিত্ত বৃত্তিকে গভীরতর স্তর থেকে সফল করতে থাকে। তার প্রভাবে মানুষ অন্তর থেকে স্বতঃই সর্বাঙ্গীন সার্থকতা লাভ করে'। ওসওয়াল্ড স্পেঙ্গলারের মতে সংস্কৃতি 'একটা জীবন্ত আঙ্গিক সত্তা'। মোতাহার হোসেন চৌধুরী বলেছেন-'সংস্কৃতি মানে সুন্দরভাবে, বিচিত্রভাবে, মহৎভাবে বাঁচা। সংস্কৃতির সঙ্গে সমাজ বা ধর্মের কোন বিরোধ নেই'। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—'বর্তমান ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য সামন্ততান্ত্রিক ও বুর্জোয়া সংস্কৃতির সংমিশ্রন পুষ্ট।'[৬ক] ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষ অঙ্গ বাংলার সংস্কৃতি। যা প্রাচীন-মধ্যযুগের ভাবধারায় পুষ্ট হয়ে 'গত সহস্র বৎসর ধরিয়া যে বাস্তব, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই 'বাঙ্গালী সংস্কৃতি'।[৭] বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও উভয়েই কিছু বৈশিষ্ট্য দেয়ানেয়ার মাধ্যমে বাঙালী সংস্কৃতিকে পুষ্ট করেছে। প্রমাণ ভাষা, পোশাকে, আচার-আচরণে, পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে, প্রথাগত নিয়মনীতিতে। কিন্তু যন্ত্রবিজ্ঞানের অগ্রগতি সত্ত্বেও গ্রামভিত্তিক সভ্যতায় ঔপনিবেশিক শাসনের পরবশ্যতা, স্বাধীনতার উত্তরকালেও ধর্মীয় বিশ্বাস, ঐশ্লামিক আচারে আবিষ্ট জনজীবনে রূপান্তর অনেক দেরীতে শুরু হয়েছে। এসব নানামুখী বিবরণ বাংলা নাটকে বিদ্যমান, আমাদের দৃষ্টিও সে দিকেই।

বাংলার মুসলমান-হিন্দু একই মাটির সন্তান। ধর্মের কারণে মুসলমান আরবী পারসী ঐতিহ্যেরও উত্তরাধিকারী সত্য, কিন্তু তাঁদের অধিকাংশের পূর্বপুরুষ হিন্দু, এই

* বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণ বিজয়, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্যচরিতামৃত, মুকুন্দব চণ্ডীমঙ্গল, বিদ্যাপতির কীর্তিকথা প্রভৃতি গ্রন্থাদি দ্রষ্টব্য।

৬ক। নাট্যকারের বাসভবনে সাক্ষাৎকার - ১১.০৬.১৯৮৯

৭। 'জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য' — সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলি-১৩৪৫

দেশের মানুষ। তাই ''রিলিজিয়ন ফলোজ দ্য ফ্লাগ'' অর্থাৎ ধর্ম রাজশক্তির অনুসরণ করে; রাজশক্তির সাহায্যেই ধর্মের উত্থান-পতন — বাংলাদেশে ইউরোপীয় এই প্রবাদ বাস্তবায়িত হয়েও এদেশীয় ঐতিহ্যের অংশীদার হয়েছে। যদিও নানাকারণে সঙ্গম বা সমন্বয় ঘটেনি। বরাবর স্ব-স্ব পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য রয়ে গেছে দুটি সমান্তরাল রেখার মতো। পলাশীর যুদ্ধ পরবর্তী মুসলমান শাসক থেকে শোষক শ্রেণীতে পরিণত। যুগ পরিবর্তনে সামাজিক রূপান্তরের অভাবে বাংলার মুসলমান পিছিয়ে পড়তে থাকে। তাই নগর কলকাতার প্রারম্ভিক পর্বে কিছু কাজ ছিল মুসলমানের একচেটিয়া —রাজমিস্ত্রী, খালাসী, দর্জি, কসাই, সহিস, ভিস্তির কাজ, খানসামা, বাবুর্চি, বই বাঁধাই, চামড়ার ট্যানারীর কাজ, ঘোড়া-গরু-ছাগল কেনাবেচার কাজ। অনেকে ধনীও হয়েছেন। কেউ মুসলমান ছাত্রদের কোলকাতার গৃহে রেখে পড়ার সুযোগ দিতেন।[৮] গ্রামেও বেশিরভাগ মুসলমান ক্ষেতখামার চাষবাস ইত্যাদি কায়িক শ্রমে নিযুক্ত। এরূপ অনেক মুসলমান চরিত্র বহু নাট্যকারের নাটকেই স্থান পেয়েছে।

এছাড়া, রাজ্য হারিয়ে ইংরেজের সঙ্গে শুরু থেকে শত্রুতা করতে গিয়ে, প্রথমদিকে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ না করে এবং উনিশ শতকে ওয়াহাবী, ফারায়েজী, আন্দোলন, মধ্যযুগীয় আরব সংস্কৃতিতে আস্থা স্থাপন করতে গিয়ে দুর্ভাগ্যকে বাড়িয়ে তোলে মুসলমান সমাজ। সৈয়দ এমদাদ আলী বলেছেন—আদর্শ নেতার অভাব, মানুষের অজ্ঞানতা, অশিক্ষা, ধর্মহীনতা, ভোগাসক্তি, অর্ন্তবিবাদ ইত্যাদি মুসলমান সমাজকে অজ্ঞতার দিকে নিয়ে যায়। নিজেদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। 'শিক্ষার অভাবে তাহারা দিন দিন পশুর অধম হইয়া যাইতেছে।[৯] সৈয়দ ইসমাইল প্রমুখ অনেকেই এমত পোষণ করেছেন।* মুসলমান সমাজে 'যুক্তিবাদিতার চাষ' একেবারেই হয়নি। মৌলিক ভাবনার মানুষ খুব বেশী জন্মাতে পারেনি। এর কারণ সামাজিক লক্ষ্যে দ্বি কিংবা ত্রি-মুখীনতা। সামাজিক, ধর্মীয়-রাজনৈতিক কারণে মুসলমান সমাজ তাই পিছিয়ে পড়ে। ইসলাম উদারতার ধর্ম হয়েও এদেশের মুসলমান সমাজে শ্রেণীতে একটা বিশেষ ভূমিকা নেয়।

বাংলার মুসলমান সমাজে শাখা-প্রশাখা আছে—প্রধান দুটি শ্রেণী শিয়া ও সুন্নি। অধিকাংশ সুন্নি ও হানিফী মতাবলম্বী। সুন্নি তাঁরাই যাঁরা হজরত মহম্মদের 'সুন্নৎ' অর্থাৎ আদর্শে বিশ্বাসী। এঁরা কোরাণ, হাদীস বিশ্বাস করেন ও তাঁর নির্দেশ

৮। 'কলকাতার মুসলিম সংস্কৃতি'—আব্দুল রউফ, কলি-১৯৮৯।

৯। 'উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা'—২য়খন্ড - ড. ওয়াকিল আহম্মদ, ঢাকা-১৯৮৩

* দ্রষ্টব্য 'নবনূর' ১৩১০ বৈশাখ, ইসলাম প্রচারক -১৯০৩ ডিসেম্বর পত্রিকা ফ্রডলি Twelve man of Bengal in the Nineth century, হাণ্টারের "The Indian Muslim", খোন্দকার ফজল রাব্বির "The Origin of Mahamadans of Bengal" প্রভৃতি গ্রন্থে অনেক প্রমাণ রয়েছে।

মেনে চলেন। এঁদের তিনটি সম্প্রদায়-সাফেরী, হাম্বলী ও মালিকী। বাংলার সুন্নিরা হানিফী মতেব — এরাঁও তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। ১. আসরাফ বা উচ্চশ্রেণীর বিশুদ্ধ মুসলমান, ২. আতরাফ বা মধ্যশ্রেণীভুক্ত, ৩. আজরাল বা নিম্নস্তরের মুসলমান। প্রথম শ্রেণীভুক্ত সৈয়দ, মোগল, পাঠান, সেখ সম্প্রদায়ভুক্ত। আরব থেকে আগত, ইসলামে দীক্ষিত মঙ্গোলীয়, ইরান ও পশ্চিম থেকে আগত সম্ভ্রান্ত বংশীয়। আবার হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়ে সেখ উপাধি প্রাপ্তও হয়েছেন অনেকে। এরা আতরাফ সম্প্রদায়ভুক্ত। বস্ত্র-ব্যবসায়ী, জোলা, মৎস্য-ব্যবসায়ী, চাকলাই, দর্জি, ফরাজী, পীরালী প্রভৃতিরা এই শ্রেণীর। অনেকে কৃষি, ব্যবসা বা লেখাপড়ায় বর্তমানে নিবিষ্ট। বিদ্যাগুণে এই শ্রেণীর অনেক শক্তিমান ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। এছাড়া হিন্দু রক্ষণশীল অংশের নির্যাতনে নমশূদ্র, পোদ, কৈবর্ত, তিওর, ধীর প্রভৃতিরা পীর দরবেশদের প্রভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে কৃষিজীবী মুসলমানে পরিণত। অনেকে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু হয়েও নানাকারণে মুসলমান হওয়ার পর বহুকাল হিন্দু আচারাদি কতকাংশ বজায় রেখেছিলেন, এরা পীরালী নামে চিহ্নিত। মুসলমান সমাজের আর এক প্রধান শ্রেণী 'শিয়া'। এঁরা হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর চতুর্থ খলিফা আলিকে একমাত্র খলিফা বলে স্বীকার করেন। এই শিয়া-সুন্নিকে কেন্দ্র করে মুসলিম বিশ্বে অনেক দ্বন্দ্ব সংঘটিত হয়েছে। বাংলায় সুন্নি প্রথমাবধি বেশী। হুমায়ুনের আমলে শিয়াদের প্রভাব বাড়ে। জাহাঙ্গীর, সাজাহান, ঔরঙজেব ছিলেন সুন্নি। আকবর শিয়া হয়েও শিয়া-সুন্নি কিছুই মানতেন না। বাংলায় এগুলি ছাড়াও মহম্মদী বা ফরাজী,ওয়াহাবী মুসলমানও রয়েছে।[১০] বাংলা নাটকে এই বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত মুসলমান চরিত্র দেখা যায়।

আবার মারিফত পন্থীরা শুদ্ধ জ্ঞানাচারী, অধ্যাত্মবাদী। এঁরা প্রেম-ভক্তির মাধ্যমে আল্লাহর ভজনা করেন। এঁরাই সুফী সম্প্রদায় নামে পরিচিত। সুফীরা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য দেখেন না। মহম্মদের মৃত্যুর দু'শো বছরের মধ্যেই মুসলমান সমাজে সুফীমত চালু হয়। এই "সুফীরাই বাংলার ইসলাম সংস্কৃতিকে দৃঢ়মূল করেন"।[১১] ইসলামের মূল ও প্রধান কথা—রোজা, নামাজ পালন করাই শরিয়ত। 'হকিকত'-এর বিশেষ শাখা। কোরাণের মূল অর্থ বুঝে নেওয়াই 'হকিকত'। 'তরিকত' ইসলামের পথ নির্দেশক। 'মারিফত'গুপ্ত বিদ্যায় ঈশ্বর সাধন পদ্ধতি। সুফীসাধনা দেহতত্ত্ব সাধনা। পণ্ডিত বর্গের অনুমান এঁরাই বাংলার বাউল সাধনার আদি প্রবর্তক। সুফীদের দুটি সম্প্রদায়—পীর ও ফকীর। তাঁদের মতে মানুষ ও ঈশ্বর, আদম ও

১০। প্রাগুক্ত ও পাদটিকা ৪, 'যশোর খুলনার ইতিহাস'-সতীশচন্দ্র মিত্র, আহমদ ছফাব-বাঙালী মুসলমানের প্রভৃতি ধর্ম গ্রন্থ।

১১। প্রাগুক্ত ও পাদটিকা ৩,

আল্লার মাঝে গুরুর অবস্থান-যদিও ইসলামে গুরুবাদ নেই। বাংলাদেশে সুফীদের প্রভাবেই হিন্দু-মুসলমানের মিশ্র জনপ্রিয় দেবতা 'সত্যপীরের' প্রতিষ্ঠা। এই মিলন ভাবনা রবীন্দ্রনাথও শিলাইদহে দেখাতে সচেষ্ট হ'ন ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর বাবুর্চি, খামসামা, লাঠিয়াল ছিল মুসলমান।[১২] মুসলমান সমাজে নানা ধারা-সম্প্রদায় সত্ত্বেও অন্ত ত দুটি সামাজিক সমানাধিকার রয়েছে—একই সঙ্গে খাবাবের ও একই মসজিদে একত্রে উপসনার অধিকার। বাংলা নাটকে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যত্র এই দৃশ্য দেখা যায়।

ক্রমশ ইসলাম অনুসরণে বাংলার মুসলমান আপন অস্তিত্বেব স্বীকৃতি লাভে সক্ষম হয়। আবার সুফীমতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে, বিরোধে, বিনিময়ে, সমন্বয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে জীবনপদ্ধতি, শিল্প-স্থাপত্যে স্থায়ী আসন করে নেয়। ধর্ম-সাহিত্য-শিল্প-স্থাপত্যে গড়ে ওঠা মিশ্র সংস্কৃতি দৃষ্ট হয়।[১৩] কলকাতার খানকাহ শরিফ, পীরের কবরস্থানের (অন্ততঃ২০টি) প্রতিষ্ঠা ও প্রভাব বিস্তর। বাংলাদেশে পীরস্থান সংখ্যা কম নয়। শিয়া-সুন্নির মহরমের উৎসবে তাজিয়া বের করা নিয়ে বিরোধ থাকলেও, তাজিয়ার মিছিল কলকাতাতে দাঁড় করিয়ে 'হায় হোসেন' ধ্বনিতে সব ধর্ম-বর্ণের মানুষকে প্রত্যক্ষ করায়। বাজি পোড়ানো নিষিদ্ধ হলেও মুসলমানের উৎসবে পটকার শব্দে কান পাতা দায় হয়। মিলনের উৎসব ঈদে সকল গোষ্ঠীর মুসলমান এক হয়ে যায়। হিন্দু-খ্রীষ্টানদের 'দাওয়াত' দিয়ে আপ্যায়ণ করা হয়। ইদানীং ঈদ উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোর ঝলকানি হিন্দু-মুসলমান মিলিত উদ্যোগে ঈদ প্রীতি সম্মেলন করছে। গড়ে উঠেছে লৌকিক 'ইসলাম'।[১৪] এসবের বিভিন্ন চিত্র বাংলা নাটকে রয়েছে।

অর্থ-রাজনৈতিক কারণে বাংলার মুসলমান যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলার পথে পিছিয়ে পড়েছে। দীর্ঘকাল একত্রে বসবাস, বিবাহাদির মাধ্যমে বিদেশী মুসলমানও এদেশকে নিজের করে নেয়। মুসলমান আমলের গোড়ার দিকে টাকা-কড়ি বাংলাতেই থাকতো, মোগল আমলে দিল্লী বা লাহোরে চলে যেত। জমিদার, সুবাদার, দেওয়ানদের শোষণে সামন্তরাও সর্বস্বান্ত হয়—এটা চলে ইংরেজ আমলের

---

* ফেরদৌসীর সাক্ষাৎকার।

১২। মজহারুল ইসলামের প্রবন্ধ গণশক্তি দৈনিক ১০জুন ১৯৯০।

১৩। 'সংস্কৃতির রূপান্তর' গ্রন্থে গোপাল হালদার — 'মন্দিরে মসজিদে, ভেতরে বাহিরে তার প্রমাণ আছে। তাজমহল হিন্দু রীতিতে গঠিত, মন্দিরে মতোই সেখানে দক্ষিণমুখো হয়ে প্রবেশ করতে হয়। আবার বাংলার কুঁড়ে ঘরের মতো মন্দিরের ছাদ খসলেই মসজিদের মতো গম্বুজ বেরিয়ে পড়ে।'

১৪। 'বঙ্গে সুফী প্রভাব'—এনামুল হক-১৯০৫। ''বাঙালার এই লৌকিক ইসলামের রূপ অতি চমৎকার ও কৌতুকাবহ। ইহাতে হিন্দু ধর্ম স্থান পাইয়াছে, বৌদ্ধ ধর্ম জায়গা করিয়া লইয়াছে এবং আর্য, অনার্য ও বৈষ্ণব বিশ্বাস প্রবেশ করিয়াছে।

পূর্বপর্যন্ত। যেটুকু বাকি ছিল ইংরেজ সেটুকু সম্পূর্ণ করেছে।[১৫] পলাশীর যুদ্ধের পর নামে মাত্র নবাব ও দ্বৈত শাসনে বাংলার অবস্থা হয় শোচনীয়। এতে যুক্ত হয় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। অনাচার, অত্যাচারে সারা দেশে যুগ সঙ্কট দেখা দেয়। তা থেকে মাথা তুলতে বহুকাল কেটেছে। নানা বিরোধ-যন্ত্রণায় নানা সম্প্রদায়ের সঙ্গে বাংলার হিন্দু মুসলমান আপনার জীবন ধারা গড়ে তুলেছে। কিন্তু উনিশ শতকের শেষার্ধে যেমন দেশপ্রেম, স্বাধীনতা আকাঙ্খা বৃদ্ধি হয়, তেমনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে জাতীয়ত্ববোধ কমতে শুরু করে। ইংরেজ শাসন সৃষ্ট শিক্ষিত শ্রেণীর চিন্তা ও কর্মে যে রূপান্তর আসে তাতে সাধারণ মানুষের কোন যোগ ছিল না। হিন্দু-মুসলমানেব সমাজ বিকাশও ছিল অসমান। এই বৈষম্যের কারণেই উভয় সম্প্রদায়ের সম্পর্ক জটিল রূপ নেয়। রাজনীতিতে তা প্রত্যক্ষ করা যায়।[১৬] ইংরেজ নিছক স্বার্থে প্রণোদিত হয়ে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টি করে, তা এদেশের মাটি থেকে নয়, সামাজিক আর্থিক কল্যাণ দৃষ্টি থেকেও নয়। এতে সামান্য সুযোগ মিলেছিল 'বাবু' শ্রেণীর। আসলে ইংরেজ আমলের বাংলার অর্থনীতি 'সুপরিকল্পিত শোষণের মর্ম্মভেদী ইতিহাস'। তবুও দেশব্যাপী নানা বিদ্রোহ আন্দোলনে জনরোষ উদ্দীপিত হয়। মুসলমান সমাজের একটা অংশ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আন্দোলনে লিপ্ত থাকে (উদাহরণ 'শরৎ সরোজিনী')। ১৮৫৭-র পর মুসলমানের অবস্থা ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ ভগ্নপক্ষ পাখীর মতো।[১৭] ইংরেজ আর্থিক নিপীড়নেই থেমে থাকেনি। রাজনৈতিক বিভেদ নীতিও গ্রহণ করেছিল।

অথচ, কোম্পানী আমলের শুরুতে ফৌজদারী কাজ মুসলমানের উপরেই ন্যস্ত ছিল। মুসলমানকে প্রীত করতে হেস্টিংস কলকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করেন। কিন্তু পরবর্তী কালে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও অর্থ-রাজনৈতিক কারণে এদেশের সাধারণ হিন্দু-মুসলমান শ্রেণীতে এক হয়েও নিজেদের 'সম্প্রদায়' হিসেবেই ভাবতে শুরু করে। শাসন নীতিও শোষণ নীতিতে নিঃস্ব মুসলমান ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান গ্রহণ না করে দারিদ্র্য ও বিস্তৃতির অতল গহ্বরে পৌঁছে যায়। নিঃস্ব ও পরাভূত মুসলমান যে শূণ্যতা তৈরী করে, হিন্দুরা সে স্থান দখল করে নেয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় এক শ্রেণীর মৌলানা-মৌলবীদের গোঁড়ামী।

সাহিত্য সমগ্র মনের প্রতিচ্ছবি, মনের পোশাকী রূপ। আমাদের বুদ্ধিযোগ্যতা শক্তির পরিচয় যেমন, তেমনি আমাদের দৈন্য, শক্তিহীনতা অযোগ্যতা ও অক্ষমতাকে বয়ে নিয়ে চলে সাহিত্য। জার্মান সাহিত্যিক শিলার বলেছেন-"It is Literature which can command the whole Nation" অর্থাৎ সাহিত্য সমগ্র জাতিকে শাসন করতে

১৫। 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস'—ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৬। ড. অমলেন্দু দে — সমাজ ও সংস্কৃতি-১৯৮১।

১৭। আব্দুল মওদুদ — 'মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ'-ঢাকা ১৯৬৯।

পারে। এদেশে হিন্দু-মুসলমানের সাহিত্য গড়ে উঠেছে মনের ঐক্য অনৈক্যর উপর ভিত্তি করেই। প্রমথ চৌধুরী 'প্রাচীনবঙ্গ সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান' গ্রন্থে লিখেছেন মুসলমান বাদশারা বাঙালীর সমাজজীবনে বিশেষ হস্তক্ষেপ করেননি, প্রমাণ বাংলা সাহিত্য। নইলে হিন্দু সমাজ ও সাহিত্য এতকাল টিকে আছে কি করে? মধ্যযুগে মুসলমান কবিদের দৃষ্টিতে বাংলা দেরীতে স্থান পেলেও তাতে ধর্মের আবশ্যিক যোগ নেই। তাই হিন্দি-বাংলা সাহিত্যে, রোমান্টিক রচনায় মুসলমান কবিরাই অগ্রণী। এ ধারার ভগীরথ রোসাঙ্ রাজ দরবারের কবিদ্বয় দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল। ফৈজুল্লার সত্য পীরের কাব্যিক বর্ণনাতেও আঠারো শতকের শেষে বাংলা কাব্যে, ধর্ম ও সংস্কৃতিতে হিন্দুমুসলমান ঐক্যের সাক্ষ্য রয়েছে।[১৮]

বাংলাদেশ হিন্দু-মুসলমানের। শুধু হিন্দু বা শুধু মুসলমানের নয়। বাংলা ভাষা 'হিন্দুয়ানী ভাষা' নয়—অনেক দিনে এই ধারণার উদ্ভব। পণ্ডিতদেরও এজন্য অনেক প্রবন্ধ লিখতে হয়েছে। মীর মশাররফ ১৯ শতকে 'আমার জীবনী' তে লিখেছেন- তাঁর পিতা বাংলা জানতেন না, বাংলা বিদ্যাকে বিদ্যা বলে মনে করতেন না। ড. মুহম্মদ শাহীদুল্লাহ আমাদের 'ভাষা সমস্যা' প্রবন্ধে মাতৃভাষা বাংলার পক্ষে যুক্তিনিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন। মৌলানা-মৌ দের ভুল মানসিকতাকে 'প্রলাপ উক্তি' বলতেও কসুর করেন নি। সতেজ, গুণান্বিত সেই ভাষার শব্দ ব্যবহর নিতান্তই যদি সত্য হয় এবং যদি শিব হয়, তবে তা সুন্দর—সেটাই সাহিত্য। কেন না সাহিত্য বিশ্বমানবের স্বজাতি, কাজেই তা অসম্প্রদায়িক। অথচ বাংলার মুসলমানরা সাহিত্যে মাতৃ ভাষাকে তুচ্ছ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সমাজতান্ত্রিক চোখে মানবতাবাদী বলেই মুসলমানের সমস্যা বিষয়ে জানতে সাহিত্যে গুরুত্বের কথা বলেছেন। অনেক পরে মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের একাংশ ইংরেজী শিক্ষায় গুরুত্ব দেন। কিন্তু তা শুধু উচ্চবিত্তের জন্য। সাধারণ মুসলমানের জন্য ঠিক হয় বাংলা ভাষা। এই মুসলমান সমাজ পরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে স্বীকৃতি দিয়েছে; সে জাতি 'মানুষ', শুধু হিন্দু-মুসলিম নয়।

মুসলমান সমাজ ভুল মানসিকতার কারণে শিল্প-সংস্কৃতি চর্চাতেও অনেক দেরীতে মনোযোগ দিয়েছে। ১৮৭৬-এ প্রথম মশারফ হোসেন পরিচালিত পাক্ষিক 'আজীবন নেহার' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। প্রথম প্রকাশিত বাংলা গদ্যের প্রমাণ 'উচিত শ্রবণ' (১৮৬০), মুসলমান রচিত প্রথম বাংলা উপন্যাসধর্মী গ্রন্থ 'রত্নবতী' (১৮৬৯)।[১৯] মুসলমান সম্পাদিত 'আখবারে ইসলামীয়া' (১৮৮৪), 'হাফেজ'(১৮৯৭), 'কোহিনূর'(১৮৯৮), 'ইসলাম প্রচারক' (১৮৯৯), 'নবনূর' (১৯০০), 'আলএসলাম'

১৮। সুকুমার সেন - ইসলামী বাংলা সাহিত্য, বর্ধমান ১৩৫৮।

১৯। রশীদ আল ফরুকী — 'বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান,' কলি-১৯৮৪।

(১৯১৫), মিহির, ইসলাম দর্শন, মোসলেম ভারত, মোসলেম হিতৈষী প্রভৃতি পত্রিকা বের হয়। পরবর্তী কালে ইসলাম ধর্ম, ইতিহাস হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি, জাতীয় উন্নতি, মাতৃভাষার সেবা ইত্যাদি স্থান পেতে থাকে পত্রিকা গুলোতে। 'আলএসলাম' পত্রিকাটি গল্প, উপন্যাস, নাটক বিষয়ে বিরুদ্ধ মতও প্রকাশ করত। তবে ধর্ম ও মুসলমানের গৌরবোজ্জ্বল অতীত নিয়ে রচিত প্রবন্ধাবলী মূল্যবান সন্দেহ নেই।[২০] সার্বিক নবচেতনা যুক্ত প্রথম সচিত্র 'সওগাত' মাসিক পত্রিকা উদার মানসিকতায় প্রকাশিত হয় ১৯১৮ তে। এখানে ধর্মচর্চা, সাহিত্যচর্চা, ব্যবসা, শিল্প জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারিত হতে থাকে। এ পথেই শাশ্বত বঙ্গের মিশ্র সংস্কৃতির ধারায় পত্রিকাটি এগিয়ে চলে মুসলমান হিসাবে নয়, পাকিস্থানী হিসাবেও নয়—বাঙালী হিসেবেই। পরবর্তীকালে মুসলমান সম্পাদিত কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত একাধিক নাটক বর্তমান গ্রন্থকে সমৃদ্ধ করতে সহায়ক হয়েছে।

সঙ্গীতে, শিল্পে মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক চর্চার সাক্ষ্য রাখলেও বাংলার মুসলমান সংস্কৃতি চর্চাকে ঠিকমত ধরে রাখতে পারেনি। তাই এখানে সঙ্গীত হয়েছে 'হারাম'। অথচ কথা-সুর-বক্তৃতা-নাচ-গান ভালো হলে তা 'হালাল' বা পুণ্য। তাই রক্ষণশীল বাধা সত্ত্বেও সঙ্গীত সম্মানের বস্তু হয়েছে। বাংলার অনেক উঁচুদরের মুসলমান গায়ক তাই আজও ইতিহাসে জ্বলজ্বল করেন। ফকিরী গান, মুর্শিদ্যা গানের মধ্য দিয়ে ধর্মতত্ত্ব, কোরাণ-হাদীসের বাণী, শরিয়তী বিধান গানের ভাষা পেয়েছে। মৌলবীদের এক শ্রেণীর প্রচার 'গান বাজনা হারাম, এসব গুনাহর কাজ, যারা করে তারা বেহেস্তে যেতে পারবে না'। এই বাধা সত্ত্বেও গান-বাজনা মুসলমান সমাজে থেমে থাকেনি। আবার ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকাতে মহিলাদের দ্বারা প্রথম নাট্যাভিনয়ও অনুষ্ঠিত হয়।[২১]

ত্রয়োদশ শতক থেকে বাংলা কাব্য সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক বিচিত্র ও ব্যাপক। উনিশ শতকে মধ্যভাগ থেকে কুড়ি শতকের ২য় দশক পর্যন্ত জটিল ও গুরত্বপূর্ণ। ঔপনিবেশিক যুগের জন্ম ও বিকাশে সাম্প্রদায়িকতাবাদ হাত ধরাধরি করে চলে। সাংস্কৃতিক জীবনে তা অন্তরায় হলেও বাঙালী সংস্কৃতি নিজস্ব ধারায় বহমান। এতে মুসলমানের অবদান কম নয়, কারণ 'Civilization' গ্রন্থের ক্লাইভ বেল অনুসারে বলা যায় "The Civilized man is made, not born" সংস্কৃতি কারো পৈর্তৃক সম্পত্তি নয়; সংস্কৃতি নিয়ে কেউ জন্মায় না। মনুযত্ব ও মানবজীবনের সাধনায় সংস্কৃতি এবং তা জীবনকে সুন্দর ও সুস্থ করতে পারে। এর কোনো সীমা নেই। মনুষত্বের উপর যে সংস্কৃতির ভিত্তি তার কোন ধর্মগত বা দেশগত রূপ থাকতে পারে না।[২২] তাই

২০। মহম্মদ নাসিরুদ্দিন — 'বাংলা সাহিত্যে সওগাত' ঢাকা-১৯৮৫।
২১। মুনতাসীর মামুন — 'উনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার' ঢাকা - ১৯৮৫।
২২। আবুল ফজল— 'সংস্কৃতি আমাদের উত্তরাধিকার'।

এদেশের সংস্কৃতিকে 'হিন্দু-মুসলমান' নামে পৃথক না করে বলা যায়—অন্যান্য ঐতিহ্যের সঙ্গে ইসলাম হিন্দু ঐতিহ্য মিশ্রিত ভারতীয় সংস্কৃতির এক বিশেষ রূপ বাঙালী সংস্কৃতি—এদেশের সংস্কৃতি। ১৯ শতকে প্রথমার্ধে কিছু দাঙ্গা হাঙ্গামা সত্ত্বেও হিন্দু-মুসলমান মোটামুটি 'বিদ্বেষহীন শান্তিকামী' প্রতিবেশী। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই ব্রিটিশের কূটকৌশলে হিন্দু-মুসলমান মানসে, শিল্প-সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা বোধ জন্ম নেয়। কিছু কিছু সাহিত্যিক রাজনৈতিক কারণে 'ইংরেজের' পরিবর্তে মুসলমানকে আশ্রয় করে। পরে উভয় সম্প্রদায়ের 'মসী' হয়ে দাঁড়ায় 'অসি'। ১৯ শতকের নবজাগরণের ঢেউয়ে নাট্যজগতে ইউরোপীয় মূল্যবোধ, যুক্তিবিদ্যাতে আস্থা রেখে নাট্যধারা এগিয়ে চলে। বাংলা নাটকে হিন্দু-মুসলমান ভিড় করতে থাকে।

সংস্কৃতি মানব জীবন ও রাষ্ট্রর দর্পণ স্বরূপ। সংস্কৃতির স্থায়ী রূপ সেই গোষ্ঠীর সভ্যতা। সংস্কৃতির অভিধানগত অর্থ সভ্যতা জনিত উৎকর্ষ। সভ্যতা সংস্কৃতিব দেহ বা বহিরঙ্গ। সভ্যতা সংস্কৃতির বাস্তব রূপায়ণ। আসলে আমরা যা, তাই আমাদের সংস্কৃতি। আমরা যা ব্যবহার করি তাই আমাদের সভ্যতা। সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতি মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতির বিকাশ। নাটক সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ। নাটক জাতির নিজস্ব চাওয়া, বেদনাকে স্বকীয় আঙ্গিকে তুলে ধরে।

সংস্কৃত নৃৎ বা নট্ ধাতু থেকে 'নাটক'এর জন্ম। সংস্কৃত সাহিত্য ছাড়াও প্রাকৃত সাহিত্যে, বাংলা ভাষার সৃষ্টিলগ্নে, মধ্যযুগের নট্ নাট্য, কুশীলব, নড়, ভান প্রভৃতি রূপে বিবর্তিত। কিন্তু মুসলমান আমলে বিভিন্ন কারণে[২৩] নাট্যচর্চা বিঘ্নিত হয় বা প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। শাসকগোষ্টীর অনীহাই মূলত এজন্য দায়ী। উনিশ শতকের মধ্যভাগে পাশ্চাত্য রীতি, সংস্কৃত ও ইংরেজী নাটকের প্রভাবে যাত্রা গানের মিশ্রণে তৈরী হয় বাংলা নাটক ।[২৪] এতে সমকালীন সমাজ নেতা, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিদ্যাসাগর প্রমুখের অবদান কম নয়।[২৫] নাট্যকার ভেতরের তাগিদে নাটক লেখেন যুগের দাবীকে স্বীকার করে নিয়ে। শ্রেষ্ঠ নাট্যকার আপন সৃষ্টির তাগিদে সমকালের সঙ্গে অতীত ভবিষ্যতের মিলন ঘটিয়ে তাঁর সৃষ্টির স্থাপত্য গড়েন। রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্মনীতি এগুলোর কোনটাই শিল্প বা নাটক সৃস্টির প্রতিকূল নয়। এ সমস্ত সন্ধির জটিল

২৩। 'নাট্যাভিনয় মানে পাপানুষ্ঠানের প্রশস্ত দ্বার স্বরূপ।.........এগুলি সাধারণত ব্যাভিচারাদি পাপের শিক্ষাক্ষেত্র' (ইসলাম প্রচারক ১৯০০ মার্চ-এপ্রিল)। 'মুসলিম আমলে বঙ্গদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায়ও নাটকের কোন স্থান ছিল না' ('সাহিত্য হিসাবে নাটক'—আব্দুল হক ঢাকা)।

২৪।। সুকুমার সেন —'নট নাট্য নাটক'-'নটবৃত্তি জাতিগত জীবিকা হলে এরপর বাংলাদেশে 'নট' জাতির সৃস্টি।

২৫। প্রথম চেষ্টা সংস্কৃত থেকে পঞ্চমবেদ নাট্যবেদের জন্ম- সুধী প্রধান। বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন মধুসূদন দত্ত প্রমুখেরা বাংলা থিয়েটারের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

অন্তঃক্রিয়া ও বহিঃক্রিয়ার প্রতিভাস নাটক।[২৬] বাংলা নাটক সৃষ্টির জন্ম লগ্ন থেকেই বিভিন্ন বাধা বিপত্তি এড়িয়ে আপন ঐতিহ্য বয়ে নিয়ে চলেছে আজও। কিন্তু বাংলার মুসলমান সমাজে নাট্যকের চর্চা গোড়ার দিকে প্রায় হয়নি। যাত্রা-গান-অঙ্কন অন্যান্য বিশেষ শিল্পকলা এক সময়ে এ সমাজে প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। দেরীতে হলেও মুসলমান সমাজ পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ শুরু করে। এঁরা অনেক বিদেশী গ্রন্থ অনুবাদ করলেও নাটক অনুবাদ করেননি অনেকদিন। আসলে 'যাত্রা থিয়েটার ইসলামে অননুমোদিত' এই ভুল বিশ্বাস থেকেই নাটক সম্পর্কে মুসলমান সমাজকে দূরে সরিয়ে রাখে; নিজেদের মানসিক বৃত্তিকে বিকশিত না করে সঙ্কুচিত করে রাখে।[২৭] কিন্তু নাট্যচর্চাকে চিরকাল দূরে রেখে দেয়নি মুসলমান সমাজ। পরবর্তীকালে হিন্দু-মুসলমান নাট্যকারের রচিত নাটকে-নভেলে মুসলমান চরিত্র-সমাজ ধর্ম স্থান করে নেয়, তার প্রমাণের অঙ্গস্বরূপ আমাদের আলোচ্য নাটক সমুদয়।

বাংলার সমাজ সংস্কৃতিতে পরিবর্তন ধারা যেমন অব্যাহত নাট্যধারাও তেমনি নানাভাবে বিবর্তিত। সামাজিক বৈষম্য, অর্থনৈতিক বিভেদ, বাধা, প্রশাসনিক স্তরে 'ড্রামাটিক পারফরমেন্স্ অ্যাক্ট' (১৮৭৬) এরমত বিভিন্ন আক্রমণ শতাব্দী ব্যাপী বাংলা সংস্কৃতি, বিশেষতঃ নাটকের উপর নেমে এসেছে। তবুও বাংলা নাটকে (১৯৫০ পর্যন্ত) হিন্দুর পাশাপাশি মুসলমান সমাজ চিত্র এসেছে বিভিন্নভাবে। উল্লেখ্য মুসলমান সমাজে ধর্মীয় (কল্পিত) বাতাবরণের গণ্ডী অতিক্রম করে হিন্দু-মুসলমান নাট্যকাররা মুসলমানকে নাটকে স্থান দিয়েছেন, স্বামী বিবেকানন্দ যেমন করে ইসলাম ও মহম্মদকে সম্মান জানিয়েছেন।[২৮] তবে সর্বত্র স্বামীজীর মত উদার যুক্তিবাদি মানসিকতা ব্যবহৃত হয়নি। আলো-আঁধারিতে সেই রূপচিত্র আবর্তিত-বিবর্তিত হয়েছে।

তাই দেখা যায় বাংলা নাটকে হিন্দু-মুসলমান চিত্রের ধারা দুটি— সংঘাত প্রধান ও মিলিত জীবন। পাঠান মোগল আশ্রিত নাটকে অধিকাংশই সংঘাতের প্রাধান্য। অবশ্য মোগল-পাঠান দ্বন্দ্বে হিন্দু-মুসলমান মিলিত হয়েছে। আবার স্বদেশী আন্দোলনের যুগে

২৬। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — 'শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রবন্ধ'।

২৭। 'মুসলমান সঙ্গীত চিত্রাঙ্কন ও অভিনয় প্রভৃতি একেবারে একঘরে করে রেখে জীবনকে পিউরিটান করে তুলতে ব্যস্ত। এই সমস্ত আর্ট চর্চায় যে মানসিক বৃত্তি বিকশিত হয় তা মুসলমান সমাজ বুঝতে রাজি নয়।' — আব্দুল রউফ - 'বাঙালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবন' ১৩৯৬।

২৮। স্বামীজী মুসলমান মাঝির কন্যাকে উমা রূপে পূজা করেছেন। তাঁর প্রথম শিষ্য সদানন্দ স্বামীজীকে দেখেছেন 'সূফীদিগের বর্ণিত প্রেমের আদর্শরূপে।' স্বামীজী সানফ্রান্সিসকোর প্রথম বক্তৃতায় (১৯০০খ্রী:) মহম্মদকে মানবজাতির 'ভ্রাতৃভাবের প্রচারক', 'সাম্যবাদের আচার্য' বলেছেন। মহম্মদের

হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য চিত্রই বিদ্যমান। অত্যাধুনিক কালে এই ঐক্যরই প্রাধান্য।[২৯] প্রথমদিকের সংঘাতে সমকালীন সমাজের যথার্থ প্রতিফলন অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। এযুগের সংঘাত উপরতলার শাসন ক্ষমতার দ্বন্দ্বাশ্রিত। পরে ঐক্য নট করতে সমকালীন ইংরেজ শাসকের নানা কৌশল — সৈন্যদলে বিভেদ সৃস্টি, ইংরেজ লেখকদের কাল্পনিক কৌশলের বিষ (টডের রাজস্থান কাহিনী, এলিয়টের ভারত ইতিহাসের ভূমিকা প্রভৃতি) বাংলার নাট্যকারগণ জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে গিলে ফেলেন। তাই অনেক সময় নাটকে অনৈক্য, সাম্প্রদায়িকতা, বিকৃত তথ্যাদি পরিবেশিত হয়েছে। তবে সর্বত্র যে একই চিত্র, তা নয়।

বক্ষ্যমান গ্রন্থের প্রায় শত বর্ষের বহু দুর্লভ ও সুলভ নাটকাদির ঘটনাতে মুসলমান সমাজ বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত। রচনাকার অধিকাংশই হিন্দু সমাজজাত। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা সঠিক ভাবে মুসলমান সমাজের সমস্ত বিষয় তুলে ধরতে অপারগ হয়েছেন সত্য। তবুও দু-একজন হিন্দু নাট্যকার ঐশ্লামিক অনুশাসনকে নিখুঁত ভাবে পর্যবেক্ষণেব চেষ্টা করেছেন। আবার ইচ্ছা-অনিচ্ছায়,পরিস্থিতির স্বীকার হয়ে ক্ষেত্র বিশেষে তাঁদের সৃষ্টির প্রতিফলিত রূপ বিকৃত হয়ে গেছে; তাও সত্য। অবশ্য মুসলমান নাট্যকারদের নাটকে (বেদ-পুরাণ-দর্শনের প্রভাব কোথাও কোথাও দেখা গেলেও) মুসলমান সমাজ সম্পর্কে বিবরণ মুসলমান সমাজ সঞ্জাতই। হিন্দু-মুসলমান চল্লিশজন নাট্যকারের শতাধিক নাটকে সহস্রাধিক মুসলমান চরিত্র ও তাদের সংলাপ, হিন্দু চরিত্রের সংলাপে, নাট্যঘটনা-পরিবেশে মুসলমান সমাজ চিত্র স্পষ্ট রূপ পেয়েছে। বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত বিষয়গুলোকে বিজ্ঞজনের মতামত সাপেক্ষে একটা পূর্ণাবয়ব রেখা চিত্রাঙ্কনের প্রয়াস রয়েছে। এপর্যন্ত বক্তব্যগুলো নাটকগুলোর বিভিন্ন ক্ষেত্রেই দৃষ্ট হবে।

ধর্মের ভালত্ব, স্থায়িত্বকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। 'বিবেকানন্দ সমকালীন ভারতবর্ষ' -৫মখন্ড - অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু।। লিখেছেন- 'রামমোহনকে বাদ দিলে ১৯ শতকের হিন্দুনেতাদের মধ্যে স্বামীজীর মতো মুসলমানদের সঙ্গে সম্পর্ক আর কোন হিন্দু নেতার ছিল কিনা সন্দেহ; এবং সেক্ষেত্রে তিনি যে সাহস ও যুক্তবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, তা সমাজসংস্কারকও দিতে সমর্থ ছিলেন না।' পৃষ্ঠা ৩৮১-৯০।
২৯। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় - নাট্যচিন্তা : শিল্প জিজ্ঞাসা' - ১৯৭৬।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১৮৫২-৭৬ পর্যন্ত নাটকাদির বিষয়কেন্দ্রিক আলোচনা

আলোচ্য পর্বে বঙ্গদেশের বাস্তব জীবনযাত্রার সঙ্গে কিঞ্চিত পরিচিতি প্রয়োজন। কেননা নাটক সেই শিল্প, যার মঞ্চ কালের, জাতীয় জীবনের বাস্তব প্রতিফলনের শ্রেষ্ঠ আধার। জাতীয় মানসিকতাকে প্রত্যক্ষভাবে সাধারণ-অসাধারণ জনমানসের সামনে তুলে ধরা সম্ভব নাট্য মঞ্চের নাটক দিয়েই। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে এই সময়টা কেমন ছিল? মধুসূদন মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন যে-উনিশ শতক জাতিগঠনের যুগ, জাতীয় রুচির উপর জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি। দীনবন্ধু মিত্রও তা উপলব্ধি করেছিলেন। এ দুজনই এপর্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। শিবনাথ শাস্ত্রী ''রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'' গ্রন্থে উনিশ শতক কে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। তৃতীয় পর্যায়কে (১৮৫৫-৬১) বলেছেন বিদ্যাসাগরের যুগ। এ সময়ের বিধবা বিবাহ আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ, নীলকরদের অত্যাচার- 'হিন্দু পেট্রিয়টে' তাদের বিরুদ্ধে হরিশচন্দ্রের লেখা, ঈশ্বরগুপ্তের তিরোভাব, মধুসূদনের আবির্ভাব, নীলদর্পণের প্রকাশ, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ এবং নবশক্তির সঞ্চার প্রভৃতি ঘটেছিল। এছাড়া ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'র প্রকাশ, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের আবির্ভাব, বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয়, হিন্দুমেলার অধিবেশন, ১৮৭২-এ সাধারণ রঙ্গমঞ্চে নীলদর্পণের অভিনয় দিয়ে দ্বারোদঘাটন ইত্যাদি বিচিত্র ঘটনায় বঙ্গ দেশ পরিপূর্ণ। ১৮৭০-এ প্রেস আইন, পাটনায় কৃষক বিদ্রোহ, তিন আইন পাশ প্রভৃতি ঘটনার মাঝে উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটক কে কেন্দ্র করে শাসক ইংরেজের 'Dramatic Perfarmance Act 1876' পাশে নাটকের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা। তবুও এই কালে বাংলার নাট্যকাররা অনেক নাটক রচনা করেছেন।

আধুনিক মানসিকতার 'উষালগ্নকাল' মধুসূদনের কাল। জীবনের বিচিত্র মুখী সম্প্রসারণ একালের স্বরূপ ধর্ম। সাহিত্যেও নব নব আঙ্গিকের দাবী অপরিহার্য। তাই বাংলা নাটকেও এ-পর্বে সামাজিক নানা বিষয়ের সাথে মুসলমান সমাজও জায়গা করে নিয়েছে। এসময়ে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সাহিত্যের মাপকাঠিতে—সিপাহীবিদ্রোহে হিন্দু-মুসলমান ও ইংরেজের সম্পর্ক জটিল। বঙ্গসাহিত্যেও তার প্রভাব পড়েছে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) কাব্যের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে হিন্দু জাতীয়তাবাদের বীজ রোপিত হয়।[১] সাহিত্যের অন্য শাখাতেও সে প্রমাণ আছে। তবে নাটকে মধুসূদন সমকালীন সামাজিক নক্সা রচনার ভিড়ে নতুন দৃষ্টিকোণে উদার মানসিকতায়

১। মহঃ মনিরুজ্জমান —''আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক'' - ঢাকা-১৯৮৫।

১৮৫৯ এর ৮ই মে-র পর[২] লেখেন দুটি প্রহসন। তাঁর সৃস্টিতে মানবজীবনের অপার মহিমা নিরীক্ষিত হয়েছে। তাঁর চিঠিপত্র, প্রবন্ধে সে প্রমাণ বিস্তর। তবে মধুসূদনের পূর্বেই বাংলা নাটকে মুসলমান সমাজের পরিচয় বিদ্যমান ছিল।

১. শ্রী নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধির নাটকে মুসলমান চিত্র ঃ

বাংলা নাটকের সূচনা ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ হলেও ১৮৫৮ তে শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধির 'কলিকৌতুক' নাটকে প্রথম মুসলমান সমাজ পরিচয় দৃষ্ট হয়। যদিও এখানে 'সমাজ' সেভাবে উল্লিখিত হয়নি, নাট্যছলে কলির শুরু থেকে বর্তমান কালের ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নাটকের বিষয়। কলির পাপাচারের নগ্নরূপ দেখানোই উদ্দেশ্য। পরীক্ষিৎ বুদ্ধ, চৈতন্য, কৌলীন্য প্রথা, নেড়া-নেড়ী, সাঁই, মুসলমানের ভারত আক্রমণ, মোজেস দলের ভারত বিজয় প্রভৃতি[৩] তে গিয়ে নাট্যশক্তি ক্ষুন্ন হয়েছে। পয়ার ত্রিপদী, চৌপদী ছন্দের প্লাবন ও অশ্লীল আলোচনার নাটকে রয়েছে বর্তমান বিষয়ের কিছু রসদ।

নাটকটির অভিনয়ের সংবাদ নেই। প্রস্তাবনাতে মহারাজ সমীপে ঋষিদের গানে "ম্লেচ্ছ প্রায় আচরিবে সব প্রজাগণ" — হবে 'ধর্মনাশ'। স্বভাবতই "গরু কান্নাকাটি" করছে কারণ 'নীচ জেতে' (মুসলমান) তাদের "ভোগ করবে"। স্পষ্টই মুসলমান রাজত্বে গোমাংস ভক্ষণকারী মুসলমানদের ভারতেই "গাইটির কান্না"। তৃতীয় অঙ্কে রতিদের উৎফুল্ল দেখে ব্যঙ্গ "মুরগীর তেল বাঁধলেই সে মোল্লা পাড়ায় যায়", কিংবা মুসলমান আগমণে 'ম্লেচ্ছ সৈন্যের হিন্দুস্থান জয়' স্থান পেয়েছে নাটকের পঞ্চমাংকে।

২. মধুসূদন দত্তর নাটকে মুসলমান ঃ

গল্পের মতই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন মাইকেল জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু। বেলগাছিয়াতে "রত্নাবলী"র মহড়া দেখতে গিয়ে বন্ধু গৌরদাসকে "অকিঞ্চিৎকর নাটকের" পিছনে অর্থব্যয়- এর জন্য আক্ষেপ করে বলেন — "ভালো নাটক? আচ্ছা আমিই রচনা কবির।" বাংলা না জানা মধুসূদন কয়েকদিনে বাংলা সংস্কৃত পড়ে 'শর্মিষ্ঠা'র পান্ডুলিপি দেখিয়ে সকলকে বিস্মিত করলেন এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে "শর্মিষ্ঠার অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ করিলেন।[৪] পরপর লিখলেন বেশ কয়েকটি নাটক, আমাদের আলোচ্য তাঁর দুটি প্রহসন।

'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০) মধুসূদনের প্রথম প্রহসন। ইয়ং বেঙ্গল' অভিধেয় নব্যযুবাদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরাই এর উদ্দেশ্য। প্রহসনের ঘটনা ও চরিত্র চিত্রণ বাস্তব, যেন সুপরিচিত ও দৃষ্টপূর্ব— হোটেলের খাদ্যবাহক মুটিয়া হইতে আদর্শ

২। দর্শন চৌধুরী — 'উনিশ শতকের নাট্য বিষয়-১৯৫০।
৩। সত্যজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় — দৃশ্যকাব্য পরিচয়-১৯৫০।
৪। যোগীন্দ্রনাথ বসু - মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত - ১৯৭৮।

ইয়ং বেঙ্গল নবকুমার পর্যন্ত সকলেই যেন মূর্তিমান সজীব এবং ক্রিয়াশীল।[৫] এখানে মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছে দুটি চরিত্র 'মুটিয়াদ্বয়'। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে নানা পানীয় বহনকারী দুজন মুটিয়ার সংলাপে হিন্দুর অর্থ-সামাজিক অবস্থার বর্ণনা রয়েছে। পাশপাশি অবস্থার চাপে পড়ে এই দুই শ্রমজীবির 'হেঁদু' ব্যাটার·মাল টানতে টানতে 'গর্দানটা' বেঁকে যাচ্ছে। পরিশ্রমের ক্লান্তি থেকে মুক্তি পেতে একদা 'রাজার জাত' বাস্তব সত্য প্রকাশ করেছে— "ওরা না মানে আল্লা, না মানে দ্যেবতা। ....ব্যাটারগো দৌলতে মোগর পোঁচঘর (পশুবধের কেন্দ্র) এত ফেঁপে ওট্‌তেছে।" এরাই তাদের অন্নদাতা আজ। উইলিয়ম হান্টার বা ব্রাডলি বার্টের সমকালীন মুসলমানের অবস্থা বর্ণনার সাক্ষ্য এরা। সমাজে 'অবনতি ও অবক্ষয়ের' বাস্তব চিত্র স্পষ্টরূপ পেয়েছে। এছাড়া ভাষার ক্ষেত্রে মোল্লা, কসবী, সাকী, মহল্লা প্রভৃতি আরবী ফারসী উর্দু শব্দাবলীর ভিড়ে চরিত্রের বক্তব্যে ভিন্ন সমাজগত প্রভাব দেখা যায়।

দ্বিতীয় বা শেষ প্রহসন 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'পূর্বনাম ভগ্ন শিবমন্দির' (১৮৬০)। এখানে তৎকালীন সমাজের বকধর্মী প্রৌঢ়ের কু-চরিত্রের দিকটি স্পষ্টরূপ পেয়েছে, মধুজীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসুর কথায় জানা যায় — তখন কলকাতা ও আশেপাশে কিছু প্রতিপত্তিশালী বাইরে মালাজপ, গোপনে বারাঙ্গনা সঙ্গতে নিত্য জীবন যাপন করত। এই শ্রেণীর লোকেদের মুখোশ খুলতেই প্রহসনটি রচিত। প্রহসনের বিষয়ে দুটি মুসলমান চরিত্র — গ্রামের গরীব প্রজা হানিফ ও তার স্ত্রী ফতেমা' এছাড়া অন্যান্য চরিত্রের মুখেও মুসলমান সমাজচিত্র স্পষ্ট। এই হানিফ পূর্বালোচিত অর্থনীতিতে নিপীড়িত মুসলমান সমাজ জাত কৃষক প্রতিনিধি।

হানিফের সংলাপেই প্রহসনের সূচনা। সংসার চালানোর সমস্যা মাথায় নিয়ে শ্রম ও আল্লার প্রতি নির্ভরতা সত্ত্বেও অনাবৃষ্টির জন্য ভক্তপ্রসাদকে খাজনা শোধ করতে পারছেনা। "পিরির দরগার ছিন্নি" দিয়েও "কিছুতেই হয়ে উঠল না। .... খোদাতালার মর্জি।" ভক্ত প্রসাদকে 'সালাম' জানিয়ে খাজনা মাপ চেয়ে তিরস্কৃত হয়েছে। কিন্তু চাকর গদাধরের নিকটে হানিফের সুন্দরী স্ত্রীর খবর পেয়ে খাজনা মাপ করেছে। কর্ত্তাবাবুর কু-অভিষন্ধি জেনে স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিতে বলে—"(সরোষে) এমন গরুখোর হারামজাদা কি হিঁদুদের বিচে (মধ্যে) আর দুজন আছে? .... বেটা কাফেরকে আমি গরু খাওয়ায়ে তবে ছাড়বো। বেটার এতবড় মকদুর (দুঃসাহস) আমি গরিব হলাম বল্যে বয়ে গেল কি? আমার বাপ দাদা নওয়াবের সরকারে চাকরী করেছে, আর মোর বুন কখনো বারয়ে গিয়ে তো কসবিগিরি (বেশ্যাবৃত্তি) করেনি।" ভক্তপ্রসাদ প্রেরিত "কুটনীমাগী" পুঁটির উপর ক্রুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু পরে হানিফ ফতেমা শয়তানের উচিত শিক্ষার মতলবে পুঁটির কাছ থেকে টাকা নিয়ে রাজি

৫। 'ঐ'

হয়েছে। আক্ষেপ- ক্রোধ ও শঙ্কায় হানিফ — " হা আল্লা, এ কাফের শালা কি মুসলমানের ইজ্জত মারতে চায়। .... দেখিস ফতি, ...তুই সমঝে চলিস্; বেটা বড় কাকের, যেন গায় টায় হাত দিতি না পায়"। এখানে ভক্তপ্রসাদের চরিত্রের পাশপাশি, হানিফের হতাশা 'হা আল্লা' ধ্বনিতে প্রকাশিত, তার মুখেই ১৯ শতাব্দীর আর্থ-সমাজ-রাজনীতির বিবর্তনে মুসলমান সমাজ কাঠামোর বাস্তব ইতিহাস স্পষ্ট।

আবার গরীব হিন্দু বাচস্পতির সাহায্যে স্বামী-স্ত্রীর প্রতিশোধ স্পৃহা বাস্তবায়িত হয়েছে। ২/২ গর্ভাঙ্কে রাতের আঁধারে হানিফ বাচস্পতি এসে পৌঁছেছে 'ভাঙ্গা মন্দিরের দিকে'। যেখানে ভক্তপ্রসাদ 'যবনী' ফতেমাকে প্রেম নিবেদনে উন্মুখ। সাদা কাপড় চাপা দিয়ে ভক্তপ্রসাদকে মনের মত পিটিয়ে ভূতরূপী হানিফ বিদায় নিয়েছে। পরে স্বাভাবিক বেশে "ফতিরি তাল্লাস" করতে এসে বলেছে—"আপনার যে মোছলমান হতি সাধ গেছে জানলে" ফতির চায়েও সোনার চাঁদ এনে দিতাম। এসব কথা "জাত কুটুমগো কতিই হবে"। বিপদগ্রস্ত ভক্তপ্রসাদ এসময় বাচস্পতির সাহায্যে বাঁচতে চায়, হানিফ ও বাচস্পতি ২০০ টাকা দাবী করলে ভক্তপ্রসাদও সম্মত হয়েছে। চরিত্র বলে, সারল্যে ও সরল মানসে বাংলা নাটকে হানিফ গাজী একট বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছে। বন্য বর্বর পৌরুষ ও ঋজুদৃঢ় সরলতার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। পরে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের তোরাপ হানিফের উপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। যদিও হানিফ তোরাপ এক নয়।[৬]

অন্যদিকে হানিফের স্ত্রী ফতেমাও স্বল্প পরিসরে স্বাভাবিকত্বে উজ্জ্বল। সহজ, সরল, নিষ্পাপ গৃহবধূ, কুলনারী স্বামী ও সমাজের ভয়ে পুঁটির কু-প্রস্তাবে আড়ষ্ট, ভীতা। আবার স্বামীর প্রতিশোধ ভাবনায় সায় দিয়েও ভয় পাই, কিন্তু স্বভাবজ ভঙ্গিতে জানিয়ে দেয় "কিছু ভাবতি হবে না"। ভগ্ন মন্দির কে মসজিদ ভেবে সেখানে নিরাপদ আশ্রয় নিতে চাই "আল্লা যা করে"! ভক্তপ্রসাদের রূপ-খ্যাতির উত্তরে সলজ্জ ফতেমা বলে — "পুঁটি দিদি, মুই তোর পায়ে সেলাম করি। তুই মোকে হেথা থেকে নিয়ে চল্।" এসময় তাকে রক্ষা করে ভূত বেশী হানিফ। কৃষক রমণী মুসলমানী ফতেমা বঙ্গীয় রমণী। মান, লজ্জা, সম্ভ্রমবোধ যেমন, তেমনি অপরাধের সাজা দিতে স্বামীর পরামর্শে রাজী। তাই ফতেমা আচরণে, সংলাপে, ভাষায় স্বভাবিকত্বে উজ্জ্বল।

এছাড়া, ভক্তপ্রসাদের কাছে নারীমাংসে জাতপাত নেই। অথচ মুসলমান বিদ্বেষী, কলকাতার মুসলমান বাবুর্চিদের সম্পর্কে ঘৃণাব্যঞ্জক সংলাপ রয়েছে। ফতেমাকে দেখে 'তাজ মাথায়' দেওয়া, 'আতর মাখা' ভক্তপ্রসাদের গদগদ উক্তি— এই যে আমার মনমোহিনী এসেছেন, (স্বগত) আহা, যবনী হোলো তার বয়ে গেল

৬। রথীন্দ্রনাথ রায় — 'মদুসূদনের প্রহসন' - শনিবারের চিঠি।

কি? ছুঁড়ী রূপে যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী"। পুঁটিও হিন্দুর অহমিকায় বলে "কত্তাবাবু, ও নেড়েদের মেয়ে ওরা কি ওসব বোঝে?" কিংবা "আমরা হলেম হিঁদু, তুই হলি নেড়েদের মেয়ে, তোদের তো আর কুল মান নাই, ... তোদের জাত আছে না ধর্ম আছে?" এভাবে দুঁটি সংলাপে মুসলমান বিদ্বেষ স্পষ্ট। এই প্রহসনটিও বেলগাছিয়া নাট্য শালা নয়, প্রথম ১৮৬৬ তে 'আরপুলি নাট্য সমাজ' অভিনয় করে।[৭] প্রহসনের পর সধুসূদন সম্রাট আল্‌তোমাসের কন্যাকে নিয়ে "রিজিয়া নাটক লেখা শুরু করেন। কিন্তু মুসলমান চরিত্র ও বিষয় নিয়ে লেখা নাটক প্রীতিকর হবেনা বলে কেশব চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা ঈশ্বর চন্দ্র সিংহ প্রমুখ উৎসাহ প্রকাশ করেননি বলে ৫ অঙ্কের ১২টি দৃশ্যে কল্পিত 'রিজিয়া' বন্ধ হয়ে যায়। অথচ নাট্যকার কেশবচন্দ্রকে চিঠিতে লেখেন — "মুসলমানগণ এক জাতি হিসাবে বলিষ্ঠ। প্রবৃত্তির উদ্দাম প্রকাশ তাহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ গোচর। আর তাহাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে আছে ষড়যন্ত্র সাধনের নিমিত্ত বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা। " আবার কারবালার যুদ্ধ নিয়ে মহাকাব্য লিখতে চেয়েছিলেন কিন্তু সেযুগের অন্ধ সংস্কার তাঁর লেখনীকে শাসন করেছিল।[৮] মধুসূদনের মানসিকতার সাক্ষ্য ইংরেজীতে লেখা দুটি প্রবন্ধেও রয়েছে — "The Musalmans in India" প্রবন্ধে লিখেছেন—"India Under the Muslim rule was more prosperous than under hall rule" মধুর এসব প্রবন্ধ বিতর্ক সৃষ্টি করলেও তিনি ক্ষয়িষ্ণু মুসলমানদের বিলাসিকতাকে উশৃঙ্খলতাকে সমর্থন করেননি। মধুসূদনের ভাষার ক্ষেত্রেও আরবী ফার্সীর ব্যবহার রয়েছে। পোষাকে লুঙ্গি, চাপকান, মাথায় টুপী, মোল্লাদের কথা। সংস্কারে পীর, সিন্নি, ইমান, নিকাহ, সালাম, প্রভৃতি এসেছে। খাদ্যদ্রব্যে শুয়োর-গোরু ভক্ষণ, সুরা স্থান করে নিয়েছে। ধর্মে নামাজ, রোজা, কলমা প্রসঙ্গও বাদ যায়নি।

৩। দীনবন্ধু মিত্রের নাটক ও মুসলমান সমাজ ঃ

'দর্পণ নাটকের পথপ্রদর্শক' দীনবন্ধু মিত্রের যুগান্তরকারী নাটক "নীলদর্পণ" ছাড়াও আরও চারটি নাটকে মুসলমান সমাজ চিত্র রয়েছে। বাংলার চাষীদের নীলচাষে বাধ্য করাতে নীলকুঠির ইংরেজদের অত্যাচার ও নীলচাষীদের সংগ্রামের বাস্তব কাহিনী 'নীলদর্পণ'। ঢাকার বাংলা বাজার থেকে ১৮৬০ খ্রীষ্টব্দের আশ্বিন মাসে ছদ্ম-নামে প্রকাশিত হলে, হঠাৎ 'বঙ্গসমাজে উল্কাপাত' ঘটে। তোরাপ কেড়ে নেয় আমাদের ভালোবাসা, ক্ষেত্রমণির দুঃখ আমাদের রক্ত গরম করে দেয়।[৯] উদ্দেশ্য মূলক এ নাটকে স্বভাবতই বাঙালী সমাজ স্থান পেয়েছে। বিশেষত বাংলা নাটকে প্রথম

৭। প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত - 'বাংলা নাটক, নাট্যতত্ত্ব ও রঙ্গমঞ্চ প্রসঙ্গ" (২য় খণ্ড)।

৮। সুরেশ চন্দ্র মৈত্র - 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী ও সাহিত্য'।

৯। শিবনাথ শাস্ত্রী — রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ।

বিদ্রোহী চরিত্র তোরাপ কে ঘিরে মুসলমান সমাজের সাক্ষ্য পাই। অত্যাচারিত বাঙালী চাষী সে। নীলকর সাহেবদের অত্যাচার জর্জ্জরিত বাঙালী জীবনচিত্রে মুসলমান সমাজে প্রতিনিধি তোরাপের সার্থক উপস্থিতি।

দ্বিতীয় অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কে বেগুনবেড়ের কুঠিতে গুদামঘরে চারজন রাইয়তের সঙ্গে তোরাপকে আমরা প্রথম দেখি। তার প্রথম সংলাপ — "ম্যারে ক্যান ফেলায় না, মুই নেমোখ্যারামি কত্তি পারবো না"। নবীন বসু ও তার পিতা গোলক বসু তার "হালগরু বেঁচয়ে নে বেড়াচ্ছে" তাদের বিরুদ্ধে কোন মতেই বেইমানী করে সাক্ষী দিতে পারবো না — "জান কবুল"। 'শ্যামচাঁদ', 'রামকান্ত' চাবুকের কথায় সাহেবের বিরুদ্ধে তোরাপের রাগের প্রকাশ — "(দন্ত কিড়মিড় করিয়া) ....সমন্দিরি একবার ভাতারমারির মাঠে পাই, এমন থাপ্পড় ঝাঁকি, সমিন্দির চাপালিডে আসমানে উড়য়ে দেই, ওর গ্যাডম্যাড করা হের ভেতর দে বার করি"। এই দৃশ্যেই আবার ইংরেজের অত্যাচার থেকে বাঁচতে বুদ্ধিমান তোরাপ বলে — "মোরে ঝা বলবা মুই তাই করবো"। 'খোদার কসম' — কিন্তু এ তার সাময়িক কৌশল। তার প্রমাণ রেখেছে ইন্দ্রাবাদের কয়েদ খানা থেকে পালিয়ে। আবার ৩/৩ গর্ভাঙ্কে রোগ সাহেব ক্ষেত্রমনির উপর যখন বলাৎকারে উদ্যত, তখন জানলা ভেঙে কুঠিতে ঢুকে ক্ষেত্রকে উদ্ধার করেছে নবীন মাধবের সঙ্গে। রোগ সাহেবকে পিটিয়েছে, কানমলা দিয়েছে। শেষবার ৫/১এ ইংরেজের লাঠির আঘাতে নবীন বাবু মৃতপ্রায়। তোরাপ প্রতিশোধ স্পৃহায় হাত কেটে যাওয়া সত্ত্বেও ছোট সাহেবের নাকটা দাঁত দিয়ে কেটে এনেছে। "নাকটা মুই গাঁটি গুজে নেকিচি, বড়বাবু (নবীন) বেঁচে উটলি দ্যাকাবো .... বড়বাবু যদি আপনি পলাতে পাত্তেন, সমিন্দির কানদুটো মুই ছিঁড়ে আনতাম, খোদার জীব পরাণে মাত্তাম না"। এ সংলাপে তোরাপের রাগ, ধর্মভীরু মানসিকতা, কৃতজ্ঞতাবোধ স্পষ্ট। আবার তারই সামনে বড়বাবু মার খেয়েছে বলে কান্নায় ভেঙে পড়েছে — "আল্লা। বড়বাবু মোরে এতবার বাঁচানে মুই বড়বাবুরি অ্যাকবার বাঁচাতি পাল্লাম না (কপালে ঘা মারিয়া রোদন)"। পুরোহিত বিজাতি তোরাপের প্রতি কৃতজ্ঞতায় বলেন— "অপর গ্রাম রাসী ভিন্ন জাতি তোরাপ বড়বাবুর নিকটে বস্যে রোদন করিতেছে। আহা। গোরিব খেটে খেগো লোক"। এরপর সাহেবের কাছে ধরা না দিতে গোলার মধ্যে আত্মগোপন করতে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু মৃতপ্রায় নবীন মাধবের বিছানার কাছে মাটিতে 'দুইবার সেলাম' করে যেতে ভোলেনি।

এই মুসলমান তোরাপ নিজ সমাজ তো বটেই অন্যসমাজের মানুষের কাছেও সহানুভূতি, সম্মান পেয়েছে। মোহিতলাল মজুমদার 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন — তোরাপ "সর্বদেশের সর্বকালের কবিকল্পনাকে আকৃষ্ট করিয়াছে।....... ভাষার ভঙ্গিতেই তার অন্তরের বালক মূর্তি এবং অকপট কুটিলতাহীন ক্রোধ যে

রসের সৃষ্টি করে, তাহাতে একাধারে হাসি ও শ্রদ্ধা জাগে' 'লৌ দেখে গাড়া মোর ঝাঁকি মেরে ওট্‌ছে' — এই একটি কথায় সে কোন জাতের মানুষ তা আমরা নিমেষে বুঝিয়া লই। .....এ ভাষাতে যে অশ্লীলতা আছে তাহা আর্টের অশ্লীলতা নয়।' মোটামুটি কোরাণ নির্দেশিত পথেই তোরাপ গঠিত। তার কথাতেও ধার্মিক মুসলমান চরিত্র প্রকাশিত। যথার্থ বিপ্লবী, নিরপেক্ষ, কর্তব্যপরায়ণ মানুষ হিসেবে তোরাপ অঙ্কিত।

আবার২/১এ কুঠির গুদামে 'মজুমদার' - এর কাতরানির তলব নিতে তোরাপ পরাণ চাচার ঘাড়ে উঠতে পারেনি, পরাণ চাচাকেই ঘাড়ে নিয়েছে। কারণ পরাণের কথায়—'তুই যে নেড়ে'। তাই তোরাপ ঘাড় পেতেছে হিন্দু পরাণকে ঘাড়ে ওঠাতে। একই অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বাস করা চাষীকুলেও সম্প্রদায়গত ভেদ স্পষ্ট। আবার বচোরদ্দির বাঁধা গানই প্রভাবিত করে অত্যাচারিত চাষীদের। দেওয়ান গোপী রোগকে জানিয়েছে — "এই নেড়ে বেটা ভারী হারামজাদা, বলে, নেমকহারামি করিতে পারিব না"। মুসলমান তোরাপের সততার বিরুদ্ধে গোপীর ঘৃণাব্যঞ্জক উক্তি 'নেড়ে'। রামকান্তের আঘাতে কাতর তোরাপ 'আল্লাকে' ডেকেছে, "মুই পানি তিষেয় মলাম"। পরাণ চাচার কাছে 'জল' চেয়েছে। অত্যাচার থেকে সাময়িক পরিত্রাণ পেতে 'খোদার কসম' খেতেও বাধেনি। শপথ করেও পালাতে বাধা হয়নি ধর্ম, বুদ্ধিমত্তায় আস্থাবল থেকে পালিয়ে মুক্ত হয়েছে ধর্মকেই হাতিয়ার করে। পণ্ডিতের মুখে 'কাজীর কাছে হিন্দুর পরব'। কাজীর বিচারের প্রতি বিদ্রুপ। নাটকে চাপরাশীর কাজ করে 'মনিরুদ্দিন'— সমাজ অর্থনীতির বলি সেও। সংলাপেও দীনবন্ধু যশোরের, খুলনার কথ্য ভাষা-ব্যবহার করেছেন মূলতঃ। কিন্তু ঐশ্লামিক প্রভাবও যথেষ্ট—আরবী না-লায়েক', ফারসী দাদনী, পয়জার, দোরস্ত। 'মামদো' অর্থাৎ মহম্মদীয়—মুসলমান ভূত, রোজা, ইমান প্রভৃতি। কাজী আব্দুল ওদুদ 'ব্যবহারিক শব্দকোষ'- এ জানাচ্ছেন মুসলমানরা অনেকে মাথা মুন্ডন করতো বলেই হিন্দুর অবজ্ঞা পূর্ণ উক্তি 'নেড়ে'। 'যবন' বলা হয়েছে মুসলমান, খ্রীষ্টান ও বর্ণাশ্রম যারা মানেন না তাদেরকেই। 'নীলদর্পণ' - এর প্রথম অভিনয় ১৮৭২ - ৭ই ডিসেম্বর। এ নাটক দিয়েই সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ন্যাশনাল থিয়েটারের দ্বারোদ্‌ঘাটন হয়।

'বিয়ে পাগল বুড়ো' (১৮৬৬) তে সুশীল সভ্যতার প্রমাণে বলেছে "যবনের অন্ন খেতে আপনার যেমন ঘৃণা হয়" - ইত্যাদিতে সামাজিক ধর্ম-কর্ম খাদ্যে বিদ্বেষ। মুসলমানের প্রতি এ দৃষ্টি সমকালে প্রতিষ্ঠিত ছিল। 'সধবার একাদশী' প্রহসনে — "মুসলমানের দোকানের বিস্কুট", ইঙ্গ বঙ্গীয়দের মুরগী খাবার প্রসঙ্গ। দাড়ি যুক্ত মুসলমান ও ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি দৃষ্টি ভঙ্গি ধরা পড়েছে কেনারামের কথায়। ঐশ্লামিক দর্শন সূত্রে মুসলমান পোষাকে পরিচ্ছদে মুখে লম্বা দাড়ি রাখবে। গোঁফ ছোট করে কামানো ইত্যাদি থাকবে। ২/৩ গর্ভাঙ্কে নিমচাঁদ, রাতের উপমাতে মুসলমান সমাজের

বিশেষ বিধান ব্যক্ত করে — "সূর্য্যমামা রোজার পর সন্ধ্যাকালে চাট্টি খেতে গেছেন"। এই উক্তিতে 'রোজা' মুসলমান সমাজের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। আরবের দশম মাস 'রমজান' - এ এক চন্দ্র থেকে অন্য চন্দ্র পর্যন্ত তিরিশ দিন ব্যাপী মুসলমানরা সারাদিন অনাহারে খোদার স্মরণে দিনাতিপাত করেন। সূর্যাস্তের পর জলগ্রহণ করা ইসলামীয় রীতি; এখানেও সূর্য্য সারাদিন পৃথিবীকে আলোদান করে সূর্যাস্তের পর যেন মুসলমানদের 'রোজা খোলা'র মত অন্নগ্রহণে গেছেন। সংলাপে নানাস্থানে ও উপমায় মুসলমান সমাজের বিশেষ দিক প্রকাশিত।

'লীলাবতী'তে হেমচাঁদের বক্তৃতায় জাতিভেদ, হিন্দু-মুসলমানের সমাজ ও ধর্মগত বিভেদের কথা রয়েছে। সমকালে অধিকাংশ বাঙালী মুসলমান বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করেনি। এ নাটকে "মাতৃভাষার আহার" দেবার আহ্বানে একইদেশের মায়ের সন্তান মুসলমান-হিন্দুর ভেদাভেদভূলে মাতৃভাষার উন্নতির কথা হেমচাঁদের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। এতেই দশের, দেশের মঙ্গল। 'জামাই বারিক' (১৮৭২)-এ পত্নীগৃহে থাকার 'পাশ' না পেয়ে জামাইদের মধ্যে জারিগানের আসর বসেছে। তাতে এসেছে মুসলমান সমাজ চিত্র। মানিকপীর, জয়নাল ফকির, "আল্লা আল্লা বলরে ভাই নবি কর সার", মুসলমানের মোল্লারে ভাই হাঁদুর মধ্যে সাধু", মুর্গির ছাওয়াল কার্ত্তিক রে ভাই মোরগ চেপে যায়। আর পুজো পানি বাঁজা বিবির ছাওয়াল করে দেয়"। 'বিবি', 'কসম' প্রভৃতিতে মুসলমান সমাজে দাড়ি রাখা ইসলামীয় নিয়ম ও মৌলবী প্রথা থেকেই চশমা পরা দাড়িযুক্ত মৌলবী 'আব্দুল লতিফ' নাম এসেছে বিশেষ এক জামাইএর নামে।

দেখা যায়, চট্টরাজ গুণনিধিতে মুসলমান ভয়ংকর লুণ্ঠনকারী, ধর্ম-অপহরণকারী, যদিও তা গৌনরূপে অঙ্কিত হয়েছে, মধুসূদনের চিঠিতে, প্রবন্ধে শুধু নয়, মানবতাবাদী দৃষ্টিতেও মুসলমান বাস্তবোচিত ও সম্মানীয়। দীনবন্ধু মিত্রেও মুসলমান তদ্রূপ। পরবর্তীকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ধারা ব্যতিক্রমী মাত্রা পেয়েছে।

৪। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকে মুসলমান ঃ

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সপ্তম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সঙ্গীতের মতই অনুরাগ বশে নাট্যসমিতি গঠন করে অভিনয়, হারমোনিয়াম বাজানো, নাটক রচনা প্রভৃতির মত 'হিন্দুমেলা'র আয়োজনে মেতে ওঠেন। ১৮৬৮-র এপ্রিলে বাৎসরিক মেলার জন্য 'জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান.......' কবিতা লেখেন। তাঁর 'গম্ভীর' নাটকের একটা প্রধান সুর ওই কবিতায় প্রকাশিত।[১০] উল্লেখ্য 'হিন্দুমেলার' সদস্যদের মতামত ও রচনা বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উপর সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে।[১১]

১০। সুরেশচন্দ্র মৈত্র - বাংলা নাটকের বিবর্তন।

১১। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান - 'আধুনিক বাংলাকাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক'।

'নাট্যকার ইতিহাসের মোড়কে মুলতঃ সমকালীন হিন্দু জাতীয়তাবাদের উত্তাপ ও উত্তেজনাকে মঞ্চে পরিবেশন করার সংকল্প গ্রহণ করেন।[১২] ইতিহাসকে গ্রহণ করে নাট্যকার ইংরেজের স্থানে মোগল- মুসলমানকে বসান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন — "হিন্দুমেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত কী উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশীপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থিব করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্বগাথা ও ভারতের গৌরব কীর্তন করিলে, হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কটকে থাকিতে থাকিতেই আমি 'পুরুবিক্রম' নাটকখানি রচনা করিয়া ফেলিলাম"।[১৩]

'পুরুবিক্রম' খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের কাহিনী অনুসরণে রচিত 'অনুবাদ' নাটক। মূল জাঁ রাসিনের ফরাসী নাটক 'আলেকজান্ডার দি গ্রেট' (১৬৬৫)। পুরুকে মহান, মহৎ, বীর্যবান করতে ইতিহাস কিঞ্চিৎ বদলে নিয়েছেন নাট্যকার। গ্রীকবীর আলেকজান্ডার যবন মুসলমান সেকেন্দর শা তে পরিণত। এখানে দেশাত্ববোধ অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক স্বার্থ দ্বন্দ্বেরই পরিচয় প্রকাশিত।[১৪] অনুবাদ নাটক হয়েও 'পুরুবিক্রম' শুরু হয়েছে মৌলিকতা দিয়ে বাংলার পটভূমিতে। সেকেন্দর শা ভারত আক্রমণে উদ্যত বলেই কম্বু পর্বতের রাণী ঐলাবিলা পাঞ্জাবের রাজকুমারদের যবনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে এসেছেন। পুরু (১/২এ) তক্ষশীলাকে বলেছেন—"শীঘ্র আমাদিগকে রণক্ষেত্রে নিয়ে চলুন। যবন রক্ত পান করে আমাদের অসির পিপাসা শান্ত হোক। ৩/১এ নাট্যকার দেখিয়েছেন সেকন্দব শা পুরুর সৈন্যদের বিনষ্ট করেছে কৌশলে। পঞ্চমাংকে সেকেন্দর রাজকুমারী অম্বলিকাকে বলেছেন — "আপনার হৃদয় যখন আমি লাভ করেছি তখন আর কিছু চায়না"। কিন্তু সামাজিক বাধা অম্বালিকাকে একাকিনী বিরহিনী করে রেখেছে। এ নাটকে যথার্থ হয়ে মুসলমান সমাজ নেই। তবে আলেকজান্ডারকে সেকেন্দর শা এঁকে,সৈনিকদের কাফের ধ্বংস ও পুরুর সৈনিকদের 'যবন' অর্থাৎ মুসলমানদের 'রক্তে ধরা'- কে প্লাবিত করার মধ্যে মুসলমান এসেছে।

'সরোজিনী'(১৮৭৫) : বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসকারগণ (আশুতোষ ভট্টাচার্য ব্যতীত) 'সরোজিনী'কে মৌলিক নাটক বলেছেন। কিন্তু 'সরোজিনী' অনুবাদ মূলক রচনা। জাঁ রাসিনের ফরাসী নাটক 'সরোজিনী'র মূল। চরিত্র ও প্লট গঠনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কৃতিত্ব সামান্যই।[১৫] আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণের পটভূমিতে, মেবারের রাণা লক্ষণ সিংহর ও তার ১২ টি পুত্রসহ বিজয়সিংহের প্রাণদান এবং সরোজিনীর অগ্নিতে প্রবেশ— নিয়ে ইতিহাসের ছায়ায় সরোজিনী গঠিত। এরসঙ্গে

১২। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী - 'তুলনা মূলক আলোচনা'।
১৩। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় - 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি'।
১৪। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য - বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস - ১মখন্ড। ১৫। ঐ পাদটিকা -১২।

যুক্ত হয়েছে আলাউদ্দিন প্রেরিত ছদ্মবেশী মুসলমান মহম্মদ আলি ওরফে ভৈরবাচার্য, তার চেলা ফতেউল্লার হিন্দুর বিরুদ্ধে কুটিল ষড়যন্ত্র, দ্বন্দ্বপূর্ণ উত্তেজনা বহুল ঘটনা। কাহিনী-উপকাহিনীতে হিন্দু-মুসলমান সমাজ দ্বন্দ্ব, ভেদাভেদ, চক্রান্ত স্পষ্ট। মুসলমান চরিত্র গুলো হল বাদশা আলাউদ্দিন, মহম্মদ আলি, ফতেউন্না, রোশেনারা, তার সখি মোনিয়া, উজির, ওমরাহ, মুসলমান প্রহরী, সৈনিকগণ প্রমুখ।

মহম্মদ আলি, ফতেউল্লা বাদশার চর। মুসলমান হয়ে হিন্দুর মন্দিরে চাল কলা খেয়ে বাংলার 'নিরেটবোকা' মুসলমান ফতেউল্লার প্রাণ ওষ্ঠাগত। বাদশাকে খবরাখবর পৌঁছে দেয় তারা। ভৈরবাচার্য রূপী মহম্মদকে 'চাচাজী' 'মোল্লাজী' সম্মোধন করে ফতেউল্লা। তার সংলাপে জানা যায়- ''বাদশার ভাইঝিরে নিয়ে তুমি ঝে পেলিয়ে ছিলে, তার লাগি তো তোমার গর্দান নেবার হুকুম হয়। হ্যাঁদু মসজিদের মোল্লা হয়ে বসলে, ... যদি হ্যাঁদুদের মধ্যে তুমি ঝগড়া বাদিয়ে দিতি পার, তাহলি তোমার সব কসুর রেয়াৎ করবেন, আরও বকসিস দিবেন।'' এখানে বাদশার ভাইঝি অপেক্ষা সিংহাসন বড়। বাদশা হীন, দুর্বল। তাই হিন্দুর মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে মনোলিপ্সা পূরণ করবেন। মহম্মদের কথায় ফতেউল্লার স্বরূপ- ''বাংলাদেশের এই চাষাটাকে নিয়ে তো দেখছি ভারি বিপদেই পড়েছি।'' মতলব সিদ্ধ হবার উপক্রম হলে অলাউদ্দিনকে পত্র পাঠাবার কথা বললে ফতেউল্লার উক্তি- ''মোর বাঙ্গালা মুলুকে........... বেশ ছ্যালাম, চাষবাস কত্তাম- দুটা প্যাট ভরি খাতিও পাত্তাম তোমার কথা শুনি, মুই কেন মত্তি এহানে আয়ছিলাম, বাদশার ঘরে চাকুরীও পালাম না, প্যাটও ভরলা না। আর দেখ দেহি চাচাজি............... এখানে ছ্যালো মুসলমানের নূর, তুমি তা কাটি মাতায় হ্যাঁদুর চৈতন বসায়্যে দ্যালে'' — ইত্যাদিতে মুসলমান সমাজ চিত্র। কাজের সন্ধানে গরীব মুসলমান চাষী বুদ্ধিমান শয়তান মুসলমানের আশ্রয় নিয়েছে।[১৬]

২/১এ দিল্লীতে সম্রাট আলিউদ্দিন উজির ওমরাহের ঙপস্থিতিতে বারবার রাজতপুতদের হাতে লাঞ্ছনার কথা বলেছেন। বাদশার পৈশাচিক অপকর্ম গুলো ইসলাম অনুমোদিত বলা হয়েছে, বস্তুত ঐস্লামিক নীতি এখানে ভ্রষ্ট হয়েছে। আলাউদ্দিনকে সংক্ষিপ্ত করতে বাড়তি 'ল' যুক্ত করেছেন নাট্যকার, ''আল্লা। দেখ উজির, মহম্মদ আলি যে ছদ্মবেশে হিন্দুমন্দিরের পুরোহিত হয়ে আছে, তার কাছ থেকে তো এখনও কোন খবর এল না।'' উজির অপেক্ষার পরামর্শ দেয়। সম্রাট বলেন— ''হিন্দু রাজাকে এত করে বল্লেম যে, পদ্মিনী বেগমকে আমার হস্তে সমর্পন করলেই চিতোর পুরী নিরাপদ হবে, তা সে কিছুতেই শুনলে না। ইত্যাদিতে

১৬. 'লোকে সব ব্যাপারকে ধর্মের কথায় ব্যাখ্যা করিতে অভ্যস্ত ছিল বলিয়া তাহা হিন্দুদের মুসলমান বিদ্বেষী করিয়া তুলিল। ..... সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের যে বিপুল ঘূর্ণাবর্ত দেশকে যে দুর্গতির অতলে ডুবাইতেছে, তাহার সংহার মূর্তি বাংলো সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখা গিয়াছে'।- সুশীলকুমার বসু-'হিন্দু না মুসলিম'।

নারীলোভী বাদশার পরিচয় স্পষ্ট। দ্বিতীয় ওমরাহ হজরত মহম্মদকে ইঙ্গিত করে বলে—"আমাদের বাদশাই মহম্মদের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি", ৩য় ওমরাহ তা সমর্থন করে। বলা বাহুল্য এগুলো ইসলাম সমর্থিত নয়। ফতেউল্লা সভায় এলে তার চাচাজি কে জানতে চাইলে সে বলে—"তোমরা যারে মহম্মদ আলি কও, হ্যাঁদুরা তেনারে ভরুচাচাজি কন।" পত্রে মহম্মদ জানিয়েছে হিন্দুদের বিবাদ উপস্থিত। এই খুশিতে বকশিস দিতে গেলে ফতেউল্লা স্বগত উক্তি-" বকশিস! দুই প্যাঁজির তরকারি প্যাট ভরি খাতি পালিই এখন বত্তাই—" ইত্যাদি। ওমরাহরা সুখবরের জন্য নাচ-গান আর্জি করলে মঞ্জুর হয়েছে। উল্লেখ্য এরূপ নৃত্যগীত ইসলাম অনুমোদিত নয়।

বিজয়ের প্রেমে মুগ্ধ রোশেনারাতে বিজয সিংহের মর্যাদা গৌরব যেমন ঘোষিত তেমনি মুসলমানির কামনাদগ্ধ হৃদয় উন্মোচিত। এই চিত্রণে নাট্যকার মুসলমানের বিরাগ ভাজন হয়েছেন। মুনীর চৌধুরী বলেছেন— জ্যোতিন্দ্রনাথের ....নাটকে প্রধানত: যাবনিক প্রসঙ্গগুলোই স্বকপোল কল্পিত ......রোষেনারার রাজপুতবীর পূজা ও শাস্তভোগ, সম্রাট আলাউদ্দিনের লালসা ও নৃশংসতা, পুত্রহন্তা মহম্মদ আলির পৈশাচিকতা ও ফতেউল্লার আহাম্মকি ও ক্ষুদ্রতা .... যাবনিক অত্যাচার ও অপদস্থতার কথা উদ্ভাবনে জোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিকতা তাৎপর্যপূর্ণ।' অবশ্য আলাউদ্দিন পদ্মিনীকে লাভের চেষ্টা করে হিন্দু পারিবারিক জীবনে হস্তক্ষেপ করেন'— একথাও সত্য।[১৭] ফতেউল্লার উক্তি "মুই বাদশা হলি তো আগে এই হ্যাঁদু বেটাদের কুটিকুটি করে জবাই করি; আর গদিতে ঠাস দিয়ে মারি .... চাচাজিরে মোর উজির করি"। ইত্যাদি বক্তব্যে শুধু হাসি নয় হিন্দু-মুসলমান সমাজচিত্র, মনোভাব, সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ববঙ্গীয় বাংলা ভাষায় প্রকাশিত। রাজপুতের কাছে ধরাপড়ে ফতেউল্লা নিজেকে বাঁচাতে 'মুসাফের' লোক বলে পরিচয় দিলেও মুসলমানীত্ব গোপনে ব্যর্থ। রক্ষকদের সামনে মন্দিরকে মসজিদ', ভগ্নিপতিকে 'ফুফা' বলে এবং কিছুতেই 'হারাম খাই' স্বীকার করেনি।

চতুর্থ অঙ্কে রোশেনারা মুনিয়া সমীপে দানবী মূর্তি ত্যাগ করে মানবীতে রূপান্তরিত হয়ে যথার্থ সমাজ প্রতিনিধি স্থানীয়া নারী হয়ে উঠেছে। এখানে তার প্রেম বহ্নি জাতীয় প্রেমে পরিণত হয়েছে। ধৃত ফতেউল্লার কথায় 'স্যালাম' এবং 'প্যান্নাম' 'কথাডা অ্যাহি, তবে কিনা এডা হ্যাঁদুর কায়দা—ওডা মোসলমানের কায়দা।' উল্লেখ্য একশ্বরবাদী ঐশ্লামিক রীতিতে সেলাম বা প্রণাম নিষিদ্ধ, প্রচলিত সমাজে মোনাজাৎ বা হাতে হাতে মেলাবার প্রথা সেলামে পর্যবসিত। "চিটিগুল ফার্সি"তে লেখা বলাতে ভাষাগত ব্যবধান ও স্মরণীয়। ৫/৩ বলিদান দৃশ্যে পুরোহিত পৈশাচিক উল্লাসে সরোজিনীর শিরোচ্ছেদ করতে খড়্গ তুলেছে। এদৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন অভিনেত্রী

---

১৭. ড: ওয়াকিল আহম্মদ- উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা চেতনার ধারা ২য় খণ্ড।

বিনোদিনী দাসী 'আমার অভিনেত্রী জীবন' প্রবন্ধেও লিখেছেন। ড. অজিতকুমার ঘোষ 'বাংলা নাটকের ইতিহাসে' লিখেছেন-'এই দৃশ্য দেখিয়া অনেকেই অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন।' স্বাদেশিকতা, মুসলমান বিদ্বেষ সবই সে যুগের রাজনৈতিক চিন্তার ইঙ্গিত এখানে হানা দিয়েছে। এজন্য 'নাট্যকার একান্ত দায়ী নন, দায়ী সেযুগের বাঙালীর নাট্যরুচি।'[১৮] আবার একথাও স্বীকার্য সমকালে অনেকেই জাতির শত্রু ইংরেজের পরিবর্তে মুসলমানকে বেছে নিয়েছেন, বিষবাষ্প ছড়িয়েছেন আমাদের মুসলমান সমাজে। ইংরেজের উপর বিষোদগার মোগল, মুসলমান বা যবনের নামে আবর্তিত বিবর্তিত হয়েছে। এরই এক উল্লেখ্য উদাহরণ 'সরোজিনী'।

'অশ্রুমতী' (১৮৭৯) : কর্নেল টড অনুসরণে প্রতাপসিংহের স্বদেশ প্রেমের অতুলনীয় বীরত্বকে আশ্রয় করে কাহিনী গাঁথা হলেও সেলিম ও অশ্রুমতীর অনৈতিহাসিক প্রেম কাহিনী সেকালে জনসমাজে সমালোচনার ঝড় বইয়ে দেয়, যার বাতাস জ্যেতিরিন্দ্রনাথকেও সচকিত করে। নাটকে মুসলমান চরিত্র গুলো হল আকবর, সেলিম, ফরিদ খাঁ, মহব্বৎ ও রক্ষকগণ।

১/৩-এ মানসিংহের প্রতি রানাপ্রতাপের দুর্ব্যবহারের সংবাদে সম্রাট আকবর প্রতিশোধের আজ্ঞা দেন। এছাড়া বলেন 'রাজপুতের সঙ্গে কুটুম্বিতা' করে সিংহাসন শক্তিশালী রাখার বাজনৈতিক অভিসন্ধি কিছুটা সিদ্ধ হলেও, প্রতাপ তথা হিন্দুসংস্কার "আমার এই রাজনৈতিক অভিসন্ধি বিফল" করে দিচ্ছে। ১/৭-এ রাজপুত সেনাদের "মুসলমান রক্তের" পিপাসা মেটানোর মধ্যেই মোগল সেনাদের "আল্লাহো আকবর ধ্বনি, পৃথ্বিরাজের সংলাপে "মক্কাপ্রাপ্তি" ইত্যাদিতে ইসলাম এসেছে, প্রতাপের চোখে "মোগল দস্যু"। তাঁর নিষ্পাপ কন্যা অশ্রুমতী জাতিভেদ জানেনা, তাই মহিষিকে আদেশ দেন "রাজপুত বীরত্বের গুনকীর্তন ও মুসলমানদের নিন্দাবাদ" বিষয়ে সচেতন করাতে। এদৃশ্যেই ফরিদ ঘুমন্ত অশ্রুমতীকে চুরি করে সম্রাট পুত্র সেলিমের শিবিরে নিয়ে যায়। সেলিমের শিবিরে ফরিদের রূপচর্চাতেও মুসলমান পরিচিতি— "মোচে একটু আতর লাগাই .... চুলটা ও দাড়িটা একটু আঁচড়ে দুমড়ে নি .... এই তাজ টুপিটা একটু ট্যাড়া করে পরি।" ইত্যাদি। নিদ্রা ভাঙলে অশ্রুমতী ফরিদকে ডাকাত ভেবে ভয় পাই। এসময় আর এক মুসলমান সেলিম ফরিদ ও সেনাপতি মানসিংহের উপরে ক্ষুদ্ধ হয়, শেষে বাদশার আদেশ শুনে নিজেই অশ্রুমতীর রক্ষনাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছে। সে চারিত্রিক উদারতায় পৃথ্বীকে মুক্তি দিয়েছে। পৃথ্বীকে ভোলাতে কূটকৌশলী ফরিদের কথায় সমাজ ও ধর্ম এসেছে "মেয়েটি হল রাজপুত বংশের—আমাদের সুলতান হলেন মুসলমান। এ মিলনে সুখ নেই— এবিষয়ে আমাদের ধর্মেতেও নিষেধ রয়েছে।" বস্তুত কোরাণ মতে উপযুক্ত মর্যাদা

---

১৮. প্রাগুক্ত পাদটীকা - ১০ পৃ-৪৭৮

দিতে পারলে ১৪ শ্রেণীর নারীবাদে সর্বাধিক চারজন যেকোন নারীকে বিবাহ করার নির্দেশ রয়েছে। অন্যদিকে সেলিমের উদারতা শক্তসিংহের ভাষায় প্রকাশিত — "তিনি অন্য মুসলমানের মত নন। তাঁর অন্তঃকরণ অত্যন্ত উদার"। শক্ত সিংহ সেলিমের কাছে অশ্রুকে পাএগ্র করার অনুমতি চাইলে সেলিম আপত্তি নেই জানিয়েছে। কিন্তু তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দেয়া যাবেনা। ৩/৭-এ আকবর প্রতাপের দেশপ্রীতি ও বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে চিরকালীন বন্ধুত্ব স্বীকার করেছেন। নাটকে সেলিম উদার, বুদ্ধিমান, ভদ্র। ফরিদ 'ইয়াগো'র মত নারীলোভী ক্রুর, শয়তান। অশ্রুমতী লাভের আশায় ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিয়েও কৌশলে লোভে আগুন জ্বালিয়েছে। নাটকের শেষাবধি সে চক্রান্তের যাদুকর। দিল্লীশ্বর স্ব-স্বার্থের কারণে সর্বধর্ম সমন্বয়ের চেষ্টা করেন। অশ্রুকে বিবাহের প্রস্তুতিতে সেলিম বলেছে "........অন্তঃপুরের সকল বেগমরা এখন তোমার পদসেবা করবে", ইত্যাদিতে একাধিক পত্নীর ও সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বিবাহ অনুষ্ঠানাদি এসেছে। ৪/১৪ তে ফরিদের কৌশলে অশ্রুমতি চরম বিশ্বাসঘাতিনী সেলিমের কাছে। ফরিদ নিজেই স্বীকার করে— "এইবার চূড়ান্ত সময় উপস্থিত। আমি অশ্রুমতীকে হস্তগত করবার জন্য যে জাল পেতেছি মানসিংহকে তো সব লিখেছি। সেলিমের একবার হাতছাড়া হলেই ও শিকার আমার হবে— আর যদিবা নিতান্তই মারা পড়ে, তাতে বা কি? .... আমার কি এল গেল-আমার শুধু রূপ-লালসা, আমার তো আর ভালোবাসা নয়"— ফরিদ এখানে কুচক্রী হীন, পাষণ্ড, শয়তান নারী মাংসলোভী জান্তব পশু স্বরূপ। শেষে ফরিদের চক্রান্তেই সেলিম অশ্রুকে ছুরি মারতে গেলে অশ্রু মূর্চ্ছা যায়। মলিনা সব চক্রান্তের জাল খোলে। অনেক "নরক যন্ত্রনা ভোগ" করতে সেলিমকে বাঁচিয়ে রাখে শক্তসিংহ। অশ্রু মৃত ভেবে সেলিম জানায়" যেন প্রতাপসিংহ তার দুহিতাকে কলঙ্কিত মনে না করেন— আমি শপথ করে বলছি, ও পবিত্র দেহে আমার এই কলঙ্কিত পাপিষ্ঠ হস্তের কখনো স্পর্শ পর্যন্ত হয়নি। উদার সেলিম বিশ্বাসঘাতক মুসলমান ফরিদের যথার্থ সাজা দেবার প্রতিজ্ঞা করে—। "ও পাপিষ্ঠদের কবরস্থ হবারও যোগ্য নয়।" ফরিদ এলেও তাকে বধ করে। শেষদৃশ্যে প্রতাপের আদেশে যোগিনী অশ্রুমতীকে দেখে প্রেতাত্মা ভেবে মার্জনা চেয়ে মূর্চ্ছা গেছে সেলিম। সেলিমকে মহৎ করে আঁকার অন্তরালে নাট্যকারের মানসিকতার প্রমাণ রয়েছে।[১৯] যদিও শেষে জাতিবিদ্বেষের অবসান ঘটেছে।

১৯। ১৯০১ এর ১লা অক্টোবর 'ভারত মিত্র'-র সম্পাদককে জ্যোতিরিন্দ্র লেখেন-প্রতাপ সিংহকে আমি আরাধ্য দেবতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকি। .... সেলিম পাপহস্তে অশ্রুমতীকে স্পর্শ পর্যন্ত করেনাই। .... সে জানিত না .... কে রাজপুত কে মুসলমান।' পণ্ডিত কেশবচন্দ্র মিত্রকে লেখেন— 'অশ্রুমতীর স্বর্গীয় প্রেমে কোন পার্থিব কলঙ্কের স্পর্শমাত্র হয় নাই। 'বঙ্গীয় মুসমান সাহিত্য পত্রিকায়-শ্রীবসন্ত কুমার রায় লেখেন-'সেলিমের প্রণয়িনী রূপে অশ্রুমতী ..... চিত্রাঙ্কনের উদ্দেশ্য কোন বিদ্বেষের তৃপ্তি সাধন নহে, ইহার উদ্দেশ্য প্রেমের পূন্য প্রভাব, প্রবল একনিষ্ঠ ও স্বর্গীয় প্রভাব প্রকটিত করা।'

এ নাটকে ইসলামী কিছু শব্দের মধ্যেও মুসলমান সমাজের পরিচয় মেলে 'আল্লাহ আকবর' মক্কাপ্রাপ্তি মুসলমানের নিয়মার্থে ব্যবহৃত। আবশ্যিক পাঁচটি ফরজের অন্যতম নমাজ পড়তে হয় মক্কার কাবা মসজিদের দিকে মুখ করে। হজ্ব যাওয়া বলতে মক্কাতেই যেতে হয়। 'কবর' হচ্ছে মুসলমান মারা গেলে তাকে স্নান করিয়ে সুগন্ধী আতর কর্পূর মাখিয়ে পরিষ্কার পুরুষের জন্য তিনটি নারীর জন্য ৫টি কাপড় দিয়ে মৃত দেহটিকে আবৃত করতে হবে। এরপর মাটি খুঁড়ে মৃতদেহকে তার মধ্যে বিছানায় রেখে ক্রমান্বয়ে উত্তরপুরুষ, মৌলবী, আত্মীয়েরা তাতে মাটি দেবে। কোরাণ হাদিসেও এই বিধান স্পষ্ট করে দেওয়া আছে।[২০]

"স্বপ্নময়ী" তে মুসলমান চরিত্র দুটি—আফগান সর্দার রহিম খাঁ এর তার স্ত্রী জেহেনা। ৫ অঙ্কের নাটকের শুরুতেই শুভসিংহকে বিধর্মী ঔরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরামর্শ দিচ্ছে। "ঔরঙ্গজীবের অত্যাচারের কথা জলন্ত ও ভাষায়" বলেও শুভসিংহ তাদের উত্তেজিত করতে পারেনি। তাই দেবতা সেজে প্রতারণার মাধ্যমে লোকের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। এতে সাহায্যকারী রহিম খাঁ। উত্তেজিত রাজপুত্র জগৎকে কৌশলে একটু একটু করে মদ খেতে শেখায়, প্রলোভিত করতে বলে—এর গুণে "দুনিয়া বেহেস্তের মত দেখায় .... খুবসুরৎ হুরিরা এসে নৃত্য করে। শুভান আল্লা"। বেহেস্ত কি জানতে চাইলে রহিম বলেছে—"আমাদের ভাষায় স্বর্গকে বেহেস্ত্ বলে।" পানের সময় মদ কিনা প্রশ্ন করলে রহিম "মদতো ছোট লোকেরা খায়—এ হচ্ছে সরাব-সিরাজ, আমাদের দেশের বড় লোকেরাই পান করে থাকে।" হুরি নৃত্য দেখতে চাইলে রহিম বুঝিয়ে দেয়, "হুরিনা, ...হুরি, আমাদের ভাষায় অপ্সরা কে হুরি বলে।" ইত্যাদিতে ধর্মকে আলাদা করেই ভাষাগত প্রসঙ্গ এনেও স্পষ্টই মুসলমান সমাজ এসেছে। কিছু ক্ষেত্রে ইসলামের বিকৃতিও ঘটেছে। রহিম হিন্দুদের সঙ্গে যোগ দিয়ে " মদিরা এবং প্রমদা একত্র" করে জগৎকে তথা পৃথিবীকে রসাতলে দিতে চায়— এ ভাবনা মুসলমান চরিত্রকে কলুষিত করেছে। রহিম স্ত্রী জেহানাকে নিযুক্ত করে কৌশলে জগৎ কে বশ করতে। " আমার স্ত্রীর এমন একটা মোহিনী শক্তি আছে, যে তাকে দেখলেই কেমন লোকের মাথা ঘুরে যায়।" এ কথা সমাজের কোন স্বামী সমর্থন করে কী? জগতের পত্নী সুমতির নিকটে এসে জোহনা দেরির কারণ হিসাবে বলে— রহিম বড় ভালো, কেননা "অন্য স্বামী হলে চাবুক মারতো, তিনি তো শুধু কিল চড় দিলেন।"—এখানে মুসলমান স্বামী মাত্রই যেন নিষ্ঠুর, "কিল চড়" সম্মানীয়। প্রেমের বর্ণনায় জেহেনা লাস্যময়ী—শয়তানী মুসলমানী।

নাট্য কাহিনীতে দুটি মুসলমান চরিত্রের নিকৃষ্ট রূপ চিত্রণে মুসলমান এসেছে। রাজনৈতিক কারণে অত্যাচারী ইংরেজকে সমালোচনা করা সম্ভব হয়নি। রবীন্দ্রনাথের

২০। ফেরদৌসীর সাক্ষাৎকারে তাঁর বাসভবনে বলেছেন।

কবিতা-''ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায়গাক আমার গাবনা। নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ব্রিটিশ স্থানে 'মোগল' শব্দ বসিয়েছিলেন। ইংরেজেদের কোপানল থেকে বাঁচলেন সত্য, কিন্তু প্রতিবেশী মুসলমানদের অন্তরে আঘাত দিলেন। মুসলমানের মনে এর প্রতিক্রিয়াও হয়েছে। দেশের ও জাতির সাধারণ শত্রু যে ইংরেজ শাসক সেটি চিহ্নিত না করে বরং তাদেরই পক্ষপুটে থেকে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের বিরুদ্ধে মসীধারণ করেন, তাঁরা গোহত্যা, মন্দির মসজিদ নিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামায় অসিধারণ ও করেছিলেন।'[২১]

উল্লিখিত নাটক গুলোর মঞ্চসাফল্য সর্বজন বিদিত, হিন্দী ও মারাঠী ভাষায় অনুদিত ও ভারতের নানাস্থানে অভিনীত হয়েছে। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে মোগল বা মুসলমান শক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে আনা হয়েছে। ইংরেজ শত্রু এবং তার রূপক মুসলমান যদি ধরে নেওয়া যায়, তাহলে শত্রুর বিরুদ্ধে বিষোদগার অর্থাৎ মুসলমানদের বিকৃত ভাবে আঁকা বা তাঁদের প্রতি নাট্যকারের ক্ষোভ প্রকাশ স্বাভাবিক। আর যদি তা হয় তবে মুসলমানের প্রকৃত চিত্রাঙ্কনে না মেলারই কথা। তবুও স্বাভাবিক বিচারে সাধারণ পাঠক মানসে প্রতিবেশী মুসলমানরা অনেকাংশেই আঘাত পেয়েছেন—যা কাম্য নয়। যদিও তাঁর অঙ্কিত আলাউদ্দিন ও সেলিম শেষাবধি মহান।

৫. হরলাল রায়ের নাটকে মুসলমান সমাজ ঃ

বাংলা নাট্যক্ষেত্রে হিন্দুমেলার জাতীয়তাবীদী ভাবাদর্শ জোতিরিন্দ্রনাথের পর হরলালের মধ্যেই বেশী দেখা গিয়েছিল। তাঁর অনেক রচনায় জাতীয় ভাবোদ্দীপনাসহ মুসলমান সমাজ এসেছে। তবে সুন্দর বাংলাদেশের কল্পনায় হিন্দুমুসলমান সম মর্যাদা পেয়েছে। 'হেমলতা' নাটকে কল্পনার আশ্রয়ে মধ্যযুগের রাজপুতনার ইতিহাসের সংযুক্তিতে চিতোর রক্ষার কাহিনী বর্ণিত। সেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ' অবলম্বনে 'রূপলাল' এও যবনরাজের সন্ধি প্রার্থনায় মুসলমান প্রসঙ্গ এসেছে। কিন্তু মুসলমান সমাজ বিস্তৃতি পেয়েছে 'বঙ্গের সুখাবসান' নাটকে।

'বঙ্গের সুখাবসান' (১২৮১) নাটকের মূল আখ্যান বঙ্গে মুসলমানের প্রবেশ ও সেনাপতি বক্তিয়ার 'খিলিজি'র বঙ্গ বিজয় ইতিহাসের বিবৃতি ও পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অবস্থা বর্ণনায়। বক্তিয়ার ও তার ভ্রাতুষ্পুত্র মোরাদ— এই দুটি মুসলমান চরিত্র রয়েছে। এছাড়া দূত, সেনিক প্রভৃতি কয়েকজন। দুজন মুসলমান ছদ্মবেশে বক্তিয়ারের গুপ্তচর রূপে বাংলায় খবর নিতে এসেছে। ক্লান্তিতে একজন বলে ''আল্লা, পরের কাম করা না প্রাণে মরা।' দ্বিতীয়ব্যক্তির সংলাপে মুসলমান বীরত্বেও অহংকারের প্রকাশ— ''বাঙ্গালীরা তো আদমীর মধ্যেই নয়। তাদের মুলুক জিতে নিতে আমাদের আওরাতেও পারে। কিন্তু ধরা পড়ে হরিপ্রসাদ 'শুয়োর খাস' কিনা

২১। প্রাগুক্ত পাদটীকা—১৩

জানতে চাইলে তরবারি উঁচিয়ে বাখর আলিকে ডাকে- "কাফের মোরা দুনিয়ায় রাখব না।" শেষে পালাতে ব্যর্থ হয়ে ভীরু রূপেই দোষ স্বীকার করে। এখানে কায়িক প্রেমে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে দুই ক্লান্ত গুপ্তচর হীন, দুর্বল, কিন্তু শুয়োর খাওয়া নিয়ে হিন্দু মুসলমান বিরোধিতা মুসলমানের পরিচয়কে স্পষ্ট করে।

আবার ২/১ দৃশ্যে মহেন্দ্র বুঝেছে প্রতি বছর কর দিয়ে মুসলমান অধিপতিকে দিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করা যায়। কিন্তু রাজগুরুর মুখে মুসলমান বিকৃত রূপে ঘোষিত। যদিও সর্বদা মুসলমানের এরূপ আচরণ বাস্তব ও ইতিহাস সিদ্ধ নয়, প্রমাণ 'বঙ্গ সাহিত্য' এবং সর্বাধিক কাল শাসিত (৭০০) দিল্লীতে আজও হিন্দুর সংখ্যাধিক্য। "প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান" গ্রন্থে প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন—'আমার ধারণা মুসলমান বাদশারা বাঙালির সামাজিক জীবনের উপর বিশেষ কোন হস্তক্ষেপ করেননি। অন্ততঃ তাঁরা যে বাঙালির মনের উপর বিশেষ কোনরকম জবরদস্তি করেননি তার প্রমাণ বাংলা সাহিত্য। .... বাঙালির জীবনে ও মনে মুসলমান ধর্ম ও মুসলমান রাজশক্তি বিশেষ কোন শক্তি প্রয়োগ করেননি। ...... মুসলমানের ভাষাও বাংলা ভাষাকে রূপান্তরিত করতে পারেনি।'

বাংলামুলুক ঘুরে রোমজান আলি বাংলার মেয়ের তেজের কথা জানালে ক্রুদ্ধ বক্তিয়ার 'শোর' নেবার হুকুম দেন। কিন্তু রোমজানের বলিষ্ঠ বক্তব্যে যথার্থ মুসলমানীত্ব প্রকাশিত- "আমি মুসলমান নই", যদি মিথ্যা বলে থাকি, দোহাই জনাবের ......আল্লার কসম, ঝুটবাত বলিনি।" মহেন্দ্রর বাড়ী লুঠ করতে এলে সৌদামিনী যবনের শির নিতে তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়েছে। মোরাদ অস্ত্র ফেলে বশীভূত হবার পরামর্শদেয়। নেপথ্যে বক্তিয়ার ঘোষণা করে "স্ত্রীলোকের গাত্র" কেউ যেন স্পর্শ না করে। হরিপ্রসাদ যবনের শির নিলেও বক্তিয়ার খিলিজি বঙ্গনারীকে "ধন্য বীরাঙ্গনা" বলে সম্মান জানিছেছেন। মোরাদকে নির্দেশ দিয়েছেন নারীকে বন্দী করতে। কিন্তু "কোনও প্রকার অপমান করিও না।" বক্তিয়াব এখানে মহৎ ব্যক্তি। কিছু পরে "স্বগত" হয়ে বক্তিয়ার বলেন—"মোরাদ জানেনা কিরূপে নির্মল হৃদয় স্ত্রীলোকের মন আকর্ষণ করতে হয়।" বক্তিয়ার বিজিত হিন্দুদের স্পষ্ট বলেছেন—তারা মুসলমানের ধর্ম গ্রহণ করলে সব ইচ্ছা পূরণ করবেন। শেষে বঙ্গ অধিকার করেও বিরাটরাজের কাছে বক্তিয়ার মার্জনা চেয়েছেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন "বাংলার উপর পীড়ন করব না"। বিশ্বাসঘাতক গোপালদের বক্তিয়ার শাস্তি দিতে চেয়েছেন, পরে বিরাটের অনুরোধে ক্ষমা করেও বলেছেন- "সকলকে বলতেম, এই অদ্ভুত জন্তু বাঙ্গালায় জন্মেছে, এদের নাম বিশ্বাসঘাতক।" স্মরণীয় নাটকের শেষে বক্তিয়ার 'খিলিজি' মহান চরিত্রবান। সংলাপে, আচরণের সম্মিলনে নাট্যকার সুন্দর বঙ্গদেশ কামনা করেছেন। যবন বিদ্বেষ সত্ত্বেও শেষাবধি মুসলমানও মহান হয়ে উঠেছে।

৬. উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটকে মুসলমান :

'শরৎ সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'র রচয়িতা ছদ্মনামে 'দুর্গাদাস' ওরফে উপেন্দ্রনাথ দাস। রোমহর্ষক উদ্দীপনার মাধ্যমে বাংলা নাটকে নতুনত্ব এনেছেন। তাঁর 'শরৎ সরোজিনী' (১৮৭৪) মিলনান্তক নাটক। নায়ক জমিদার শরৎ কুমার ও সরোজিনী, সুকমারী ও বিনয়ের, অনুরাগ। নানা বাধা, শেষে শরতের বিমাতার চেষ্টায় মিলন—নাটকের মূল আখ্যান। এনাটকে রাজা থেকে প্রজাতে পরিণত মুসলমান সমাজের একাংশ ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাই। "রাজমহলের সন্নিকটস্থ উপত্যকা"তে মুসলমান মাটির নিচে আত্মগোপন করছে। এখানে ধরা পড়েছে শরৎ কুমার। "আল্লা, আল্লা-অন্ধকে কেউ একটি পয়সা দেয়না" ইত্যাদি কাকুতির মধ্যে অন্ধবেশী মুসলমান অজ্ঞান করে দেয় শরতকে। জ্ঞান ফিরলে "ভূমি-ভূমধ্যে"। (৫/৪-এ) তারা জানতে চাই "বাদশাহের সময়ে আপনারা যে প্রকার সুখে ছিলেন এখন কি সেইরূপে আছেন?" উত্তরে শরৎ জানিয়েছে এক একজন মুসলমান সম্রাট ছিলেন বটে, যাদের নাম প্রাতঃস্মরণীয়। কিন্তু অধিকাংশই ভয়ানক ইন্দ্রিয়পরায়ণ, যথেচ্ছাচারী ও নৃশংস স্বভাব ছিলেন। মুসলমান দিগের আধিপত্য আমরা পুনঃপ্রার্থনা করিনা। "কিন্তু আমীর প্রমুখদের স্বাধীনতার জন্যই এরা লুঠতরাজের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ হচ্ছে। তাই শরতের নিকটে চার হাজার টাকা দাবী করে, শরৎ কোনক্রমেই রাজী না হওয়াতে তাকে ভূগর্ভে নিক্ষেপ করে। শেষে একদল বিজ্ঞানী ফসিল খুঁজতে এসে তাকে রক্ষা করে। এখানে রাজনৈতিক পালাবদলে প্রথম মুসলমান ব্রিটিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টাই দেখান হয়েছে।

'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' (১৮৭৫) নায়ক ও নায়িকা যথাক্রমে সুরেন্দ্র ও বিনোদিনীর প্রণয় মূলক আখ্যান হয়েও নাটকটি জাতীয়ভাবে উদ্দীপিত। চার অংকের এই নাটকে হুগলীতে সমকালীন ইংরেজ রাজত্বের বিচারের নামে প্রহসন, অত্যাচারের বর্ণনায় কয়েদিদের বিরুদ্ধতা এবং হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম স্থান পেয়েছে ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাক্রেন্ডেল বিরাজের বৌকে ধরে এনে বলাৎকারের চেষ্টা করে (৩/৪)। এসময় বন্দীদের বিদ্রোহের খবর আসে। বন্দী পরাণ স্ত্রীর ধর্মলুণ্ঠনকারী ম্যাক্রেন্ডেল সাহেবকে তরবারি দিয়ে হত্যা করে। বন্দীদের সমবেত সংলাপ—"(পরাণকে উঠাইয়া লইয়া) .... অরে, সকলে এবার নিজের নিজের দেবতার নাম কর। .... এই নরক থেকে বেরিয়ে পড়ি— আল্লা, আল্লা, দুর্গা, দুর্গা"। পরের দৃশ্যেই 'ভীষণ একমূর্তি' হরিপ্রিয়র কাছে স্বীকার করে—"বাবু আমি জেতে মুসলমান"। সাহেব তাকে ব্ল্যাকমেল করে, এখানে অপকর্ম করায়। মেয়েমানুষ ধরে এনে রাখে। এ দুটি ঘটনায় নাট্যকার মুসলমানদের এনেছেন কায়িক শ্রমিক ও নিষ্ঠুর কর্মে নিয়োজিত করে। কিন্তু সমকালের নাটকে মুসলমান পরাণ সাহেব কে তরবারির কোপ মারে। পূর্বের তোরাপ ও

মুসলমান, যে ইংরেজের গায়ে হাত তুলেছে। ঐতিহাসিক দিক থেকে এও সত্য মুসলমানই প্রথম ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। হিন্দুর মানসিকতা প্রথমে ছিল অন্নদাশংকরের কবিতানুসারী—"এক রাজা যাবে, অন্য রাজা হবে, সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।" উপেন্দ্রনাথের এই নাটক চলাকালীন (১লা মার্চ'৭৬) পুলিশ এসে নাট্যকার প্রমুখদের গ্রেপ্তার করে, নাট্যাভিনয় বন্ধ করে দেয়। পরে পাশ হয় কুখ্যাত 'নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল'-১৮৭৬ এর ডিসেম্বরে।

৭। কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকে মুসলমান সমাজ :

কিরণচন্দ্রের **'ভারতে যবন'**-এ মুসলমান প্রসঙ্গ এসেছে মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু জাতীয়তাবাদ উদ্দীপিত করতে। —এতেই নাট্যকারের বক্তব্য স্পষ্ট। ১৮ পৃষ্ঠার একটিমাত্র দৃশ্যে 'ভারতে যবন' রচিত। শুরুতেই পথিকের গানে যবনের কাছে পরাধীনতার জন্য ভারতমাতার দুঃখ বর্ণিত হয়েছে। এজন্য বামদেব "হিন্দুকুল কলঙ্ক কাপুরুষগণ"কে ধিক্কার দিয়েছেন। এরপর ভারত সন্তান 'যবন বধে' আনন্দের কথা ঘোষণা করে। ৩নং গানে যবন "ম্লেচ্ছ নরাধম"; ৫নং গানে "ম্লেচ্ছ নরপতি, পামর প্রধান", "ভারতে কুলাঙ্গার" প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত। "ম্লেচ্ছাসুর সৈন্যগণের" প্রতি নির্দেশ হয়েছে- "তোমরা অবিলম্বে এই মন্দির লুণ্ঠন আরম্ভ কর; কোন আশঙ্কা কোরনা, আবাল বৃদ্ধ বণিতা কাহারও প্রতি দয়া প্রকাশ কোরোনা, যে যাহা লুণ্ঠন করবে সে সমুদায়ই তার নিজের ধন হবে। এই মন্দিরই কাফের গণের সর্বাপেক্ষা পূজনীয় স্থান, এই মন্দিরস্থ হিন্দু দেবতার মস্তকে যে অমূল্য অত্যাশ্চর্য হীরক আছে, আমার নিকট প্রেরণ কোরো, অবশিষ্ট সমুদায় তোমাদের।" সৈন্যরা আল্লা, আল্লাহো ধ্বনিতে মন্দির লুণ্ঠন শুরু করেছে। পরে অন্তঃসত্বা রমণীর উপর অত্যাচারে উদ্যত হলে নরাধম যবনরাজকে অস্ত্রঘাত করাতে নাটকে যবনিকা।

নাটকাটিতে মুসলমানের অত্যাচারই বর্ণিত। স্বাধীনতার জন্য দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার পরিবর্তে মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ বর্ণনা মুসলমান সমাজকেই ক্ষুব্ধ করেছে। আসলে নাট্যকার যেন সমকালীন হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাতে আচ্ছন্ন হয়ে মুসলমান বিদ্বেষকেই প্রকাশ করেছেন। উল্লেখে দ্বিধা নেই, সমকালীন সাহিত্যকদের ধর্মবিদ্বেষ ভাবকেই নাট্যকার সমর্থন জানিয়েছেন। এবিষয়ে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ বলেন—'অন্যদেশের কথা জানিনা, কিন্তু বাঙ্গালাদেশে যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্য ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। .... শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে .... উপন্যাসে, নাটকে কাগজপত্রে অকারণে বিধর্মীদের প্রতি কটাক্ষপাত হইয়া থাকে।'[২২] 'ভারতে যবন' তারই এক স্বল্পায়তন চিত্র।

২২। সাধনা পত্রিকা—১৩০১-০২, বঙ্গাব্দ 'হিন্দু ও মুসলমান' প্রবন্ধ।

৮. প্রমথমাথ মিত্রের নাটকে মুসলমান : প্রমথনাথের 'নগনলিনী' নাটকে ইতিহাসের সঙ্গে যোগ রয়েছে। নাট্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত নাট্যকার নাটকের 'অনুষ্ঠান' অংশে লিখেছেন—'ভাবুন পাঠকগণ' যেখানে আর্য্য নৃপতিগণ' রাজাসনে বসেছিল, সেখানে আজ 'খিলিজী আলাউদ্দিন। যবন সম্রাট'। সমরেন্দ্র সিংহের সঙ্গে ইন্দুমতীর প্রেম-প্রণয় প্রসঙ্গে ৪/২ গর্ভাঙ্কে মুসলমান সমাজের পরিচয় রয়েছে। নাট্যে ঘটনাটি অপ্রয়োজনীয় হলেও বিষয়গত ভাবনায় প্রয়োজনীয়। বিন্ধ্যাচলের নিকটে সমরেন্দ্র সিংহের শিবিরে এক মুসলমান সৈনিক যুদ্ধের ব্যস্ততার মধ্যেও মুসলমানের ৫টি অবশ্যকর্তব্য বা ফরজের অন্যতম — নামাজের চেষ্টা করেছে —" (চারিদিক অবলোকন করিয়া)"। ভোজন সিং এসে 'বেরো' বললে সৈনিক 'সোর' অর্থাৎ গোলমাল করতে নিষেধ করে। ভোজন সোর বলতে শুয়োর শুনে বলে—" মুসলমানের মুখে শুয়োর কি ব্যা? সৈনিকের সংলাপ "চুপ রহো; আল্লা! বিসমোল্লা![২৩] তোবা তোবা![২৪] (নমাজকরণ)। শুয়োর খাবে কিনা জানতে চাইলে, মুসলমানের তরবারির ভয়ে ভোজন পালিয়ে যায়। "মুস। (সহাস্যে) লড়নে আয়া জানতে নেই হাম মুসলমান হ্যায়।"—এঘটনা আপাত হাস্য হলেও বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সৃষ্টির বেশ কিছু কারণের একটি। কারণ শুয়োর মুসলমানের নিকটে 'হারাম' অর্থাৎ নিষিদ্ধ।

'জয়পাল' (১৮৮৩) পঞ্চাঙ্কের নাটক। গজনির সুলতান মামুদ ও লাহোরের রাজা জয়পালের হিন্দুও মুসলমান বা যবন বিরোধ জয় পালের পরাজয় কাহিনী। এ নাটকে দুটি প্রধান মুসলমান চরিত্র হল— সুলতান মামুদ ও তার সেনাপতি রোহিম আলি। সৈনিক, দূত প্রভৃতি কয়েকটি অপ্রধান মুসলমান চরিত্রও রয়েছে। হিন্দু চরিত্রের সংলাপেও রয়েছে মুসলমান সমাজের পরিচয়। মামুদের ভারতবর্ষ আক্রমণের খবর পেয়ে জয়পাল "দাম্ভিক ম্লেচ্ছদিগের দর্প চূর্ণ করতে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। 'পাপিষ্ঠ' মুসলমানদের 'স্পর্ধা' দূর করবেন। এ দৃশ্যে (১/৩) মুসলমানের নিষ্ঠুর, পৈশাচিকতা বর্ণিত হয়েছে। ২য় অঙ্কে মামুদ ও জয়পাল রাজনীতি পেরিয়ে ধর্মীয় বিরোধ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ। মামুদ জানতে পেরেছে লক্ষণ সিংহ করদানে সম্মত নয়। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পরামর্শের বিরুদ্ধে জয়পাল—" আমি সেই মুসলমান ধর্ম্মে' পদাঘাত করি।" এই ঔদ্ধত্য শুনে "কি? দুরাত্মা কাফেরের এতদূর স্পর্ধা যে আমার সত্য মুসলমান ধর্মে পদাঘাত করে? .... দাম্ভিক কাফেরেরা ... এই

২৩। কোরানেব ১১৪টি সুরার প্রথমেই এটি আছে। বিচমিল্লাহের রহমানের রহীম..........…"

২৪। ইংবেজী বানান 'TAUBAH' অর্থাৎ **repentance** বা অনুতাপ, পাপের জন্য পরিতাপ **is a verbal noun derived from taba; The verb is often used in the Kuran, ... the validity of tawba depends on three things. 1. a conviction of sin. 2. renorse (madem) 3. a firm resoiut^on to obstain from sin in the future. First Encyclopaldia of Islam – E.J Brills. New york p. 704.**

হিন্দুধর্মে'র মস্তক চূর্ণ' করব"। ভারত বিজেতা অপেক্ষা আমি প্রতিমা বিলোপী খেতাব অধিক পছন্দ করি। রহিম। তুমি কাফেরদের যত দেবদেবীর মূর্তি আছে সব চূর্ণ করবে, যেন দেবমন্দিরের নামমাত্র না থাকে।"— এখানে ধর্মীয় বিরোধ স্পষ্ট। উল্লেখ্য ইসলাম দর্শন ধর্মের ব্যাপারে বলাৎকার সমর্থন করেনা। অপর ধর্মের উপর অত্যাচারও নয়।[২৫] সংলাপের ঘটনা ব্যক্তিক ধর্মীয় ক্রোধ মাত্র। রোহিম জেনেছে বাংলা পাঞ্জাবের মেয়েরা "খোপসুরৎ" "পরীর বাচ্ছা" দুনিয়ায় এরূপ চিজ বা সরেস মেয়েলোক নেই। স্পষ্ট রোহিমকে নারী লোলুপ করে আঁকা হয়েছে। আবার কল্পিত স্বর্গের নন্দনকাননে ভারতলক্ষী জানিয়েছেন— "........ মহম্মদীয় ধর্ম সনাতন হিন্দু ধর্ম পালন করবে।" তবুও ম্লেচ্ছ শূন্য করার অনুমতি চাইলে ইন্দ্র জানিয়েছেন "বিধির বিধানে ভারতে যবন কর কবলিত হবে।" পাশাপাশি যুদ্ধে "আল্লা .... ল্লা-হো" ইত্যাদিতে আকাশ বাতাস মুখরিত। শেষে পরাজিত জয়পাল মামুদের কারাগারে, ছদ্মবেশী সদানন্দ মামুদকে খুশী করতে বলে, — "আমি নিজে ওর (জয়পাল) মুখে গোস্ত পুরে দেব।" মামুদের সৈন্যরা ক্লান্ত। নইলে "দুগ্ধ পোষ্য বালক থেকে আশি উমরের (বছরের) বুড় পর্যন্ত আজ মহম্মদীয় শুলাগ্রে বিদ্ধহত, ..." মামুদের এ-সংলাপ নৃসংশতার উদাহরণ, যা ইসলাম সমর্থিত নয়। গরুর ঝোল, গোস্ত, হিন্দুমুসলমান বিরোধের এক সজীব উপকরণ,[২৬] পারিষদ মামুদকে বলেছে— "আমি মর্তে মহম্মদের প্রতিনিধি।" উত্তরে "মামুদ। তুমি ঠিক বুঝেছ।" জয়পালকে খালাস দিতে পারে, যদি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। ওর মেয়েকে আমায় দেয়। অন্যথায় সারাজীবন কারাগারে থাকবে। পরে ধরা পড়েছে মামুদ প্রেরিত ছদ্মবেশী সৈন্য। এখান্যে মামুদ হীন, চক্রান্তকারী মুসলমান। এরপরসে সরাব সেবনে মেতে উঠেছে। দেখা যায়, দুটি নাটকে নাট্যকার জাতীয় উন্মাদনায়, সমকালীন মানসিকতায়, শাস্ত্রীয় অশাস্ত্রীয় পর্দ্ধতিতে সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় রয়েছে।

৯. অজ্ঞাতনামা লেখকের নাটকে মুসলমান : সমাজ রয়েছে। 'প্রকাশক' যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটকটির নাম **'বীরনারী'** (১৮৮১)। ইতিহাসের পটে হিন্দু নারীর ওজস্বীতা ঘোষণাতে ইসলামের রাজ্য স্থাপনের বর্ণনা। দ্রোহীরাজ বা ডাহিরের সঙ্গে বসরাধিপতির সেনাপতি কাশিমের বিরোধ, শেষে, শৌয্যের মধ্যে হিন্দুর পরাজয় ও তলোয়ারের জোরে ভারতে ইসলামের রাজ্য প্রতিষ্ঠায় নাটকের যবনিকা।

২৫। আহমদ কবীর বলেছেন-বলপ্রয়োগ অন্যকে স্বধর্মে দীক্ষিত করার আদেশ কোরানের কোন স্থানে লেখা নাই। কোরানে ঈশ্বরের আদেশ হল-ধর্ম বিষয় বল প্রয়োগ না করে মানুষের জ্ঞানের সহযোগে নম্রতার সঙ্গে পরমেশ্বরের পথে আহ্বান কর ও তাদের সঙ্গে ভদ্রতার সঙ্গে ধর্মবিষয়ক তর্ককর।'- নবনূর পত্রিকা ১৩১০ বঙ্গাব্দ।

২৬. হিন্দু মুসলমানের বিভেদের কারণের মধ্যে গোহত্যা ও গোরক্ষা সমস্যাটি সর্বাপেক্ষা স্পর্শকাতর ও মারাত্মক। মুসলমান ই-দুল-আজহা' বা কোরবানী উৎসবে দাগ, মেষ, উট, দুম্বার সঙ্গে গরু কোরবান করে। বেদ উপনিষদে গোহত্যা বা গোমাংসে ভক্ষন নিষিদ্ধনা হলেও পরবর্তী কালে গরু দেবতা রূপে বিশ্বমাতা গোমাতায় পরিণত হয়। দ্রষ্টব্য: ড. ওয়াকিল আহমদের পূর্বলিখিত গ্রন্থে পৃ:৪০।

"কাফেরের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন মুসলমান ধর্মের নিয়ম বিরুদ্ধ (২/২)। বলাবাহুল্য এরূপ নিয়ম বা নীতি ইসলাম ধর্মে প্রশ্রয় দেয়না, বরং অন্য ধর্মের প্রতি সম্মান, উদারতা দেখানোর কথা ইসলাম দর্শনে ব.। হয়েছে।[২৭] আবার পর্দানসীন মুসলমানের ধর্মীয়-শাস্ত্রীয় রীতি।[২৮] নারীর বীরত্বে ক্রুদ্ধ দূত জানিয়েছে সন্ধি না হলে সেনাপতি— "অচিরাৎ এই আলোর নগরে প্রবেশ করবেন— শয়তানি হিন্দুধর্মকে ছারখার এবং দেবমূর্তি সকলকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে পদতলে দলন করবেন, হিন্দুদিগের পরমাসুন্দরী রমণীগণকে বন্দী করে খলিফার নিকট উপঢৌকন পাঠাবেন"।

তৃতীয় অঙ্কে যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক ইছফ খাঁ বলেছে—"এই হিঁদুর দেশ আমাদের -কাফের হিঁদুকে মুসলমান করব, তার ধন দৌলত লুটে আনব। তার পিঠে চাবুক মেরে ভুঁই চসাব। আর আমরা সুখে ফসল ভোগ করব।" এখানে শোষক শোষিতের চিত্র ফুটে উঠেছে। পাশাপাশি সৈনিকের সখেদ উক্তিতেই তার সমাজচিত্র— "বড়লোক হলে ভাল হত। কাজি মোল্লার ভয় করতে হত না, তারা কেবল গরীব দুঃখীদের নিয়েই টানাটানি করতে পারেন। কোরাণে আছে ছয়টার যাস্তি সাদি করবে না; কিন্তু বড় বড় সেখজিরা এক এক জেনানায় ছয় হাজার পুরে রাখেন, তাতে দোষ হয় না। আমরা গরীব দুঃখীরা ছয়টার জায়গায় সাতটা করলেই মুসকিল—কাজিকে পয়সা দাও (৩/১) কোরাণে উপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারলে উর্দ্ধতম চারটি সাদির কথা বলা আছে (পূর্বেই অলোচিত)। এখানে মুসলমান নয়, যেন আপামর ভারতের গরীব দুঃখীর সমকালীন পরিস্থিতি সাদিকে কেন্দ্র করে ব্যাখ্যাত হয়েছে। একাধিক বিয়ে করে নারীর মর্যাদা রক্ষিত হয় কিনা জানতে চাইলে—" ইছফ (সক্রোধে) কি স্ত্রীলোকের আবার মানুষের আত্মা, মানুষের হৃদয়? মূর্খ, একথা মুসলমানের কোন কেতাবে আছে?" এখানে ইসলামের বিকৃত, হীন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। অথচ ইসলামের উদ্ভবের কাল থেকেই নারীকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।[২৯] যুদ্ধক্ষেত্রের জয়ধ্বনিতে- আল্লাহ আকবর, জয় খলিফার জয়, জয় বসরাধিপতির জয়" ঘোষণায় যবন শিবির মুখরিত। এসময় কাশিমের নির্দেশে— মুসলমান কুচক্রী,

২৭। প্রাগুক্ত পাদটীকা ২৫ দ্রষ্টব্য।

২৮। পদাপ্রথা ইসলমামের একটা বিধান। নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঢেকে রাখা হল পর্দা, মুখ, হাতের কব্জি খোলা রেখে নারী পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে, রাজার করতে পারে, প্রয়োজনে আহত সৈনিকের সেবা, তলোয়ার নিয়ে ঘোড়ায় চেপে যুদ্ধও করতে পারে'-সাক্ষ্যাকারে ফেরদৌসী।

২৯। ইসলামের পূর্বে আরবে যে কোন দেশের তুলনায় নারীর অবস্থা শোচনীয় ছিল। নারী ছিল অস্থাবর সম্পত্তি, ভোগের সামগ্রী, অত্যন্ত ঘৃণার চোখে তাদেরকে দেখা হত। ইচ্ছামত স্ত্রী গ্রহণ ও তালাক দিতে পারত। —"ইসলামের ইতিহাস" কে. আলী, ঢাকা ১৯৮৫ পৃ১৫ কিন্তু ইসলাম অভ্যুত্থানের পর নারী শুধু সম্মানীয়া নয়, নারীপুরুষ উভয়েই সমমর্যদা সম্পন্ন। হজরত মহম্মদ স্ত্রী কন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ওয়াকিল আহমেদের পূর্বোক্ত গ্রন্থঃ পৃ. ১২৫।

নিষ্ঠুর শয়তানে পর্যবসিত, যা ইতিহাস বা ইসলাম ধর্ম সমর্থন করে না। নাট্যকার যবনের নিষ্ঠুরতা দেখাতে গিয়ে জাতিগত ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক দৃষ্টি কোনে ভুল করে ফেলেছেন। বেঙ্গল থিয়েটারে (১৮৭৫) ও এরিয়ান থিয়েটারের 'বীরনারী' অভিনয়ের সূত্র ধরে সিদ্ধান্ত করা যায় যে নাটকটির রচয়িতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। এই তথ্য দিয়েছেন ''বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস'' গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১০। নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্নের নাটকে মুসলমান সমাজপরিচয় ঃ

সংস্কৃত অধ্যাপক নবীনচন্দ্রের **''ভারতের সুখশশী যবন কবলে নাটক''** ১২৮২ বঙ্গাব্দ। নাটকটি প্রচলিত নাট্যসাহিত্য, নাট্য মঞ্চ ও বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসকারদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। কিন্তু সাতটি অঙ্কের এই নাটকে জাতীয়তাবাদ প্রচারে হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ব, বৈপরীত্যে ভারতে মহঃ ঘোরীর আক্রমণ কে কেন্দ্র করে মুসলমান সমাজ হেয় হয়েছে। নাটকে মুসলমান চরিত্র মূলতঃ দুটি— গিজনীর সুলতান মহম্মদ ঘোরী ও তাঁর অনুচর 'কুটবুদ্দিন,' কুতবুদ্দিন নয়। অবন্তির রাজকুমার পুষ্পকেতু অনঙ্গমঞ্জরীকে পেতে ঘোরীর সঙ্গে মিত্রতা করেছে। ভারতবর্ষকে ঘোরীর হাতে তুলে দেবার বিনিময়ে অনঙ্গলাভের ব্যর্থ চেষ্টা নাটকের বিষয়। এখানে মুসলমান হাস্যরসের পাত্র, মুসলমান সমাজ অবহেলিত। পৃথ্বীর স্পষ্ট উক্তি - ''যবনগণ বহুসংখ্যক নিকৃষ্টাশয়; নীচাচার!'' মামুদ 'নেমাজের' পর ভালো ব্যবহার করেছে। কিন্তু নাটকে ঘোরী ভীতু, হীন, পাপী দুরাচার সুযোগ সন্ধানী। এছাড়া নাটকে কিছু মুসলমান রীতি, সমাজগত কিছু বিষয় স্থান পেয়েছে। তবে নাটকের কাহিনী, নাটকীয়তার অভাবে ও নামকরণে নাটকটি অপরিচিতই রয়ে গিয়েছে। তবে তোবা আল্লা, নামাজ, খোদা প্রভৃতি শব্দ ও চরিত্র গুলো মুসলমান সমাজকে তুলে ধরেছে।[৩১]

১১। 'বঙ্গের পুনরুদ্ধার' নাটকে মুসলমান ঃ

বিপীনবিহারী ঘোষালের 'বঙ্গের পুনরুদ্ধার' (১৮৭৫) নাটকটি গনেশ দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দীন কেন্দ্রিক ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে রচিত। ৪০০ বছর মুসলমান শাসনের পর ''উষার আলোর মত হিন্দুর গগনে'' গনেশের আবির্ভাব ব্যাখ্যানই নাট্য বিষয়। এ নাটকে ম্লেচ্ছপতি দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দীন, ম্লেচ্ছ সেনাপতি ও মন্ত্রী প্রমুখ মুসলমান চরিত্র। এদের সংলাপ খুবই কম, কিন্তু হিন্দু চরিত্রের মুখে নানাভাবে মুসলমান সমাজ, হিন্দুর মানসিকতা, রাজনীতি, অর্থনীতির পরিচয় রয়েছে। চার অঙ্ক জুড়ে বঙ্গীয় যুবকগণ, শ্যামনগর, বিটুর ও রংপুরের জমিদার হারাধন বাবু ও গনেশবাবুর

৩০। দাড়ি: Beard Arabic lihyah or Zagan. The beard is regarded by Muslims as the badge of the dignity of manhood The prophet is related go have said. "Do the opposite of the polyheirsty and let your beard grow lone" And the growing of a beard is said to be Fitrah, or one of those customs which have been observed by every prophet: Dictionary os Islam'- by Thomas Patrich Hughes. Delhi 1973 p-40.

৩১. মূল নাটক : ভারতের সুখশশী যবন কবলে-শ্রী নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন কর্তৃক বিরচিত, কলি, সন ১২৮২।

নেতৃত্বে গিয়াসউদ্দীন ও মুসলমানের পরাজয়ে বঙ্গের পুনরুদ্ধার হয়েছে। কিন্তু উল্লেখ্য মুসলমান আমলে এরূপ পক্ষপাতের অভিযোগ কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেলেও গিয়াসউদ্দীনের শাসন, বিচার বিভাগে সুশাসক ও ন্যায় বিচারের কথা ইতিহাসে স্বীকৃত। গিয়াস সিংহাসন নিষ্কণ্টক করতে বৈমাত্রেয় ভাইদের চোখ উপড়ে বিমাতাকে উপহার দেন, কিন্তু 'সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া ইহাব. পর তিনি সর্বদা ন্যায়পরায়ণতার সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন'।[৩২]

১/২ এ ধোবার উপর যবনের অত্যাচারের কথা— ''দোস্ত আলি বলে একজন মুচুরমান একখান কাপড় কাচতে দিয়েছিল, তা ধোপা .... বাঙালীদের কাপড় যেমন দেরী করে; তেমনি দেরী করাতে দুপুরে মুচুরমানের মাগ (স্ত্রী) ধোপার রান্নাঘরে ঢুকে গোলমাল করেছে। ধোপা রাগ সামলাতে না পেরে ওকে মেরেছে। তাই এক মাস কয়েদ হয়েছে। এখানে 'বাঙালী' বলতে হিন্দুকেই বোঝানো হয়েছে। এটা সমকালেও দৃষ্ট হয়। এখনও অনেক শিক্ষিতও বলেন—'ও আপনি বাঙালী! আমি ভেবে ছিলাম আপনি মুসলমান'। —এই ভ্রম রয়েই গেছে। কাদম্বিনী বলেছে— ''বাঙালীদের ওরা দুপায়ে নেতুচ্ছে। তাই নারীকুল ঠিক করেছে স্বামী পুত্রকে'' যবনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহ দেবে। 'যবন' অর্থাৎ যে কোন অ-হিন্দু বা মেচ্ছ জাতি বিধর্মী। কিন্তু সেকালে মুসলমানকে নির্দেশ করা হয়। সরলাও বিয়ের পিড়িতে বসতে যে ম্লেচ্ছকে পরাজিত করবে তাকেই বরমাল্য প্রদানের শপথ নিয়েছে। তার মতে ম্লেচ্ছ প্রিয় কাপুরুষ এজন্য দায়ী। এখানে যবন, ম্লেচ্ছ ইংরেজেরই প্রতীক মনে হয়। সর্বত্র যায় হোক হিন্দু মুসলমান প্রিয় হয়েছিল বলে জানা যায় না। নাটকে জমিদার যুদ্ধে নেমেছে যবনের বিরুদ্ধে ঐক্য বদ্ধ হয়ে, দেশ স্বাধীনতার জন্য। যেন কৌশলে 'ইংরেজে'র বিরুদ্ধে সংগ্রামের আশা ব্যক্ত হয়েছে। শেযাবধি গনেশের হাতে ম্লেচ্ছপতির পতন ও ম্লেচ্ছ সৈন্যদের পলায়ন, গনেশের হাতে বঙ্গোদ্ধার সম্পন্ন হয়েছে।

১২. মহেন্দ্রনাথের নাটকে মুসলমান :

গিরিশ শিষ্য মহেন্দ্রনাথ বসু **''চিতোর রাজসতী পদ্মিনী''** (১৮৭৫) নামে একখানি নাটক লেখেন, যা ন্যাশেনাল থিয়েটারে একাধিকবার অভিনীত হয়। সুদক্ষ এই অভিনেতার নাটকে হিন্দুমেলা প্রভাবিত জাতীয়তাবাদীচেতনার ঢেউয়ের পদ্মিনী কাহিনী এঁকেছেন। বাংলা সাহিত্যে পদ্মিনী কাহিনী বিভিন্ন কলেবরে দেখা যায়— নাটক এবং অন্যত্রও। এর কাহিনী কর্ণেল টডের 'রাজস্থান' গ্রন্থ আশ্রিত- আলাউদ্দিনের প্রথমবারের চিতোর আক্রমণ, কৌশলে ভীম সিংহকে বন্দীকরণ,

৩২. 'বৃহৎ বঙ্গ' দীনেশচন্দ্র সেন, 'বাংলাদেশ ও পাক ভারতের মুসলমানদের ইতিহাস' কে আলী, ঈশ্বরী প্রসাদ, ড: আর, পি. ত্রিবেদী প্রমুখ ঐতিহাসিক গিয়াসীউদ্দীনকে 'ন্যায় বিচারক' বলেছেন।

ততোধিক চতুরতায় পদ্মিনী কর্তৃক স্বামী উদ্ধার। পুনরায় চিতোব আক্রান্ত, রাজপুতের পরাজয়ে পদ্মিনীসহ রাজপুত নারীদের 'অনলে' প্রবেশ, নাটকের সমাপ্তি। এরই মাঝে মুসলমান সমাজ চিত্র রয়েছে।

দুরাচার বিধর্মী যবন ভারতবর্ষ ছারখার করতে প্রবৃত্ত। "মনুষ্য রক্ত পান করা যাদের ধর্ম তারা এই নগরে প্রবেশ কর্ব্বে .... কত শত স্ত্রী হত্যা, ব্রহ্ম হত্যা, কত দেবদেবীর অবমাননা কর্ব্বে"— নাট্যকারের এই মনেভাবেই নাট্য বিষয় স্পষ্ট। যদিও এ সংলাপ নান্দীমুখে সন্ন্যাসীর মুখে হয়েছে। ধ্যানযোগে কল্পিত অলৌকিকতায় ধর্ম বিদ্বেষ ফুটে উঠেছে নাটক শুরুর পূর্ব্বেই। ১/২ গর্ভাঙ্কে "দুরাচার মুসলমানেরা সগর্ব্বে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছে"। রাজপুতও বাধা দিতে প্রস্তুত। আলাউদ্দিন পদ্মিনীর রূপলাবণ্য শুনে "পাগলের ন্যায়" বলেন— "সেই রূপবতীকে পেলে মনের সাধে হৃদয়ে লয়ে তার মুখ চুম্বন করব, ... প্রধান পাটরানী করবো"। এরপর "হিন্দুবেগম গোলাপ আর কাদম্বিনীকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এই 'হিন্দুবেগম' উল্লেখেই সম্রাটের চরিত্র উদভাসিত। এখানেই শেষ নয়— "উঃ কতক্ষণে আমাদের মিলন হবে? ভারবর্ষের যেখানে যা ভাল ভাল পুষ্প ছিল তা সকল ফুলের মধু পান করেচি। এখন বাকী কেবল পদ্মিনী। এ ফুলটির মধু কিছু রসেবসে খেতে হবে"। গোলাপ কাদম্বিনী এসে 'স্বগত' হয়ে গালাগাল দিয়েও নাচগানে আলাউদ্দিনকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছে। অনেক যুদ্ধের পর আলাউদ্দিনের ছলনায় ভীমসিংহ বন্দী। কিন্তু পদ্মিনী স্বামী ও নিজেকে কৌশলে মুক্ত করেছে। ৫/৩ এ "আল্লা আল্লাহো" বলে যবন জয়ী হলে নারী কুল "জহর ব্রতের অনুষ্ঠান" এ "বেগে অনলে" পদ্মিনী সহ প্রবেশ করেছে। নাট্যকার এ নাটকে রাজপুতদের বড় করে মুসলমানদের হীন করেছেন। মুসলমান সমাজ ধর্মও অনেকাংশে বিকৃত হয়েছে।[৩৩]

১৩। রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তির নাটকে মুসলমান :

'ভারত বিজয়' (১৮৭৫) নাটকটি ইতিহাস ও কল্পিত কয়েকটি চরিত্রের সাহায্য সমকালীন যুগ মানসিকতায় গড়ে উঠেছে হিন্দু শাসকের সঙ্গে মুসলমানের বিরোধকে কেন্দ্র করে। মুসলমান চরিত্র গুলো হল— গজনীর অধীশ্বর সাহাবউদ্দিন, সৈন্যাধ্যক্ষ কুতব, সাহাবের ভ্রাতুষ্পুত্র মামেদ ও তার আজ্ঞানুবর্তী রহীম এবং রক্ষক অনুচর ইত্যাদি। পৃথ্বিরাজের দৃষ্টিতে সুলতান সাহাবুদ্দিনের ২য় বার আসার কারণে যবনেরা দুরাচারী, নরাধম। ঘোরীর শিবিরে বন্দী পৃথ্বি কুতবউদ্দিনকে বলেছে "পাপিষ্ঠ যবন"। রাণা সহমরণে যেতে চাইলে সাহাবের সংলাপে চরিত্রের কদর্যরূপ—"সেকি .... কেবল দিল্লীর ঈশ্বরী ছিলে, এক্ষণে গজণি ও দিল্লী উভয় স্থানেরই ঈশ্বরী হবে"। যদিও পৃথ্বী স্বীকার করেছে "এক্ষণে যবনেরাই পৃথিবীর সর্বপ্রধান জাতি", মূল কারণ

৩৩। মূল নাটক: চিতোর রাজসতি পদ্মিনী মহেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত কলি, ১৩৮২, সন।

হিন্দু ও ভাবতায়দের অনেক্য। নাটকে ঘোরার চারত্র ইতিহাস অনুমোদন করে না। ঘোরীর মর্যাদা ঐতিহাসিকরা স্বীকার করেছেন।[৩৪]

নাট্যকার মুসলমানকে হীন করে এঁকে প্রতিবেশী ভাই মুসলমানদের আঘাত দিয়ে ফেলেছেন। ৬/২ দৃশ্যে প্রমথ জানায় "কুতব আমার জীবন রক্ষা করিয়া — আমার ধর্মরক্ষা করিয়াছে। আমি তাহার নিকট কৃতজ্ঞ"। এখানে নাট্যকার কুতব চবিত্রের মহান ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করেছেন এক ব্যর্থ প্রেমিকেব ছবি এঁকে। প্রমথ ইন্দুবালার প্রেমকে বাঁচাতে মুসলমান সমাজজাত কুতব প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে তাদের প্রেম ও স্বধর্মকে রক্ষা করেছে। এজন্য নাট্যকার অবশ্যই ধম্যবাদার্হ। শেষে যবনদেব দেশত্যাগ ও প্রমথ সিংহাসনারোহণে নাটকের যবনিকা পতন হয়েছে। নাট্যকার কুতব থাকলে মুসলমান সবাই নরাধম নয়, মহানও যে রযেছে, সেই স্বাক্ষর রেখেছেন।

এই পর্বে নাট্যকার তেরজন। অন্তত: সাতজনের নাটকে মুসলমান অনেক ক্ষেত্রেই হীন রূপে অঙ্কিত। যদিও অনেকেই দু-একটি মুসলমান চারিত্রে মহত্বের পরিচয় রেখেছেন। নারায়ণ চট্টরাজ লিখিত মুসলমান সকলেই নিষ্ঠুর, হীন, লুণ্ঠনকারী। জ্যোতিরিন্দ্রনাথে সেলিম, আলাউদ্দিন চরিত্র মহান বলেও, সাম্প্রদায়িকতাকে এড়াতে পারেননি। সেলিম মহৎ হয়েছে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতেই। "আল্লা" হয়েও আলাউদ্দিন শেষাবধি মহান। কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ মিত্র, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বিপীন বিহারী ঘোষাল, মহেন্দ্রনাথ বসু এবং রাজেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নাটক গুলিতে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মবিদ্বেষই প্রধান। অনেকক্ষেত্রে অনৈতিহাসিক, অনৈশ্লামিক ঘটনাও স্থান পেয়েছে। কয়েকটি মুসলমান, হীন হয়েও শেষে উদার মহান হয়ে উঠেছে। যেমন-রাজেন্দ্র নাথের কুতবুদ্দীন।

অন্যদিকে মধুসূদন দীনবন্ধুতে সমাজিক বাস্তব মুসলমানেরা মানবিকতায় কর্তব্য বোধে উজ্জ্বল, কার্যে মহানুভব। হানিফ, ফতিমা, তোরাপ স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। হরনাথ রায় ও উপেন্দ্রনাথ দাস অঙ্কিত মুসলমান সমমর্যাদা পেয়েছে হিন্দুর সঙ্গে। সার্বিকভাবে অধিকাংশ নাট্যকারেদের মানসিকতায় মুসলমান বিরোধিতা বেশী মনে হলেও, সমকালীন যুগের বলি হয়েছেন তাঁরা। চরিত্র গুলো সামাজিক হিসাবে অপেক্ষাকৃত রাষ্ট্রনৈতিক দ্বন্দ্বের প্রতিনিধিত্ব করেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। পরবর্তী নাট্যক্ষেত্রে তুলনামূলক ভাবে ভিন্ন চিত্র মিলবে।

৩৪। মহম্মদ ঘুরী বিখ্যাত রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাষ্ট্র পরিচালক ছিলেন। ধর্মভীরু হয়েও পরধর্মে ছিলেন সহিষ্ণু। হিন্দুদের প্রতি উদারতার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁর আমলে হিন্দু মুসলিম স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণে শিল্পকলার বিশেষ বিকাশ ঘটেছে। কে আলী. পূর্বোক্ত গ্রন্থ-২২।

তৃতীয় অধ্যায়

নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল থেকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ

এই অধ্যায়ের বিভিন্নমুখী ঘটনার ইঙ্গিত পূর্বের অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। তবুও স্মরণীয় নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিলের পর অস্ত্র আইন, মাদ্রাজ মহাজন সভা, ইলবার্ট বিল, কলকাতায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, গণপতি উৎসব, শিবাজি উৎসব, ডন সোসাইটি, অনুশীলন সমিতি, জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, সহবাস সম্মতি আইন, ভারতীয় কাউন্সিল আইন, মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা, বঙ্গের ব্যবচ্ছেদ, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন তথা জাতীয় জাগরণের জোয়ার চলেছে। উনিশ শতকের অর্থনৈতিব জীবনে পরিবর্তন, সাহিত্যে প্রাচীন ভাবধারার সঙ্গে পাশ্চাত্য প্রভাবিত আধুনিকতার সঙ্গে সমন্বয় চেষ্টা, রামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা, বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ প্রভৃতি নানা ঘটনাজালের প্রভাব রয়েছে সমকালীন সাহিত্যে, নাটকে। শতকের শেষ দিকে বাংলার সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনে ব্রাহ্মধর্ম, নব্য হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ বিশেষ ভাবে প্রভাব ফেলে। এপর্বের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের মানসেও তার প্রতিফলন পূর্ণতর রূপে স্পষ্ট। উল্লেখ্য গিরিশ পূর্ব কয়েকজন ও গিরিশের নাটকে মুসলমান সমাজ পরিচয়ই আমাদের আলোচ্য।

১৪। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের নাটকে মুসলমান ঃ কবি সুরেন্দ্রনাথের **'হামির'** (১২৮৭) আখ্যাপত্র সূত্রে 'ঐতিহাসিক নাটক'। এখানে অন্যান্য বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের মতই সমাজ তেমনভাবে না হলেও কিছু ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজ পরিচয় রয়েছে। চিতোরের রাণা ভীমসিংহের পৌত্র রাণা হামির কর্তৃক চিতোর পুনরুদ্ধারের ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে নাটকটি রচিত। মালদের মেয়ে লীলা হামিরের স্ত্রী। স্ত্রীর পরামর্শে দিল্লীর সম্রাট মোবারকের সঙ্গে যুদ্ধ করে চিতোর যবনমুক্ত করেছে। পাঠানদের বন্দী করেও শেষে মুক্তি দিয়েছে। এখানে চিত্রিত মুসলমান সমাজচিত্রে হিন্দু- মুসলমানের কোন ভেদনীতি প্রশ্রয় পায়নি।

প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে মুসলমান সমাজজাত রাজত্বের পরিচয়ে কমলা বলেন—"আজ বাদে কাল শিবপূজা ছেড়ে নমাজ পড়তে হবে"। ৬/১-এ সম্রাট দরবারে আমির খাঁর কথায় মুসলমান চিত্র— "তুমি আগে হিন্দু ছিলে। দিল্লীতে হালুয়া বেচে খেতে, এখন জাহাঙ্গীরের মেহেরবাণীতে তুমি মরদ আদমী বুনেছো"। খসরু খাঁ ঐতিহাসিক ব্যক্তি, আলাউদ্দিন খিলজীর পর বাদশা হন। এখানে ইসলাম বর্হিভূত প্রথা, বলপূর্বক ইসলাম ধর্মে কাউকে দীক্ষিত করানো। যদিও সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নানা কারণে অনেক হিন্দু স্বেচ্ছায় - অনিচ্ছায় মুসলমান

হয়েছে। এখানে ধর্মান্তরিত খসরুর মধ্য দিয়ে সাধারণ হিন্দুর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ এবং রাজানুকুল্যে উচ্চাসনে বসার কথা ঘোষিত হয়েছে— ঘটনাটি ইতিহাস সম্মতও বটে। একথা কে. আলি 'ইসলামের ইতিহাস' গ্রন্থে সবিস্তারে ব্যাখ্যাও করেছেন। উল্লেখ্য নাট্যকার ধর্মান্তরিত মুসলমানকে উচ্চমর্যাদা দিয়ে উদার মনের পরিচয় দিয়েছেন।

১৫। হরিশচন্দ্র হালদার রচিত "কালাপাহাড়" নাটকে মুসলমান সমাজঃ

রবীন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু হরিশচন্দ্র হালদার ইতিহাসের পরিচিত চরিত্রকে নিয়ে লিখেছেন 'কালাপাহাড়' বা 'ধর্মদ্রোহী' নাটক (১৮৮১ খ্রীঃ)। কালাপাহাড় মুসলমান আমলের ঐতিহাসিক হিন্দু ব্রাহ্মণ। প্রসিদ্ধ একটাকিয়া জমিদার, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে ভাদুড়ী উপাধিক কালাচাঁদ রায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে হিন্দুদের সমূহ ক্ষতি ও বহু দেবমন্দির চূর্ণ করেন। একে কেন্দ্র করে একাধিক উপন্যাস — নাটক রচিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে। মুসলমান ঐতিহাসিকরা ফরাসী ভাষায় লেখা ইতিহাসে প্রথম কালাপাহাড়ের উল্লেখ করেন।[১] ঐতিহাসিক, আলী জানিয়েছেন— বঙ্গদেশে সুলায়মান কররানীর (১৫৬৪-৭২) অন্যতম সেনাপতি ছিলেন কালাপাহাড়। তারই নেতৃত্বে উড়িষ্যা অধিকৃত হয় (ইসলামের ইতিহাস)। গৌড়ের বাদশাহ বরবক শাহের কন্যা দুলারী বিবি কালাপাহাড় ব্যতীত কাউকে 'বিবাহ করিব না' ঘোষণা করে। দুলারীর রূপ গুনে মুগ্ধ কালাপাহাড় বিবাহে সম্মতি দেয়, কিন্তু স্বধর্ম ত্যাগ করেনা। কিন্তু হিন্দু সমাজ বা পাণ্ডারা তাকে সমাজচ্যুত করলে ক্ষুব্ধ কালাচাঁদ প্রতিশোধ স্পৃহায় মুসলমান হয়ে 'মহম্মদ ফর্মুলি' নাম নিয়ে 'হিন্দু ধর্ম বিলোপ সাধনে উদ্যোগী হলেন।' উড়িষ্যায় জোয়ালপুর প্রভৃতির নানা মন্দির দেবদেবী, মূর্ত্তি ভেঙে চূর্ণ করে।[২] হরিশচন্দ্রের "কালাপাহাড়" যুগ প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে। রাজনৈতিক কারণে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ পর্বের সূচনা, নাটকটিও মূলতঃ সেই পর্বের ইতিহাস।

নাটকে মুসলমান চরিত্র লিপি — "কালাপাহাড় যবন ধর্মাবলম্বী ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, সোলেমান- বাদশাহ, ... যবনচর ইত্যাদি, পাত্রী— মতিয়া- যবন রাজকন্যা ও কালাপাহাড়ের প্রণয়িনী, সুরতিয়া— মতিয়ার সখী, ... ইত্যাদি।" নাটকের প্রায় সর্বত্র মুসলমান সমাজের কথা রয়েছে। শুরুতে সন্ধ্যাবেলা কালাপাহাড় দ্বিধাজড়িত হৃদয়ে বাদশা কন্যা মতিয়া (ইতিহাসে দুলারী বিবি)-র প্রেমে বিভোর। এজন্য ধর্মত্যাগ করে মুসলমান হতে চাইছে, আবার 'গায়ত্রী' জপ করছে। এসময় সুরতিয়া এসে তাকে "মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত" হতে উত্তেজিত করেছে। কালাপাহাড় "আল্লা আল্লা" ধ্বনিতে রাজকুমারীকে পেতে সর্বস্বত্যাগে প্রস্তুত। এমনকি প্রেমের জন্য ধর্মত্যাগ

১। আবুল কালাম মনজুর মোরসেদ- 'উপন্যাসে কালাপাহাড়', সাহিত্য পত্রিকা- ১৩৭১।
২। 'হিস্ট্রী অব বেঙ্গল'-যদুনাথ সরকার। 'বৃহৎবঙ্গ-দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি গ্রন্থে এ বক্তব্য রয়েছে।

ধর্মেরই কাজ বলে জানিয়েছে। সুরতিয়া মুসলমানের পরিচ্ছদের বর্ণনা দেয়— "তুমি দাড়ীরাখ, আমাদের মতন ইজের, আলখাল্লা পর, নামাজ কর, তাহলে আমাদের বিবিজান নিশ্চই তোমার প্রেমে আবদ্ধ হবেন। প্রকৃত যবন হও, যবনের কার্য্যকর ।" এরই উত্তরে কালাপাহাড় বলেছে— "আমি নিশ্চই ত্রিসন্ধ্যা নামাজ করব, হিন্দুর বেশ, হিন্দুর আচার, হিন্দুর ব্যবহার সমস্থই অন্তর্হিত করব। .... আমি মতিয়ার প্রেমে মুগ্ধ বলেই মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হচ্ছি, তা ভিন্ন আমার আর কোন উদ্দেশ্য নাই।" (১/১)। এ সংলাপে দ্বিধা দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত কালাপাহাড়ের মধ্যে নাট্যকার বেদ কোরানের উপদেশ এনে ইশ্বরকে এক করেছেন। ধর্ম-সম্প্রদায়ের উপরে প্রেম বড়- একথাই ধ্বনিত। ১/২-এ সুরতিয়া বলে— "এখনি কলমা পড়িয়ে তবে ছাড়ব।" 'কলমা' ইসলামী অনুশাসনে ধর্মান্তর গ্রহণের সময় বিশেষ শপথ। মুসলমান মাত্রেরই 'ফরজ' বা অবশ্যকর্তব্য 'কলমাপাঠ'। এরপর কালাপাহাড়ের সম্মতি আদায়ের কৌশলে মুসলমান পীর-ফকীরের কথা এসেছে। দাড়ি, সাদা থান, আল্লখাল্লা, পাগড়ি পরে সুরতিয়া পীর পোয়গম্বর সেজেছে-যা সবই মুসলমান সমাজ জাত। অবশেষে কোরাণের নামে পরীবেশী সুরতিয়া শপথ করিয়ে যবন করে নিয়েছে কালাপাহাড়কে। "মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত" "কালাপাহাড়" প্রকৃতই মুসলমান হয়েছে। আমাদের মত নূড় (নূর-মুসলমানের চিবুকে রক্ষিত দাড়ি) রেখেছে, চৈতন (ব্রাহ্মণের টিকে) কেটে ফেলেছে, পৈতে ছিঁড়ে ফেলেছে।" এরপর কালাপাহাড়ের হিন্দু-নিধন, হিন্দুদের প্রতিরোধ ও কালাপাহাড়ের জয়। কিন্তু মন্দিরের বিগ্রহের অবমাননায় অনুতপ্ত কালাপাহাড় স্ত্রী সরলার কাছে ক্ষমা চেয়ে স্বহস্তে "বক্ষে ছোরাঘাত" (৫/২) করে মারা গেছে। সরলাও স্বামীর কোলে মৃত্যু বরণ করেছে, মতিয়া আক্রোশে প্রায়শ্চিত্ত করতে অজানা পথে পাড়ি দিয়েছে।

নাট্যকার ঘটনা চরিত্র চিত্রণে অতীত ইতিহাসে চেতনা ও সমকালের রাজনৈতিক চেতনার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন কবতে পারেননি। মতিয়া চরিত্রে প্রথমে উগ্র সাম্প্রদায়িকতা, পরে যোগিনী হবার কোন কারণ দেখান নি। এ অপুর্ব্বত্ব কাহিনীকে যথার্থ পরিস্ফূট কবতে পারেনি। কালাপাহাড়কে ক্ষমা চাইযে আত্মহণনের পথ দেখিয়েছেন নাট্যকার, হিন্দুত্বেই ফিরিয়ে এনেছেন। স্বধর্মবোধেই তাই কালাপাহাড়ের শেষ উক্তি — "আর আমি যবন পিশাচ নই" (৫/২)।

১৬। রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটকে মুসলমান সমাজ ঃ নট, নাট্যকার, বঙ্গালয়ের স্বত্ত্বাধিকারী রাজকৃষ্ণ রায় প্রথম পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বই লিখে জীবিকার পথ রচনা করেন। অথচ বিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ তিনি পাননি।[৩] ফরাসি বিষয নিয়ে চুটকী

৩। সুকুমার সেন- 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'- ২য খণ্ড।

শ্রেণীর নকশা রচনার প্রথম কৃতিত্বও তাঁর প্রাপ্য।[৪] ফরাসী গল্প অবলম্বনে রচিত দুটি গীতিনাট্য তে বর্তমান বিষয় স্পষ্ট রূপ পেয়েছে।

ক) লায়লামজনু ঃ করুণ রসের গীতিনাটিকা "লায়লামজনু"। এর কাহিনীও চরিত্রে মুসলমান সমাজের ছবি আছে। সব চরিত্রই মুসলমান। চার অঙ্কের নাটকে আরবের বাদশাপুত্র কায়েম ওরফে মজনু এবং সদাগরের কন্যা লায়লা বা লায়লীর প্রেমকাহিনী নিয়ে বিষাদান্তক পরিণতি। কামোর বাঁদী মুন্না লয়লাকে ভয় দেখিয়ে তার মাকে বলে "ও গিন্নি, দাও সিন্নি পীরের কাছে।" কেননা বই হাতে স্কুলে গিয়ে "ঘুরছে বরের পাছে পাছে।" লেখাপড়া শেখাতেই যেন লয়লার প্রেমের আবির্ভাব, তাই মুন্নার ক্ষোভ। পরিত্রাণ পেতে তাই পীরের দরগায় সিন্নি দেবার কথা— এটা একটা গড়ে ওঠা বঙ্গীয় মুসলমানের রীতি। বর্তমানেও এই রেওয়াজ প্রচলিত আছে। স্কুল বন্ধ করে লয়লার অন্যত্র বিয়ে দেবার প্রস্তুতি চলে। এ অবস্থায় মজনু ফকির[৫] বেশে লয়লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। প্রেমানলে দগ্ধ লয়লা মজনুর মতই ফকির বা দরবেশ[৬] সেজে ঈশ্বরের নাম যপ করার বদলে মজনুর নাম যপ করে জ্বালা কমাতে চাইছে। ২/১এ "দরবেস্ বেশে কায়েম" লয়লার জন্য পাগল। চাকর 'সেলাম' জানিয়ে বাড়ী নিয়ে যেতে ব্যর্থ চেষ্টা করে। লয়লার বাড়ীতে বিবাহের বাদ্যি "কাড়া, নাগরা, ডম্ফ, রওসন, চৌকিবাদ্য ও কাফ্রি সং সম্প্রদায় (পারস্য লোকাচার, অনৈশ্লামিক) সহ ইব্রিস্লাম বরবেশে এসেছে। লয়লা তার স্বামী (মজনু) আছে বলে বিয়েতে রাজী নয়। এমনকি ইব্রিস্লাম কে 'ভাই' সম্মোধন করে। এতে ইব্রি "তোবা। তোবা।" বলেছে এবং ক্রুদ্ধ। ইব্রিস্লাম মুন্নাকে "নেকা করেঙ্গে" বলে প্রস্থান করেছে। কিন্তু মুন্নার "সাদী"র প্রস্তাবে মজনু তাকে 'কানুকো' বলে তাড়িয়ে দিয়েছে। ৩য় অঙ্কের শুরুতে রাতে দরবেস্ বেশে মজনু লয়লার বাড়ী গিয়ে মিলিত হয়েছে। এখানে 'আল্লা' 'খসম' 'সেলাম' প্রভৃতি শব্দগুলো মুসলমান সমাজ আশ্রিত। নাটকের শেষে লয়লা

৪। অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত'।

৫। ফকির—ইং FAKIR . Fakir has in consegunce come to indicate need in relation too Allah and dependence of every kind upon Allah, and is used Arabic speaking countries for a mendicant'. By E.J. Brilts First Encyclopaidia of Islam'-New work 1987. p-46.

৬। দরবেস্ 'Faqir, Persion Darwash, The Arabic word faqir signifies 'poor', but it is used in the sense of being in need of mercy, and poor in the sight of Good, rather than in need of worldly assistance. Darwesh is a perssion word, derived from der "a door"................ the terms are generally used for those who bad a relegious life' – 'A Dictionary of Islam'- by Thomas, Patrick, Delhi, 1973. p115.

আত্মহত্যা করলে "কবরশয্যা" রচনা করার ডাক দিয়েছে মোতিয়া। মৃত্যুর পর শবদেহের সৎকাজ করতে কবরস্থ করা মুসলমান সমাজে বিধেয়—বিশেষ নিয়মে মাটির নিচে মৃতদেহ শায়িত রাখা হয়। (প্রথম অধ্যায় এবিষয় বলা হয়েছে)।

খ) "বেনজির বদরে মুনীর" (১৮৯৩) নাটকটিতে মুসলমান চরিত্র রয়েছে। পঞ্চম অঙ্কের এই নাটকে চরিত্রগুলো মর্ত্যমানব নয় বা সামাজিক মানুষ নয়। পরীস্থানের পরী, জিন, বাদশা প্রভৃতি। জিনবাদশা ফিরোজ শা বেনজীর প্রমুখের মধ্যে আধা-বাংলা — হিন্দিতে মিশ্রিত সংলাপে 'বাদশা, বান্দা, সালাম' শব্দগুলো মুসলমান সমাজকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়া রাজকৃষ্ণ রায় সত্যনারায়ণের প্রচারে তিনটি নাটক লিখলেও ইসলামের কোন বক্তব্য উপস্থাপিত হয়নি।

১৭। মনোমোহন বসুর নাটকে মুসলমান সমাজ ঃ বাংলা নাটকের এক যুগ -সন্ধিক্ষণে মনোমোহন বস্তুর আবির্ভাব। তাঁর শেষ নাট্যরচনা **'আনন্দময়'** (১২৯৭) আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। এখানে কয়েকটি মুসলমান চরিত্র রয়েছে। নাটকটিতে সমাজ সমস্যার ভিন্নরূপ লক্ষিত হয়। আবার মুসলমান চরিত্রের আগমণে তাদের সমাজও এসেছে।

সামাজিক ষড়যন্ত্রমূলক পাঁচ অঙ্কের এই নাটকে আনন্দময়বাবুর সরলতাকে বাহন যে পারিবারিক জটিলতা, তারমধ্যে ২টি মুসলমান কেফাতুল্লা ও রহিমের আগমণ। চৌধুরী গড়ের কাছারিতে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে গরীব প্রজাদের অর্থনৈতিক যন্ত্রনার চিত্র। মুসলমান প্রজা দুটি কান্তময়ও রাধুর অত্যাচার বিধ্বস্ত। পীরের দরগায় সিন্নি দেয়, কিন্তু সবই নিস্ফল। "খোদার নাম" নেওয়া হয়নি। তাই যন্ত্রনার প্রকাশে বাস্তব অবস্থা — "কেফা হা আল্লা। .... শোন রইমে, তোরে কই, কাঁদবার ঠেঁই এ দুনিয়ার বিচে হেই করতার কাছে, আর পীরের দরগায়—" ইত্যাদি সমকালীন গরীব মুসলমানের প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট। আমিনের কারসাজিতে সব হারায় কেফাতুল্লা। কিন্তু তবুও আল্লা, পীর, জমিদার বাবুই এদের ভরসা। ৪/২ গর্ভাঙ্কে মুসলমান মাঝির সাক্ষ্যাৎ পাই, নাম সলিম। যুগানুসারে দাঁড়ি, মাঝিরা প্রায় সবাই মুসলমান সমাজ ভুক্ত ছিল। সামাজিক, অর্থনৈতিক - রাজনৈতিক কারণে পিছিয়ে পড়া অধিকাংশই এ ধরণের কাজের মধ্যে জীবিকা নির্বাহ করত। কেফাতুল্লা, রহিম এবং সলিম তারই প্রতিনিধি।

মনোমোহন বসু 'মামুদ গিজনী' বা 'সোমনাথ পতন' নাটক দুটিতে হিন্দুজাতীয়তাবাদ প্রকাশিত হলেও, আলোচ্য 'আনন্দময়' নাটকে অঙ্কিত মুসলমান বিকৃতির চেষ্টা নেই।

১৮। সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকে মুসলমান ঃ সতীন্দ্রনাথ রচিত **"আবুলকাশেম"** (১৩০৬) চার অঙ্কের গীতিনাট্য। অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যেও মুসলমান সমাজেব কিছু পরিচয় রয়েছে। উদার যুবক সম্পত্তি হারিয়ে নিরুদ্দেশের যাত্রী, সঙ্গী ভৃত্য মনু। বনে ফিরোজের সঙ্গে সাক্ষাৎ। ফিরোজের প্রেম নিবেদন প্রত্যাখ্যান করে কাশেম। বাদশা কাশেম কে সমুদ্রের জলে ফেলে দিলেও সে বেঁচে যায়। শেষে কাঙ্খিত দাহার্দ্দেনী ও কাশেমের মিলন ঘটে হারুণের চেষ্টায়। কাশেমের রাজ্য লাভ, হারুণের অনুরোধ ফিরোজকে গ্রহণ প্রভৃতিতে নাটকের সমাপ্তি। কাহিনী, চরিত্র, পরিবেশ গড়ে উঠেছে মুসলমান সমাজকে সামনে রেখে। দোকানি, ফকির, কাশেমের দরবেশ বেশ, উজীর ও কুলসমের প্রেমালাপে মুসলমানী রীতি, ফুপো, গোর বা কবর প্রভৃতি মুসলমান সমাজধর্ম থেকে আহৃত। 'ফুপো' মায়ের বোনের স্বামী। খসম অর্থাৎ স্বামী, "সাদিটে" অর্থে বিবাহ, এখানে নিকাহ্‌র কথা ব্যক্ত। ভোজন কালে সুরাপানের প্রসঙ্গ। সুরাপান কোরাণ নিষিদ্ধ হলেও মোগল আমলের থেকে তা মুসলমান সমাজে চলে আসছে, সৈয়দ আব্দুর রহমান ফেরদৌসী তার সাক্ষাৎকারে বলেছেন— "খয়রাত" বা দান আসলে মুসলমানে ৫টি ফরজের অন্যতম 'জাকাত'।[৭] ৪/১ গর্ভাঙ্কে মদ ও গান বাজনার কথা আছে। সুর ও সুরা সম্পর্কে ইসলাম দর্শনে বিধিনিষেধ থাকলেও মুসলমান সমাজে এটি প্রচলিত। বিকৃতি ঘটানো 'পানাহারে' ইসলামে 'হারাম' বা নিষিদ্ধ। আর যা কল্যাণময় সেগুলি 'হালাল' অর্থাৎ ভালো।

১৯। গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকে মুসলমান সমাজ ঃ নটনাট্যাকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাট্যরচনার কাল ১৮৭৭-১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে। এই সময় মৌলিক- অনুবাদ-নাট্যরূপ সহ ১০০টির বেশী নাটক লেখেন নানা ধরণের। তাঁর কয়েকটি নাটকে মুসলমান সমাজ পরিচয় আছে, সেগুলোই বর্তমানে আলোচনার বিষয়। ১১টি নাটক এক্ষেত্রে আলোচ্য, যাদের রচনাকাল ১৮৮১-১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে।

ক) আলাদীন ঃ "আলাদীন বা আশ্চর্য প্রদীপ" নামক পঞ্চরঙ্গটি হাসি-কল্পনাময় নাটিকা। রাজপথে আলাদীনও যাদুদণ্ড হাতে কুহকীর দেখা। উভয়ের বাহ্যিক চেহারায়, কথায় বোঝা যায় তারা মুসলমান' "আলা। বুড়ুয়া এ দাড়িয়া নড় নড়িয়া"— দাড়ি নড়াতে সমাজ পরিচয়। কবর, চাচা, দাদি অর্থাৎ বাবার মা, নানা অর্থাৎ মায়ের মা ইত্যাদি মুসলমান সমাজের জ্ঞাতি কুটুম্বের চিত্র। জিন বলে "সেলাম আলেকুম" — 'আস্‌সালাই আলেকুম' বলে প্রথম দর্শনে মুসলমান একে অপরকে

৭। যে কোন দানই খয়রাত। জাকাত ধনী মুসলমানের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য- ফরজ। তাবা আয়েব শতকরা আড়াই টাকা বছরে এবং উৎপন্ন ফসলের ১/১০ অংশ জাকাত দেবে আল্লার নামে। এই অর্থ গরীবের হিতার্থে ব্যয়িত হবে । সাখ্যাৎকারে ফেরদৌসী ৮.১০.১৯৮৫।

কুশল বিনিময় করেন, এখানে সেকথাও ব্যক্ত। "নিকে" প্রসঙ্গ মুসলমান বিবাহ রীতি। সাধারণত নারীর দ্বিতীয় বিবাহকে নিকাহ্ বলা হয়। স্বয়ং হজরত মহম্মদ নিকাহ করেছিলন খাদিজা বিবিকে। "আল্লা", "খোদার" দয়ার কথাতেও মুসলমান সমাজের ছবি ফুটে উঠেছে।

খ) 'আনন্দরহো' (১২৮৮ বঙ্গাব্দ) : রাণাপ্রতাপের সঙ্গে যুদ্ধ, শেষে সন্ধি প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ঐতিহাসিক ঘটনা ও কাল্পনিক চরিত্রের মিশ্রণে 'আনন্দরহো' গঠিত হয়েছে। চরিত্রে সংলাপে আচরণে মুসলমান সমাজ চিত্র রয়েছে। সম্রাট আকবর মুসলমান। পুত্র সেলিম, সৈনিকের কথায় "ঈদের দিনে"-র উৎসবের মত বলতে ইসলামের উৎসব কথা ব্যক্ত। মাতাল সেলিম উন্মত্ত হয়ে "আল্লা! আল্লা!" বলে নিদ্রিতা লহনার ঘরে এসে পড়েছে। কিন্তু নিজেকে "লহনার উপপতি" বলে মানতে রাজী নয়। আকবরের রাজ্যে খুন, বলাৎকারের সংবাদে যখন প্রজাকুল উদ্বিগ্ন, তখন সম্রাট স্ত্রীলোককে কিছু না বলে শয়তান কে বিনাশের আদেশ দেন। আকবরও লহনা প্রেমে মত্ত ইতাদি কাল্পনিকতায়, নানা রূপী মানসিকতায় মুসলমান সমাজের ছবি এঁকেছেন।

গ) নিমাই সন্ন্যাস : 'নিমাই সন্ন্যাস' (বা চৈতন্যলীলা ২য় খণ্ড) নামক জনপ্রিয় নাটকটি দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। ভক্তি রসাশ্রিত জীবনীমূলক নাটকের ২/২ গর্ভাঙ্কে নাগরিকদের কথাবার্তায় সমকালীন মুসলমান সমাজের পরিচয়। প্রথম প্রতিবেশী "কাজী" বা মুসলমান বিচারককে টিপে দেওয়াতে 'নেড়া' বেটাদের উপর অত্যাচরের কথা। দ্বিতীয় প্রতিবেশী "খবর নিচ্ছি না নবাব কাজী, মোল্লা, মুন্সী, বাহাত্তর পুরুষের খবর"— ইত্যাদিতে কাজী ছাড়াও মোল্লা-ইসলাম দর্শন ও ধর্মে অভিজ্ঞ শিক্ষক। এঁরা অশিক্ষিত মুসলমানদের ধর্মীয় বিধি বিধান শেখানোর জন্য ধর্ম যাজক রূপে নিয়োজিত হয়। বলাবাহুল্য কোরাণ হাদিসে এঁদের কথা নেই। পরে আলেমগণ মোল্লা মৌলবীদের প্রচলন করেন। নবাবের সম্পর্ক বর্ণনায় প্রতিবেশী— "আকবর বাদশার পিসে" ইত্যাদিতে নবাবের সঙ্গে হিন্দুর সমাজিক সম্পর্ক স্পষ্ট। ৩/৪- এ অদ্বৈত আচার্যের বাড়িতে হরিদাস চৈতন্যদেবকে বলেন, "প্রভু আমি অধম যবন, আমার দশা কি হবে?" উত্তরে আশা পূর্ণ হবার আশ্বাস দিয়েছেন চৈতন্যদেব। মুসলমান হরিদাস চৈতন্যর শিষ্য হয়ে বৈষ্ণবে পরিণত। যদিও এ নাটকে তা স্পষ্টভবে ব্যক্ত হয়নি।

ঘ) আবুহোসেন : "আবুহোসেন বা হঠাৎ বাদশাই" কৌতুকপূর্ণ গীতি নাট্যে চরিত্র গুলো সবই মুসলমান। আবুহোসেন বাগদাদের যুবক, হারুণ-আল-রসিদ বোগদাদের মালিক। উজির-মন্ত্রী, গোলাম ভৃত্য ছাড়াও সভাসদ, জল্লাদ হাকিম প্রভৃতি পুরুষ চরিত্র। রোশনা হারুনের পালিতা কন্যা বেগম-হারুণের স্ত্রী, বেগম পরিচারিকা, বিচার প্রার্থিনী প্রভৃতি মুসলমান নারী চরিত্র। তিন অঙ্কের গীতিনাট্যে মদের আসরে আবুর

অর্থ নিঃশেষিত। বন্ধুদের কথাতে রেস্ত, গেরস্ত, আদমী, খানা, তোফা, খোদা প্রভৃতি মুসলমানের নিজস্ব ভাষা। আবু বলে "খোদার মেহেরবাণি।.......... দিনকতক গেলে চলেযাব মক্কায়"। অর্থাৎ মুসলমানের একমাত্র উপাস্য খোদার নিকটে আর কদিন চালানোর প্রার্থনা।পরে মুসলমানের পবিত্র তীর্থ মক্কা চলে যাবে। দরবেশের গানে সমকালীন ছবি। পীর, ফকির, দরবেশ গণ আসলে ধর্মপ্রচারক। এরাই একদা বাংলাদেশে ইসলামের উদার বাণী নিয়ে আসেন।[৮] পরে দেশবাসীর প্রয়োজনে, হিন্দু মুসলমান ঐক্যের জন্য এঁরা উভয় সমাজের নিকট ঈশ্বর প্রেরিত অবতার স্বরূপ হয়ে উঠেন, সেই বোধ এখানে স্পষ্ট। এরসঙ্গে 'পর্দ্দানসিন', 'কালদানা' বা মুসলমানীভূত খসম বা স্বামী, 'হাকিম' বা চিকিৎসক পীরের দরগা প্রভৃতিতে মুসলমান সমাজ চিত্র ধরা পড়ে।

ঙ) কালাপাহাড় ঃ ইতিহাস খ্যাত কালাপাহাড়কে নিয়ে নাটকটি গড়ে উঠেছে। বাংলার নবাব সলিমানের সেনাপতি হয়ে ব্রাহ্মণ সন্তান কালাপাহাড় মুসলমান হয়ে উড়িষ্যারাজ মুকুন্দদেব কে সিংহাসন চ্যুত করেন, জগন্নাথদেবের মূর্তি নষ্ট করেন। এই ঐতিহাসিক সত্যের ভিত্তিতে একদা নাস্তিক গিরিশচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে কালাপাহাড়কে এক নতুন মাত্রা দেন। বাংলার সাহিত্যে কালাপাহাড়কে নিয়ে একাধিক গ্রন্থ রচিত হলেও আলোচ্য কালাপাহাড় সম্পূর্ণতঃ ভিন্ন। গিরিশ চঞ্চলা ও ইমানের মধ্যে যথাক্রমে স্বার্থ ও নিস্বার্থ প্রেমের সজীবত্ব দেখিয়েছেন। মুসলমান সমাজ বিভিন্নভাবে এলেও এখানে যে ভাব আঁকা হয়েছে, তা জাতিধর্ম নির্বিশেষে ধর্মানুরাগ ও ঈশ্বরপ্রেম। বস্তুত: পরমহংসদেবের সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রভাব এখানে রয়েছে।[৯] স্বয়ং গিরিশ 'রঙ্গালয়' সাপ্তাহিকে লিখেছেন বহুল প্রচলিত কথা—'মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিত হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে।" গিরিশ এক্ষেত্রে সেদিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। আবুল কালাম মনসুর মোরসেদ 'সাহিত্যে পত্রিকায় (১৩৭৬) লিখেছেন— 'সমকালীন নাট্যকারদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'কালাপাহাড়' নাটক। তার কারণ অন্যান্য নাট্যকারদের মত তিনি সাম্প্রদায়িক ছিলেন না।' এখানে জাতীয়তা বাদ নয়, নতুন সুরের সন্ধান মেলে। এই কালাপাহাড় ধর্মদ্বেষী, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হয়েও ভক্ত, প্রেমিক, যেন গিরিশেরই প্রতিরূপ — একদিকে তাঁর জীবন উচ্ছৃঙ্খলতায় ভরা, অন্যদিকে ভক্তির প্রাবল্য; কালাপাহাড়ের যুদ্ধ উন্মাদনা অপেক্ষা প্রেমগীতই অধিক প্রভাব ফেলেছে। এই নাটকে মুসলমান সমাজের নানা ছবি বিদ্যমান। পাঁচ অঙ্কের এই নাটকে মুসলমান চরিত্র আছে, ইতিহাস ও ইতিহাসের বিকৃতি আছে, ব্রাহ্মণ তনয় কালাপাহাড় প্রেমের উন্মাদনায় সুলতান সলিমান কন্যা ইমামকে সর্বস্বের বিনিময় পেতে চায়। প্রেমের টানেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আবার

৮। 'ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে প্রথম যিনি এসেছিলেন তাঁর নাম শেখ ইসমাইল'—লিখেছেন সুরজিত দাশগুপ্ত-'ইসলাম ও ভারত' গ্রন্থে।

৯। অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় — 'গিরিশচন্দ্র'।

প্রেমের প্রতিরোধ স্পৃহায় প্রণয়িনী ইমান মুকুন্দর কারাগারে গেলে ক্রুদ্ধ বীর হিন্দুরই বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে নির্যাতন, মন্দির বিনষ্ট করা কিছুই বাদ যায়না। তবুও ধর্মের মহত্বে প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব। ইমানের চারিত্রিক সৌকর্যে সে যেমন মহনীয়, তেমনি কালাপাহাড়ও আপন হিন্দু ধর্মকেই সত্য বলে স্বীকার করেছে।

এই ঘটনার বিভিন্ন স্থানে মুসলমান সমাজচিত্রের অভাব নেই। ইমানের রোগ সারতে আগে ফকিরিনী, হাকিম, বাঙালী কবিরাজ। প্রথম দুজন মুসলমান সমাজের। মুসলমান সাহাজাদীর অন্তঃপুরে পর্দ্দানসিনতা ভেঙে কালাপাহাড় প্রবেশ করলে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হয় কিন্তু ইমানের চেষ্টায় মোসাফেরের কল্পনায় কালাপাহাড় মুক্ত হয়েছে। তাদের বিশ্বাস জন্মেছে খোদা, মোসাফের রাখলে সকলেই বাঁচে। জেল দ্মারোগার কথায় জলের বদলে এসেছে 'পানি'। আর গালাগালিতে 'রাম' 'আল্লা' স্পষ্টই ধ্বনিত হয়। দারোগার কথায় মুসলমান বিবাহরীতি — 'সাদী' দেবার ইচ্ছা 'নানীর' সঙ্গে। ইমানের সখি দোলেনার কথায় মুসলমান সমাজচিত্র— "যদি তুমি আমায় ভালবাস। তাহলে আমি খসমটাকে তালাক দিয়ে তোমাকে নিকা করি।" খসম, তালাক, নিকা, সাদী, নানী প্রভৃতি শব্দগুলো নিতান্তই মুসলমানের, ঐশ্লামিক অনুশাসনাবদ্ধ। পাঠক এগুলোর ব্যাখ্যা ইতিপূর্বেই পেয়েছেন।

কালাপাহাড়ের ব্যর্থ প্রেমাকাঙ্খিনী চঞ্চলা কালার জন্য পাগল ইমানকে বুদ্ধি যুগিয়েছে তাকে মুসলমান বানাতে। সলিমানকে পরামর্শ দেয় তাকে মুসলমান বানালেই হিন্দু জব্দ হয়। কিন্তু শাহাজাদীকে মুসলমানের নিয়ম অনুসারে হিন্দু শিবিরে পাঠাতে পারেনি। চঞ্চলার চক্রান্ত সত্ত্বেও শাহাজাদী ইমান প্রেম-মাহাত্মেই মহিয়সী, মহান প্রেমিকার মর্যাদায় সমাসীনা। এরূপ উদাহরণ এ পর্যন্ত মধুসূদনের ফতিমা ব্যতীত খুব বেশী নেই। ইমান বলে— "তুমি আমার পরম মিত্র, আমার প্রাণেশ্বর, তুমি আমার ইষ্টদেবতা, জীবনের ধ্রুবতারা"। কিন্তু "তুমি আমায় স্পর্শ কোরোনা"। কারণ সে যবনী। আবার কালাপাহাড় মুসলমান হতে চাইলে ইমানই তাকে বাধা দিয়েছে। কেননা ধর্ম তার কাছে অনেক বড়। তবুও কালাপাহাড় প্রেমিকার বন্ধন দশায় উন্মত্ত হয়ে হিন্দুকে আক্রমণের শপথ নিয়েছে। জয়ী হয়ে নিষ্ঠুর কালাপাহাড় নির্মম অত্যাচারী হয়েও ইমানের কথায় শান্ত হয়েছে। অবশেষে ইমান কালাপাহাড়ের ধর্ম রক্ষা করতে, আপন প্রেমকে মহত্ব দিতে "এ্যায়া আল্লা" বলে আত্মত্যাগ করেছে, কালাপাহাড়ে ভক্তিবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে "শ্রাস্ত্র সত্য, হরি সত্য" কে স্বীকার করেছে। প্রেমের মাহাত্ম্য ঘোষণার সুযোগে উভয়ের স্বধর্ম রক্ষিত হয়েছে।

হিন্দু- মুসলমান ধর্মকথাও নাটকে এসেছে। নাট্যকারের মতে সব ধর্ম সমান, সমস্ত মানুষই মহৎ, প্রেমভক্তিই ঈশ্বরলাভের একমাত্র পন্থা— একথাই ঘোষিত হয়েছে। পয়জার, চাবুক, তোবা, আল্লা প্রভৃতি মুসলমান সমাজের কথা যেমন

এসেছে; তেমন রামকৃষ্ণ প্রভাবিত চরিত্র চিন্তামনির মুখে ঠাকুর আল্লার পরিচয় এই সংলাপে— "ছি। তুই ঠাকুর আর আল্লায় ভেদাভেদ করিস? এক বিভু বহু নামে ডাকে বহুজন, যথা জল, এক ওয়, ওয়াটার পানি .... গড্, ঈশ্বর, যিহোবা, যীশু নামে নানাস্থানে।"

চ) "মনের মতন" (১ম অভিনয় ১৯০১-২রা এপ্রিল ক্লাসিক থিয়েটার) : পারস্য উপন্যাস থেকে গৃহীত কাহিনী সূত্রে 'মনের মতন' গঠিত। নাটক হিসাবে উঁচুমানের না হলেও সমকালে দর্শক মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে সমস্ত মুসলমান চরিত্র নিয়ে কাহিনী গঠিত হয়েছে। বাদশা মির্জ্জান ও সেনাপতি বন্ধু কাউলফের প্রণয়িনী দেলেরা ও ধাত্রী সানিয়ার প্রেমের ভুলবোঝাবুঝি, অবশেষে সকলের মনের মত মিলন ঘটেছে। এখান বিভিন্নভাবে মুসলমান সমাজের বিবাহ রীতি ইসলামী প্রথা, কাজীর বিচার, ইসলাম বিকৃতি, প্রেম বিশ্বাস, চাওয়া পাওয়ার কথা প্রস্ফুটিত হয়েছে।

দেলেরা সেনাপতি দেখেই 'মন' দিয়েছে, অন্য কাউকে 'সাদী' করবে না। প্রেমের টানে ইসলামী অনুশাসন অমান্য করে "বাড়ীতে পুরুষ" নিয়ে এসে অসামাজিক কাজ করেছে। টাহারের কথায় সমকালের বিবাহ রীতি, অর্থনীতি সামাজিক রূপ—"টাকার জন্য এক বেটা কালপেঁচী কে ধরে বে দেবে", এতে সে রাজী নয়। নেহারের কথায়—"দেলেরা যেন পরীজাদ, ... মামদোর বাচ্ছা......... তোবা তোবা"। ইত্যাদি ছাড়াও "বাঁদীয় হাটের" কথাতে মুসলমান সমাজ ইতিহাসের বাঁদীপ্রথা উদ্ভুত। এই বাঁদীর জীবন ভেবে কাউলফ বেদনাহত। তাই সে বাঁদীদের কিনে নিয়ে স্বাধীনতা দিতে উদগ্রীব। এই ভাবনায় দীর্ঘকালের প্রচলিত বাঁদী প্রথা ও তাদের যন্ত্রনা যেমন উদ্ভাসিত তেমনি কাউলফের মহান মানসিকতা প্রকাশিত। মামদো, হুরী, কাজী, রসুলাল্লা প্রভৃতি শব্দাবলী মুসলমান সমাজজাত। মির্জ্জানের কথায় যথার্থ মুসলমানের ধর্মবোধ ও চারিত্রিক আতিথ্য স্পষ্ট—"আমি মুসলমান, তোমার সঙ্গে নুন রুটি খেয়েছি। .... তোমার আতিথ্য স্বীকার করেছি, ... বিবি সেলাম।" আতিথেয়তার মাহাত্ম্যেই মির্জ্জান দেলেরাকে শাস্তি দেয়নি, আবার ইসলামে সকলেই ভাই ভাই এই বোধও এখানে অনুসৃত ।

এছাড়া স্বামী বর্তমানে অন্য যুবায় প্রেম ইসলাম সমর্থন করেনা— এই শাস্ত্রীয় নির্দেশ অনুসারেই দেলেরা অপরাধিনী, তাই ইসলামের নিয়মেই তার স্বামী টাহার স্ত্রীকে 'তালাক' দিয়েছে। কিন্তু পরে ভুল বুঝতে পেরে স্ত্রীকে ফেরত পেতে চায় নিকাহের মাধ্যমে। তাই অন্য পুরুষের সঙ্গে দেলেরার বিয়ে দিতে কৌশলে পুনরায় নিকাহ্ করতে চেয়েছে টাহার। এখানে 'তালাক' নিয়মের বিকৃতি ঘটেছে। কারণ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী অন্য পুরুষকে নিকাহ্ করতে পারে নিয়ম মেনে, কোন পূর্বপরিকল্পনা বা 'জোটাজোট' চলেনা। একে ইসলাম সমর্থন করেনা । যদিও নাটকে

"মুসলমান নিয়ম অনুসারে" সিদ্ধ বলে প্রচলিত ভ্রান্ত ধাবণা গৃহীত হয়েছে। এই ধারণার উপর ভর করেই তালাকের ব্যবস্থা হয়েছে। নিকাহ প্রসঙ্গে "কাজীই হুকুম দিয়েছে তো, একজন বে, করে ছেড়ে গেলে তুই বে করতে পারবি।" এ ঘটনা ইসলাম সমর্থিত নয়। সর্বোপরি বড় কথা বিবাহ কাজীরা দেয় না। মুলসমান সমাজে নিষ্ঠাবান মুসলমানরাই বিয়ে দিয়ে থাকেন। শাস্ত্রানুসারে মৌলবী বা কাজীর প্রয়োজন হয়না। তবুও নিকাহ্ হয়েছে। রাতের আঁধারে বাসর ঘরে কাউলফ যথার্থ দেলেরাকে চিনে বলেছে—"কাজী দণ্ড দিতে পারবে কিন্তু কোরাণের নিষেধ বিবাহ রদ হবে না। শাস্ত্রমতে বিবাহ হয়েছে, তুমি আমার পত্নী।"৪/৭এ সব গোলমালের বেড়া ভেঙে সমরকন্দাধিপতির সামনে সকলের মনের মতন মিলন ঘটেছে।

ছ) ভ্রান্তি ঃ দুটি সমবয়সী মেয়ের নামে সামান্য গোলমালের ভিত্তিতে 'ভ্রান্তি' (১৯০২) পাঁচ অঙ্কের কল্পনামূলক, রোমন্টিকতা পূর্ণ নাটক। নিরঞ্জনের ভুলে ললিতার বদলে পুরঞ্জনের প্রেমিকা মাধুরীর সঙ্গে নিরঞ্জনের বিয়ে হয়ে যায়, পুরঞ্জন গৃহত্যাগ করে। ললিতাও বিবাগিনী। মাধুরী সরফরাজ খাঁর কুনজরে পড়ে, নিরঞ্জনকে তার পিতার মৃত্যুর জন্য দায়ি করিয়ে বধ্যভূমিতে নিয়ে যায়, পুরঞ্জন নিরঞ্জনকে উদ্ধারে এগিয়ে আসে। শেষে পুরঞ্জন-মাধুরী এবং নিরঞ্জন ললিতার মিলনে নাটক শেষ। পরিণতি মিলনের হয়েও চারিদিক বিষাদ। আর এতেই সফররাজকে কেন্দ্র করে এসেছে মুসলমান সমাজ পরিচয়।

বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খাঁ রাজমহলের জমিদার নারায়ণ কে বলেছে, উদয় নারায়ণের কন্যা দিলে সে মুক্তি পাবে। এখানে সরফরাজ নারী লোলুপ। কিন্তু সে পরে পরিবর্তিত। সে হিন্দু নারীকে ভোগ করা বা বিবাহ করাকে 'গুনাহ' বা পাপ বলে মনে করেনা। কারণ "আকবর শা চলন কিয়া হ্যায় হিন্দু লোক মুসলকানরা ঘরকে আওরাত দেতা থা।" কাজেই সে "কলমা পড়ায় কে ঘরমে" যে কোন হিন্দু নারীকে নিতে প্রস্তুত। বিনিময়ে তাদের উজিরী মিলবে। হিন্দু নারী ললিতা পুরঞ্জনের মুক্তির পথ বের করতে এলে সফররাজ ললিতার প্রতি লালায়িত। কিন্তু ললিতা কৌশলে বেগমদের পর্দানসিনতার কথা, নিকাহ্র কথা, নারীর অবগুণ্ঠন প্রথা ইত্যাদি এনেছে। ললিতা পুরঞ্জন - নিরঞ্জনকেই শুধু মুক্ত করেনি, সরফরাজকে নতুন মানুষে রূপান্তরিত করেছে। সরফরাজ বলেছে— "..........আজত্‌ক হিন্দুকা সব লেড়কি হামারা মায়ী" (৫/৩)। এছাড়া মুর্শিদকুলি খাঁ ও রঙ্গলালের কথায় "গৌকা গোস্ত" খাবার প্রসঙ্গে মুসলমানের সামাজিক পরিচয় প্রকাশিত। সর্বধর্ম সমন্বয়ের মানসে রঙ্গলালের সংলাপে জীবনসত্য ব্যক্ত হয়েছে— "ভগবান অবতার হয়ে প্রজার মঙ্গল জন্য রাজা যুধিষ্ঠির কে সিংহাসনে দিয়েছিলেন। মুসলমান যদি হিন্দু অপেক্ষা অত্যাচারী হ'তো তাহলে তিনি যবনকে ভারত অধিকার

দিতেন না।" শুধু তাই নয়, ৪/৬-এ মুসলমান প্রজাদের কথাতেও নবাব সরকারের সমাজচিত্র বিদ্যমান। তারা নবাব বাড়ীতে খেতে পাবে "একহাতা খিচুড়ী" এবং "একহাতা গোস্ত"। কিন্তু বৃদ্ধা পয়সা চায়, গোস্ত নয়, চিঁড়ে কিনে খাবে। এখানে প্রজাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা বাংলার চিরন্তন চিত্র সমাজ- ধর্ম- প্রসঙ্গে উন্মুক্ত হয়েছে।

দেখা যায়, বৈচিত্র্যপূর্ণ নাটক "ভ্রান্তি"তে রাজা, জমিদার, নবাবের কাহিনীতেও মুসলমান সমাজচিত্র, ইতিহাস — নবাব মহল, নারীলোভী হয়েও নারীকে শেষে 'মা' রূপে সম্মোধন, দেশ অপেক্ষা ধর্ম বড় ইত্যাদি সমকালীন বাস্তব চিত্রণে হিন্দু মুসলমান ঐক্য স্পষ্ট হয়েছে। সর্বোপরি মানুষই বড় হয়ে উঠেছে। গিরিশ জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় যথার্থ বলেছেন—মানবজীবনের অধিকাংশ সুখ দুঃখই কল্পনা প্রসূত, 'ভ্রান্তি'র উপর প্রতিষ্ঠিত, সত্যের সঙ্গে তার সংস্রব অতি সামান্য।

জ) সৎনাম : মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কালে বাংলাদেশে সৎনামী সম্প্রদায়ের বিদ্রোহের পটভূমিতে 'সৎনাম' লিখিত। মোগলবাহিনীর অত্যাচারে কৌশলে বৈষ্ণবীয় নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ, তাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজ ধর্ম এসেছে। পাঁচ অঙ্কের নাটকে সৈনিক, কৃষক ছাড়াও ৮টি পুরুষ ও ১টি মুসলমান নারী চরিত্রের সাক্ষাৎ মেলে, এছাড়া হিন্দু চরিত্রের মুখেও মুসলমান সমাজ প্রকাশিত। নায়িকা গুলশানা প্রেম প্রতিহিংসার বিপরীত দুই ভাবের দ্বন্দ্বে অপূর্ব চরিত্র হয়ে উঠেছে। ঔরঙ্গজেবকে গিরিশ এঁকেছেন আরও চমৎকারভাবে। সম্রাট রাজকীয় গুণে, ধর্মবোধে অপরূপ আদর্শ স্থানীয় হয়ে উঠেছেন। নাটকে মুসলমানকে ও তাদের দ্বন্দ্বকে তুলে ধরা হয়েছে এবং এ নিয়ে নানা বিরুদ্ধ মতবাদ প্রকাশিত হলেও দেখা যায় নাট্যকার সকলকেই চরিত্রানুসারে যথা সম্মান দিয়েছেন।

নাটকের শুরুতেই সৎনামী পরিব্রাজক ফকীররামের কথায় সম্রাট 'ঔরঙ্গজেবে'র লুঠতরাজ ও সৈন্যদের হত্যার বিবরণ, যবন সৈন্যদের "আল্লা আল্লাহো" ধ্বনি এবং গুরুদেব মহান্তর বাড়ী লুঠ করে তাকে মুসলমান বানানোর নিস্ফল চেষ্টার হত্যা করার ঘটনা। শিষ্য নরেন্দ্রর গুরু হত্যার ঘোষণা, মহান্তর একমাত্র কন্যা যবন হত্যার প্রতিশোধ নিতে পথে বেরিয়েছে। সৎনারীরা যবনের ছদ্মবেশ গ্রহণ করেছে। ধরা পড়লে চরণ নিজের পরিচয় দেবে— "মোল্লার ব্যাটা" ও করিমবকস্ মোর ফুপু, কালু মিঞার ব্যাটা মোর বাপের নিকে, হৈ আল্লা" — ইত্যাদিতে 'মোল্লা' মুসলমান সমাজ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, 'ফুপু' মায়ের ননদ, 'নিকে' অর্থাৎ নিকাহ্ বা পুনরায় বিবাহ। দুটি পাইকের কথায় মুসলমান সমাজজীবদের পরিচয় মেলে— "১ম পাইক। .... কারতরফ খাঁ ফৌজদারটা সেকেলে আকবরি আমলের মুসলমানের মত। .... কাফেরদের আর মুসলমানদের সমান এনসাফ করবে।" তাদের কাছে "সিকদার" ভাল, কারণ কাফেরের উপর, কাফেরের মেয়েদের উপর অত্যাচার করে। চরণের

কথায়— "আমি কাল মোল্লাকে ডেকে কলমা পড়বো।" যা ইসলাম ধর্মগ্রহণ করার প্রাথমিক শপথ। ফকীররামের মুখে — "মুসলমানের কি গুণ জানো? তারা কার্য চায়, আত্মগৌরব খোঁজে না। ছলে বলে কৌশলে বাদশার কার্য্য হলেই হল।" গুলশানার চাকর রহিম কর্তব্যপরায়ণ মুসলমান, আদর্শে মহান। সে হিন্দুর পোশাকে হিন্দুর সাথে মিশে প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর। গুলশানাও বিমলার ছদ্মবেশে বলে "হিন্দুধর্ম প্রেম উপাসনা, মহম্মদীয় ধর্মমাত্রসার।" বেদ ও কোরাণের মধ্যে কোনটি বড় তা জানতে চায়।

৪/১ গর্ভাঙ্কে করিম ফকীর ও চরণের কাছে সন্দেহ ভাজন হয়েছে, কারণ 'সেলাম' করতে গিয়ে নমস্কার' করেছে। অভিবাদনের রীতিতে করিম ধরা পড়েছে। গুলশানা সৎনামী যুবতীদের সাথে যুদ্ধে যোগ দিলেও তার মানসিকতাতে মুসলমান সমাজের বীরত্বের ও ঐতিহ্যের পরিচয় পাওয়া যায় — "আরে হীনপ্রাণ হিন্দুগণ, দলিবারে চাহ মুসলমান— কোরাণ জীবন যার যেই মুসলমান ধর্মবিস্তারের তরে, চন্দ্রকলা অঙ্কিত পতাকা ধরি করে, পৃথিবীর কাফের করেছে পদানত, দ্বন্দ্ব তার মনে, রমণীর অঞ্চল ধরি!" করিমের নিজের কথাতেও হিন্দু মুসলমান সমাজ পরিচয় — "না চাচা- না চাচা, মুই হিঁদু; মোর গলায় সূতি ছ্যাল চাচা, মুই মোল্লা ছ্যালুম চাচা, ঐ হালায় পুত নেড়ে ছিঁড়ে দিয়েছে চাচা।" এ সংলাপে অশিক্ষিত অবোধ নিজেকে হিন্দু ব্রাহ্মণ বোঝাতে 'মোল্লা', পৈতেকে 'সূতা' বলতে চেয়েছে। আবার মুসলমানকে 'নেড়ে' বলাটাও সমকালীন একটা বাস্তব চিত্র। আবার 'তালাক', বেদ, কোরাণ ইত্যাদির প্রসঙ্গ এসেছে, গুলশানার কথায় সমকালীন সমাজ—" কার্য্যে তো দেখি রন্ধন গৃহে কুক্কুর,বিড়াল প্রবেশ করলে ভোজ্যবস্তু নষ্ট হয়না, কিন্তু মুসলমান প্রবেশে সে সকল আহার্য্য দ্রব্য পরিত্যাগ করতে হয়। .... সামান্য পশুকে হিন্দু আদর করে, কিন্তু মুসলমান স্পর্শে হিন্দু আপনাকে অপবিত্র জ্ঞান করে।" (৪/৩)। শেষে হিন্দু ধর্মের মহত্ব প্রমাণে রনেন্দ্র মুসলমানী গুলশানাকে হিন্দুত্বে দীক্ষা দিয়ে বিয়ে করেছে। ধৃত করিম ভৃত্য হলেও সে চারিত্রিক দৃঢ়তার উদাহরণ। প্রভুর প্রতি নিষ্ঠায় কঠোর হয়েও বিধর্মী প্রভু কন্যার সেবা সে করবে না —" আমি মুসলমান হিন্দুর সেবা করবো না। .... ইমান ধর্ম্ম নিয়ে, বিধর্মীর দাসত্ব স্বীকার না করলে আমি বেঈমান হবো না।" ৪/৫ নিশ্চিত পরাজয়ের সামনে দাঁড়িয়ে ঔরঙ্গজেব ধর্মকে হাতিয়ার করে ঘোষণা করে— "রাজ্যে ঘোষণা দিয়ে অপেক্ষা করচি; যে কয়জন ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত .... কয়জন কোরাণ বলে .... কাফেরকে ভয় করেনা, ... কিন্তু দেখছি, কোরাণে বিশ্বাস আছে, পাঁচবার নামাজ করে, বোধ হয় এরূপ মহম্মদীয় বীরপুরুষ রাজকার্য্যে নিযুক্ত নাই। .... অতএব ইসলাম ধর্ম্মের সম্মান স্বয়ং বাদসাই রক্ষা করবে। .... কোরাণ হতে বয়েৎ উদ্ধৃত করে পতাকায় দেবো; প্রচার করবো,

"আমার প্রতি স্বপ্নে মহম্মদের আজ্ঞা হয়েছে, — কোরাণের বয়েৎ কেতনে থাকলে (সৎনামের) যাদু দূর হবে।" এখানে ঐশ্লামিক অনুশাসন প্রকাশিত। বিশ্বের মুসলমান ইসলামের 'ধর্মীয় নির্দেশেই অর্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকার সম্মান রক্ষা করতে দায়বদ্ধ।* প্রয়োজনে সম্রাট কাফেরদের উপর অত্যাচার করে ইসলামের স্থায়িত্বের উপর জোর দিয়েছেন। তাঁরকাছে সরাসরি ইসলামের জন্য সব করা যায়। যদিও এই সত্য ইসলাম অনুশাসন সমর্থন করে না। কিন্তু এখানে সম্রাট আপন মানস পূর্ণ করতেই নতুন করে 'জিজিয়া কর' প্রবর্তন করেছেন, আবার বৈষ্ণবী মারা গেলে যথার্থ সৎকারেরও নির্দেশ দিয়েছেন ঔরঙ্গজেব।

ঝ) সিরাজদৌলা : (১৯০৬) বিশ শতকের শুরুতেই বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সমগ্র বাংলাদেশে যে উত্তাল আবহাওয়া বয়েছিল, তখন কবি নাট্যকাররা স্বাভাবিক ভাবেই সেই উত্তাল ঢেউয়ে নিশ্চুপ থাকেন নি। স্বদেশানুরাগে অনেকের মতই 'গিরিশচন্দ্র সিরাজদৌলা' সহ কয়েকটি নাটক লেখেন। নাটকটি বাংলাদেশে ও বাংলার রঙ্গমঞ্চে আলোড়ন সৃষ্টি করে। যুগমানসিকতায় সিরাজ মহান জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক রূপে অঙ্কিত হয়। যদিও প্রেমের উচ্ছ্বাস, অতি নাটকীয়তা, বাস্তববোধের ঘাটতি নাটকে রয়েছে। এখানে মুসমলান সমাজচিত্র স্পষ্টরূপে দেখা যায়। বিশেষত: করিমচাচা অনবদ্য সামাজিক চরিত্র হয়ে উঠেছে। এছাড়া ঘটনায় ও চরিত্রের সংলাপে মুসলমাদের পরিচয় দৃষ্ট হয়।

মুসলমান চরিত্রদের মধ্যে উলেখযোগ্য — বাংলার নবাব সিরাজদৌলা, সেনাপতি মীরজাফর খাঁ, ওর পুত্র মীরণ, সিরাজর মামাতুতো ভাই সওকতজঙ্গ, মীরজাফরের কর্মচারী আমিরবেগ, নবাব পারিষদ করিমচাচা, মীরকাশিম, মহম্মদীবেগ, ভক্ত ফকীর দানশা প্রমুখ পুরুষ ও আলীবর্দী বেগম, কন্যা ঘসেটি বেগম, আমিনা বেগম, সিরাজের মাতা, সিরাজ পত্নী লুৎফাউন্নিসা প্রমুখ নারীচরিত্র। নাটকের মুখ্য ঘটনা সিরাজের সিংহাসন লাভ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিস্তৃত। সিংহাসনে বসা থেকেই শত্রু নিয়ে বাস করছিল সিরাজ। শত্রু সওকতজঙ্গের মুখে সিরাজের দুর্নাম প্রচারের পাশাপাশি ইসলামের অনুশাসনে প্রকাশিত —। মীরণকে বলা সংলাপে মুসলমানের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের এবং সিরাজও সওকতের চরিত্র উদ্ভাসিত — "ভাল ভাল মেয়ে মানুষ আমার শ'খানিক চাই। .... সিরাজ খুব ঝানু আছে। নৌকায় বেড়িয়ে দু'ধারেই ভাল মেয়েমানুষ দেখেছে—আর বেগম করেছে।" ইত্যাদিতে ইসলাম কিছুটা বিকৃত। কোরাণের নির্দেশ যথাযথ সম্মান জানাতে পারলে সর্বাধিক 'চারিজন' স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে (এবিষয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে)। সিরাজের হারেমে তার বেশী দাসী বাঁদী ছিল সত্য, কিন্তু তারা স্ত্রী বা বেগম নয়।

* প্রথম অধ্যায় বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে এবিষয়ে।

দানশা ফকীরের সিরাজ সম্পর্কীয় অপপ্রচারে মুসলমান শাসকের ছবি অতি নিষ্ঠুর ও ভয়ংকর (১/১১)। বলা বাহুল্য নবাবেরা সকলে এত ভয়াবহ ছিলেন না। দানশাকে 'মদ' দিতে গেলে—"আমি মুসলমান। সরাব খাবার পারি? তবে হঃ, ল্যাক্‌চে ল্যাক্‌চে নবাবজাদা দিলি গুনাহ থাকবে না।" এও সত্য নয়। ইসলামে মদ্যপান হারাম। আর এতে নবাব ফকীর সকলেই সমান। আবার মীরজাফর স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ধর্ম-কোরাণকেই করেছে হাতিয়ার। ওয়াট্‌সের সামনে পুত্র মীরণের মস্তকে হাত রেখে কোরাণ স্পর্শ করে প্যায়গম্বরের নামে শপথ করেছে যে, ইংরেজের সঙ্গে সন্ধিভঙ্গ হবে না। আবার আলীবর্দী বেগমের কাছে কোরাণ স্পর্শ করেই কথা দিয়েও বেইমানী করতে বাধেনি। যুদ্ধে গেছে "আল কোরাণের, প্যায়গম্বরের দোহাই" দিয়ে — বেইমানী করেছে দেশবাসী ও নবাবের সঙ্গে। অথচ ক্লাইবের আশংকা "নবাব মুসলমান, মীরজাফর মুসলমান" বলেই সিরাজের কাঁদা কাটিতে নরম হতে পারে। মীরণ মহম্মদীবেগকে যে অন্যায়ভাবে সিরাজ হত্যার আদেশ দিয়েছে মুসলমান সমাজ- ইতিহাসের চিত্র স্পষ্ট হলেও, তাতে অত্যুক্তি আছে। মহম্মদীবেগ— "আমি হুকুমদার নিমকহারাম নই। ..... যে নবাব তার হুকুম রাখবো।" কেননা আলীবর্দী সরফরাজ খাঁর রাজ্য কেড়ে নবাব হয়ে যা হুকুম করেছে — মেয়েমানুষ জোগাড়, বাদশা খুন ইত্যাদি। তাই জহরতের নেশায় খুন করে মক্কা যাবে তাতে সব পাপ ধৌত হয়ে যাবে। যদিও এসব মুসলমানের কর্ম নয়।

অন্যদিকে সিরাজ ও তার অনুগামীরা ইসলামের জন্য, মানুষের জন্য, স্বাধীনতার জন্য চিন্তাশীল। দানশা ফকীরের ভন্ডামী ধরা পড়ার পর সিরাজের সংলাপে যথার্থ মুসলমানের বিচার প্রসঙ্গ— " আমরা মুসলমান। তোমার অঙ্গে মুসলমান ফকিরের পরিচ্ছদ, এজন্য রাজবিদ্রোহী অপরাধেও তোমার প্রাণদণ্ড হলো না।" বেগমের সংলাপে আলীবর্দীর সামনে সিরাজের শপথে মুসলমানের দায়িত্ব প্রসঙ্গ "নবাবের মৃত্যু শয্যার পার্শ্বে কোরাণ স্পর্শ করে" প্রতিজ্ঞা মেনে চলার নির্দেশ। নাট্যকার দেখিয়েছেন আলীবর্দীর এই নির্দেশের জন্যই মীরজাফর প্রমুখ 'মানীর অসম্মান' করতে পারেনি নবাব। মীরজাফরের কাছে অনুরোধ করেছে— "মুসলমানের চন্দ্রাঙ্কিত পতাকা রক্ষা করতে কেবলমাত্র আপনিই সক্ষম।" কেননা সিরাজের নিকটে সিংহাসন রাজত্ব অপেক্ষা "মুসলমান গৌরব", "মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠা" অনেক বেশী সম্মানীয় — "মীরজাফর রাজেশ্বর হোক। .... আমার রাজ্য ত্যাগে যদি মুসলমান রাজ্য রক্ষিত হয়, এ ছার রাজ্যে প্রয়োজন নেই।" আবার স্বদেশপ্রেমী করিমচাচার সংলাপে মীরজাফরকে ব্যঙ্গ করার মধ্যে সম্মোধনে ও বক্তব্যে মুসলমানের পরিচয়— "চাচা তোমার কি কোমল প্রাণ। দেখছি তুমি চাচীর পার্শ্বে আর একজন চাচাকে বসিয়ে সেলাম দিতে পারো।" এছাড়া নবাব বেগমের উপর

জোর করতে গেলে লুৎফাউন্নিসার সংলাপে ঐশ্লামিক অনুশাসনে প্রকাশিত। মীরণ 'প্রেয়সী' সম্মোধনে নবাব বেগমের উপর জোর করতে গেলে লুৎফউন্নিসা— ''অবলাকে রক্ষা করা মুসলমানের ধর্ম্ম—সতীর সতীত্ব রক্ষা করা মুসলমানের ধর্ম্ম— তুমি মুসলমান, লোক ধর্ম্ম বিসর্জন দিয়োনা।'' কিন্তু পিশাচ মীরণের মন্তব্যে সেই অনুশাসন কে ধিক্কার দিয়ে মুসলমানের পত্নী ত্যাগী স্ত্রীর পুনঃবিবাহ — নিকাহ ও তালাক প্রসঙ্গ— ''সিরাজ তোমার তাল্লাক'' দিয়েছে, কাজেই সহজেই মীরণের সঙ্গে 'নিকাহ' করতে পার। যদিও বেগম নিকাহ দূরে থাক, মহান স্বামীর প্রেমে সব দুঃখ সহ্য করেও স্বামীর কবরে তাঁর আত্মার শান্তি কামনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছে।

ঞ) 'মীরকাসিম' : সিরাজদৌলার মতই একই মানসিকতায় ''মীরকাসিম'' রচিত। এ নাটকে মুসলমান চরিত্রগুলো— বাংলার নবাব মীরজাফর, জামাতা মীরকাসিম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদৌলা, দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম, মীরকাশিমের সেনানায়ক তকী খাঁ, মীরজাফরের বন্ধু সামসেরউদ্দিন, আলী ইব্রাহিম, মহম্মদ আমীন, হায়াতুল্লা, আলম খাঁ, জাফর খাঁ, আরাব আলি, সলিমন, মহম্মদ ইমান এবং নারী চরিত্রের মধ্যে মীরজাফর বেগম মনিবেগম, মীরকাসিমের বেগম, বাঁদী, নর্তকী প্রভৃতি নিয়ে ১৮ জনের বেশী। নাটকটি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জোয়ারে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রচেষ্টাই রচিত। এখানেও রয়েছে মুসলমান সমাজচিত্র।

যুগ মানসিকতার প্রভাবে জনপ্রিয় এই নাটকে মীরকাসিম উদার, জাতীয়তাবাদী মানুষ। ৫টি অঙ্কের ৪৫টি দৃশ্যের ঘটনার মুখ্যবিষয় — মীরজাফরকে সরিয়ে মীরকাসিমের বাংলার মসনদে আরোহণ, 'স্বদেশ বৎসলতার কারণে মীরকাসিমের সঙ্গে ইংরেজের বিরোধ, পরাজয়, অবশেষে মৃত্যু! মীরজাফরের অত্যাচারে প্রজারা 'হায়-হায়' করছে; মীরকাসিম নবাব হয়েই স্বদেশ চিন্তার মধ্যে স্বসম্প্রদায়ের সমকালীন অবস্থার প্রকাশ—'' যে মুসলমান চন্দ্রাঙ্কিত পতাকা সমস্ত পৃথিবীতে গৌরবের সহিত উড্ডীয়মান হয়েছিল, যে মুসলমান তরবারি কোষ হতে নিষ্কাষিত হলে ভূমন্ডল কম্পিত হত, যে মুসলমান পদে সমস্ত পৃথিবী সেলাম দিত, সেই মুসলমান আজ ইংরেজের নিকট ভিখারী।'' মীরকাসিম শত্রুর অপপ্রচারে 'নরপিশাচ' কিন্তু বেগমের সঙ্গে অলোচনা কালে তিনি যথার্থ মুসলমান, সমকালীন সমাজ স্পষ্ট। তিনি বাঁদী, খোঁজা, দাসীদের বিদায় দিয়েছেন কেননা— 'আমি বিলাসী নই, আমি ফলপ্রসূ বঙ্গভূমির নিমিত্ত কাতরা। .... শোষক ইংরাজকে বিতাড়িত করবো। ...... তবেই আমি নবাব, তবেই আমি মুসলমান, তবেই আমি মনুষ্য ......''। ইত্যাদিতে স্বজাতি প্রেম, মুসলমানের রাজ্য রক্ষার্থে ইসলামের পতাকায় ঐকান্তিক নিষ্ঠা, মনুষত্বের কথা ঘোষিত হয়েছে। আবার এই মীরকাসিম বেইমানদের বস্তায় বেঁধে জলে নিক্ষেপ করার নিষ্ঠুরতাও দেখিয়েছেন। তারা' মুসলমান সংসর্গে'' থেকে মিথ্যা

বলেছে, বিশ্বাসঘাতকতা মহাপাপ, নবাব পাপের সাজা দিয়েছেন। মীরকাশিমের প্রার্থনা - "বাঙ্গালা বাঙ্গালীর হোক"। সেজন্য ইংরেজকে সিংহাসন দিতেও তাঁর দ্বিধা নেই। এছাড়া মীরকাশিম সাচ্ছা মুসলমান। ধর্মীয় অনুশাসন মেনেই তাঁর "দুর্গে নর্তকী প্রবেশ করতে" পারেনি। সুজাউদৌলার আশ্রিত হয়েও মুসলমান সুজা যুদ্ধ পর্যুদস্ত মীরকাশিমের সঙ্গে বেইমানী করেছে। অর্থের লোভে। কাসিমের 'ধর্মভ্রাতা' সুজার কোরাণ স্পর্শ করে শপথ— সবই ধর্মের হাতিয়ারে স্বার্থসিদ্ধি। মুসলমান ওমরাহরাও পাপী— পাপীর বন্ধু। অবশেষে মস্তিষ্ক বিকৃত কাশিম মারা গেছে। আর মীরকাশিম বেগম পুরুষ সিংহের স্ত্রী সিংহিনী হয়েই কোন বাধা কে ভয় পায়নি। তিনি কর্তব্য পরায়ণা শুধু নয়, বিচক্ষণ, সাহসী। যুদ্ধক্লান্ত স্বামীর সঙ্গে বালক বেশে পালাতে পেরেছেন, সেময় বেগমের সংলাপে মুসলমান চিত্র—' ভারত বর্ষের সমস্থ মুসলমান হৃদয় কলঙ্কিত হয়েছে। .... স্বদেশের ক্ষমতা কারো হৃদয়ে নেই। "কাসিম বন্দী হলে বেগম ভেঙে পড়েননি। মারা গেলে শেষ দৃশ্যে স্বামীর পদতলে শোকে বিহ্বলা হয়েও চির বিদ্রোহিনীর শপথ নিয়েই মারা গেছেন।

অন্যদিকে মীরজাফরের স্ত্রী মনিবেগমেরওবুদ্ধিমতী, রাজনীতির কূটকৌশলী মুসলমানী রূপে চিত্রিত, কাসিমের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ স্পৃহাতেই, তারই কৌশলে মীরকাশিমের পতন হয়েছে। যদিও তাঁর স্বাধীনচেতা কর্মকুশলতা, ইংরেজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ মন্ত্রণায় যোগদান সমকালের মুসলমান সমাজে অসম্ভব বলেই মনে হয়। মীরকাশেমের তকী খাঁ বিদেশী, মহৎ, কর্তব্যপরায়ণ। কাশেম বেগমের আর্শীবাদ নিয়ে মুসলমানীত্বের জোরে ইরানের তরবারি নিয়ে ইংরেজকে শশব্যস্ত করেছে। কাঁধে গুলি খেয়েও "আল্লার নাম নিয়ে" রণজয়ে মেতেছে। অথচ কাটোয়ার যুদ্ধে হায়বতুল্লা, আলম খাঁ, জাফর খাঁ সকলেই বেইমান। আবার কোরাণে বিশ্বস্ত আলী সমরু মীরকাশিমের অনুগত হয়েও মীরজাফরের নোংরা কৌশল 'কোরাণ' ভেবে 'কাপড়ে জড়ানো ইট' স্পষ্ট করে কোরাণের মর্যাদা রাখতে বাধ্য হয়েছে, নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে। কাশেম তারই সঙ্গে যুদ্ধে আহত ও বন্দী হলে কাসিমের 'স্বগত' উক্তিতে মুসলমানের ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি মুসলমানের প্রতি ধিক্কার প্রকাশিত— একদিকে "কোরান স্পর্শ" করে সুজাউদ্দৌলার বেইমানী, অন্যদিকে কোরাণ জেনে ইঁট স্পর্শ করে প্রিয় প্রভুকে বন্দী করা। শেষে সব বুঝতে পেরে আলীই কৌশলে বেগমের সাহায্যে নবাব কাশেমকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছে। নাটকের শেষ দিকে সুজাও আপন কর্মের জন্য অনুশোচনায় ইংরেজের বিরুদ্ধে গেছে। মীরজাফর দুরারোগ্য 'কুষ্টব্যাধী' নিয়ে মীরকাশিমের কাছ থেকে সিংহাসনে পেয়েও "মহাপাতক" হয়ে পালাতে উদগ্রীব। হিন্দুনারী, গিরিশের ভাবের বাহন তারাদেবীর কথাতে মুসলমান শাসনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশিত। ইংরেজ অপেক্ষা মুসলমানই রাজা হিসাবে

অধিক শ্রেয়। "মুসলমান রাজ্যে হিন্দু মন্ত্রী, হিন্দু সেনাপতি .... মুসলমান রাজা স্বদেশী।" নাটকের শেষ দৃশ্যে — মীবকাশিম মারা গেলে তারার সংলাপে মীরকাশিমের মহত্ব ঘোষিত— "ভিক্ষার বিনিময়ে অর্থ সঞ্চয় করে, তোমাদের সমাধি কার্য্য সম্পন্ন করবো। তোমাদের স্মৃতি চিহ্নের প্রয়োজন নাই। কীর্ত্তিই তোমাদের স্মৃতি।" সমাধির প্রশ্নে 'কবর' এসেছে, নাটকে অনেকবার দেখা গেছে 'নিকা', "আল্লাহো ধ্বনি" ইত্যাদি মুসলমান সমাজ ধর্মের পরিচয়।

ট) 'ছত্রপতি শিবাজী' ঃ বর্তমান অধ্যায়ের শেষ নাটক "ছত্রপতি শিবাজী"। শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাদের মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বীরত্বের কাহিনী থেকে শিবাজীব মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনা স্থান পেযেছে। এরই মধ্যে মুসলমান চরিত্র, ঘটনার ও হিন্দু চরিত্রের সংলাপে মুসলমান সমাজ, শাসনাদি প্রকাশিত। এখানেও সমকালীন জাতীয়তাবাদী মনোভাব ও উদার দৃষ্টি ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

শুরুতেই দাদাজী কোণ্ডদেবের নিকটে শিবাজীর সংলাপে মুসলমান আমলের সমাজ রাজনীতির ইঙ্গিত— 'দেখলেম দেবমন্দির ভগ্ন গো হত্যায় পৃথিবী কলুষিত, অনাচার স্বধর্মী পীড়ন, ... মুসলমানরা পরস্পর পরষ্পরের প্রতি ইর্ষাণ্বিত।" এতে স্পষ্ট মারাঠা নেতার মুখে মুসলমানের অপশাসন, সমালোচনা, স্বধর্মের দুরবস্থাও ব্যক্ত। শিবাজী নাটকে উদাব মহারাজ। তাই মুলানা আহম্মদের সঙ্গে তার আতিথ্য, এমনকি হিন্দু-মুসলমান নারী পুরুষের মিলিত প্রেম চিত্র দৃষ্ট হয়। মুসলমান প্রজারা তাই মুসলমানের রাজ্য ছেড়ে শিবাজীর শরণাপন্ন "মহারাজ আমরা সপ্তদশ মুসলমান, বিজাপুরের সৈনিকদল .... মহারাজের অধীনে কর্ম প্রার্থনা করি। .... যদিচ বিজাপুর মুসলমানের রাজ্য। তথায় আমাদের দুরবস্থার পরিসীমা নাই। .... আমরা মুসলমান হয়েও আমাদের স্বাধীনতা নাই। .... মহারাজের রাজ্যে মুসলমানরা মহারাষ্ট্রের ন্যায় স্বাধীন।" শিবাজী তাদের চাকরী দিয়েছে, কারণ শিবাজীর হৃদয়ে হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ নাই। .... কাপুরুষে হিন্দু-মুসলমানে ভেদাভেদ করে।" শিবাজী "মুসলমান কুলনারীকে মাতৃ সম্মোধন করে"। আবার সম্রাট আওরঙ্গজেব শিবাজী সন্ধি প্রস্তাব এনে অসম্মান করলে ক্ষুব্ধ শিবাজীর সংলাপে ঐশ্লামিক অতিথি আপ্যায়ণের কথা— "মুসলমানের প্রধান ধর্ম অতিথি সৎকার।" কিন্তু বাদশা তা লঙঘন করেছেন। তৃতীয় শক্তি ইংরেজ এসেছে (অনৈতিহাসিক) মন্দির-মসজিদ ভাঙছে, হিন্দু মুসলমান কে খ্রীষ্টান বানাচ্ছে। এসময় নাট্যকার অঙ্কিত শিবাজী জাতীয় নেতা-" প্রজা আমার পুত্র, এতে হিন্দু-মুসলমান নাই। তাদের মসজিদ ভঙ্গ হয়েছে, শিবমন্দির ভঙ্গের ন্যায় আমার প্রাণে ব্যথা লেগেছে" যুদ্ধে হৃত সব মুসলমানকে মুসলমান দিয়ে "কবর" দেবারও আদেশ দিয়েছেন শিবাজী।

বিজাপুর দরবারে খোবান, আফজল বেগমের কাছে "নমাজ করতে করতে"

বলে "শয়তানের বেটা" শিবাজীকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে, কেননা" "মুসলমান মুসলমানের মত কাজ" করবে, তাহলে "খোদা" রাগ করবেন না। তাই আফজল খাঁ ঠিক করেছে — "আবাল বৃদ্ধ বণিতা কোতল করবো, ভূতের মন্দির ভাঙ্গবো।" ইত্যাদিতে ইসলামের অনুশাসন কে মান্য করা হয়নি, ইসলাম এই বিদ্বেষ সমর্থন করে না। পরে আফজলের বন্দীর অবস্থা প্রকাশ কালে মুসলমান সমাজ— "দেখো, ডরে ওরা পা কাঁপ্‌চে — যেমন জবাইয়ের আগে গো কাঁপে, তেমনি কাঁপচে"। সম্রাট আওরঙ্গজেব ইসলামের জন্য মুসলমান প্রেমী, চন্দ্রাঙ্কিত পতাকা রক্ষার্থে কোন কিছুতেই তিনি পিছপা নন। অথচ দিলীর খাঁ ইসলামের ও সম্রাটের যথার্থ সেবক। তাই ধর্মের নামে অনাচার, অন্ধ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেন না। ২/৫,এ সম্রাট ও দিলীরের কথাবার্তায় সেই ইসলাম ধর্মের কথাটা স্পষ্ট" আওরঙ্গজেব নিষ্ঠুর ইসলামের জন্য। তাঁর সংলাপেই তা ব্যক্ত— "আমি পিতৃদ্রোহী ভাতৃদ্রোহী... ... ভোগবাসনার নিমিত্ত নয়।" উদ্দেশ্য "সমস্ত ভারতবর্ষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী করা" তাই যে বিধর্মী ইসলাম ধর্মগ্রহণ করেছে, সে পরম শত্রু হলেও তার প্রতি সম্রাট বিরূপ হননি" কখনো। এ শুনে খুশী হয়েও দিলীর যর্থার্থ মুসলমানের মত বলে— উদ্দেশ্য মহৎ হলেও বলপ্রয়োগ ঠিক নয়। কিন্তু উত্তরে সম্রাটের সংলাপে ইসলামী 'কেতাব' বিকৃত হয়েছে। "আওরঙ্গ। .... কেতাবে স্পষ্ট লেখা আছে, ইসলাম ধর্মগ্রহণ করাবার নিমিত্তে কাফের কে বোঝাবে ভয় প্রদর্শন করবে, অবশেষে প্রাণ বিনাশ করবে।" বলাবাহুল্য 'ভয প্রদর্শন' 'প্রাণবিনাশ' ইসলামে নির্দেশ দূরে থাক, কোন কেতাবে বলপ্রয়োগের কথাও নেই। কোরানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে 'ধর্মপ্রচারের নিমিত্ত কদাচ বলপ্রয়োগে করিও না।" দিলীরের ভাষায় তা স্পষ্ট—" কোরানের অর্থ অতি উদার। মানব হৃদয়— ভয় প্রদর্শনে কুঞ্চিত হয়, ... উদারতা ভিন্ন মনুষ্য কখনো বিমল সত্য উপলব্ধি করতে পারে না। বাদসার উদ্দেশ্য অতি মহৎ, কিন্তু বলপ্রকাশে সেই উদ্দেশ্য সাধন বাহ্যিক অধীনতাই সম্ভব হলেও "প্রেম ব্যতীত" প্রকৃত অধীনতা অসম্ভব। সম্রাট বলেন "যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করেছে, সেই কাফের।" ইসলামের প্রতি অনাস্থায় "প্রাণ বধ বিধি"। দিলীর তাও মানেননি, কারণ শাস্ত্র বিচারে "প্যায়গম্বরের প্রেমের রাজ্য।" ধর্ম তর্কে পরাভূত সম্রাট অবশেষে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম বিস্তারের আদেশ দিয়ে "নমাজ" এ গেছেন।

কিন্তু আওরঙ্গজেবে বুঝেছেন শিবাজীর নৌবল খর্ব করতেই হবে; এর বিশেষ কারণ শিবাজীকে দমানো শুধু নয় "শিবাজীর নৌবল খর্ব না হলে মক্কাযাত্রী মুসলামনের বড় বিপদ।" কেননা, মক্কায় 'হজ্ব' করা মুসলমানের অবশ্য 'ফরজ' বা কর্তব্যের অন্যতম একটি। এখানে রাজনীতি অপেক্ষা 'ধর্ম'ই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া আওরঙ্গজেব কোষাগার মজবুত করতে "প্রত্যেক হিন্দুর মস্তকের উপর জিজিয়া

কর'' স্থাপন করেছেন। কেননা ''আমি মুসলমান, মুসলমানের কোরাণের হুকুম পালন করবো''। এই সংলাপ কোরাণ নির্দেশিত নয়। মুসলমান মাত্রই কোরাণের নির্দেশ মত আয়ের এক দশমাংশ দান খররাতের (জাকাত) জন্য রাখতে যেমন বাধ্য, তেমনি অর্ধচন্দ্র পতাকা রক্ষার্থে মুসলমান মাত্রই অনুশাসন অনুসারে যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য; কিন্তু মুসলমান রাজ্যে হিন্দু বা অন্য ধর্মাবলম্বী বাধ্য নয়। সে কারণেই মোগল আমলে স্থির হয়েছিল যেহিন্দু যুদ্ধে যোগ দেবে তাদের বাদ দিয়ে সমস্ত অ-মুসলমান সাম্রাজ্যের শান্তিবৃদ্ধির নিমিত্ত ''জিজিয়া'' নামক অতিরিক্ত কর দেবেন। আওরঙ্গজেব তা পুনঃপ্রবর্তন করেন মাত্র।[১০] প্রত্যেক হিন্দবু উপর এই কর প্রয়োগ সমর্থন যোগ্য নয় (এবিষয় অনেক গ্রন্থে ও প্রবন্ধে তার প্রমাণ রয়েছে)।

গিরিশচন্দ্রের নাটক গুলোতে মুসলমানের বিভিন্ন মুখী চিত্র দৃষ্ট হয়। তবে সার্বিক ভাবে হিন্দু-মুসলমান উভয়ই মম্মানীয় মর্যাদা পেয়েছে। বাল্যে গিরিশচন্দ্রের মুসলমান সমাজের বকরী ঈদকে কেন্দ্র করে মুসলমানের প্রতি ভীতির কথা অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'গিরিশচন্দ্র' গ্রন্থে উল্লিখিত হলেও; পরবর্তী কালে গিরিশ মানসে নানা পরিবর্তন ঘটেছে ধর্মও সমাজবোধের ক্ষেত্রে। যৌবনের শুরুতে অভিভাবক হীন হয়ে স্বেচ্ছাচারী যেমন হ'ন, তেমনি সমকালে শিক্ষিত সমাজের ধর্ম বিপ্লবের দিনে দ্বিধায় গিরিশচন্দ্র নাস্তিক হয়েও ওঠেন । পরে রামকৃষ্ণের প্রভাবে সর্বধর্ম সমন্বয়কেই আশ্রয় করেন। বিশ শতকের গোড়ায় নবজাগরণ ও দেশাত্মবোধের জোয়ারে নিজেকে নিয়োজিত করেন নাট্যরচনাও অভিনয় মধ্যে দিয়ে। বিশেষতঃ সাহিত্যে স্রষ্টা বিশ্বনবী রূপে নাট্যশিল্পের সেবা করতে গিয়ে গিরিশচন্দ্র যথার্থ মানুষের মঙ্গল কামনাতেই আত্মনিয়োগ করেন। তাই নাটকে বিভিন্নমুখী দৃষ্টিকোণ আশ্রিত হলেও মূলতঃ তিনি উদার স্বচ্ছ-বোধসম্পন্ন নাট্যকার রূপেই পরিগণিত। আর তাঁর নাটকগুলোতে পুঁথিগত বিদ্যা ও জনসমাজের কিছু অভিজ্ঞতা বলে মুসলমান সমাজচিত্র এসেছে। অনেকক্ষেত্রে সেজন্যই বিকৃত তথ্য কিছু স্থান পেলেও সার্বিকভাবে হিন্দু মুসলমান কেউই ছোট হননি।

আলোচ্যপর্বে নাট্যকারদের রচনায় মুসলমান চরিত্র সার্বিকভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গেই অঙ্কিত। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের নাটকে হিন্দু আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েও মুসলমানকে আদরণীয় করেই এঁকেছেন; কোন ভেদনীতিকে আশ্রয় করেননি। নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিলের ফাঁস নাট্যমঞ্চের সামনে থাকলেও এসময়ের নাট্যকাররা হিন্দুপ্রীতি সত্বেও ইংরেজ বা মুসলমান কাউকেই হীন করে আঁকেন নি— হরিশচন্দ্র হালদারের নাটকেও তা দৃষ্ট হয়। রাজকৃষ্ণ রায় অঙ্কিত মুসলমান ও বিকৃত হয়নি, বরং কাহিনী- বিষয় বাস্তবানুগ। মনোমোহন বসুর হিন্দুয়ানীতে যথেষ্ট প্রীতি, শ্রদ্ধা সত্ত্বেও তাঁর অঙ্কিত মুসলমান হীন

১০। ফেরদৌসী সাক্ষাৎকারে বলেছেন কথাগুলো।

নয়। সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ে ধর্ম- সমাজ-তত্ত্ব কথা ব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু মুসলমান চরিত্রগুলোও শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছে। গিরিশচন্দ্রে মুসলমান সম্মানের সঙ্গেই অঙ্কিত। যদিও অনেক সময় ঐশ্লামিক অনুশাসন ও প্রথার গোলক ধাঁধায় পড়ে কিছুটা বিকৃত ঘটনাদির পরিচয় দৃষ্ট হয়। কিন্তু সার্বিক ভাবে হিন্দু- মুসলমান এক আসনেই অধিষ্ঠিত। বিশেষতঃ তাঁর (আলোচিত) শেষ নাটক গুলোতে মুসলমান প্রধানত: মহান। ছত্রপতি কে মহৎ করলেও মুসলমান অসম্মানীয় নয়। ঔরঙ্গজেব নিষ্ঠুর হলেও ধর্মের ঐকান্তিকতাই আদর্শ মুসলমান। সিরাজদ্দৌলা, মীরকাসিম মহৎ। পরবর্তী অধ্যায়ের নাটকে দেশাত্মবোধের জোয়ারে আমরা মূলতঃ হিন্দু মুসলমান ঐক্য চিত্রই প্রত্যক্ষ করবো।

চতুর্থ অধ্যায়

১৯০১-২৩ খ্রি. পর্যন্ত বিষয়কেন্দ্রিক আলোচনা

বর্তমান পর্বটি বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক কাল শুধু নয়; এ সময়ে বাংলাদেশ-ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীতে অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেছে। বঙ্গদেশে এই সময়তে সমকালীন ইংরেজ শাসক দেশীয় প্রতিবেশী হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সত্তাকে ভয় পেয়েছিল। নানাকারণে স্বাধীনতার আন্দোলন যখন দানা বেঁধে উঠেছিল, তখনই ইংরেজ নিজের স্বার্থে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদকে বাড়াতে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ঘটায়। এরই ফলে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন হল শুরু। এরপর সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন, মর্লিমিন্টো সংস্কার, অহিংস আন্দোলন, জালিয়ান ওয়ালা বাগ হত্যাকান্ড, অসহযোগ আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক ভাগ বাঁটোয়ারা নীতির কার্যক্রম শুরু, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রভৃতি ঘটনার ঘনঘটায় জাতীয় আন্দোলন ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছচ্ছে; ১৯২১-২২ - এ গান্ধীজীর পরাজয়, খিলাফতের সঙ্গে সহযোগী প্রচেষ্টার ব্যর্থতায় মূল কয়েকটি ধারা জন্ম নেয়। উগ্রজাতীয়তাবাদ প্রবেশ করতে থাকে। বিশেষতঃ ' বাংলায় আস্তে আস্তে সোসালিস্ট ধারা আসছে..... '[১] এমত পরিস্থিতিতে সাহিত্যও রচিত হচ্ছে। বাংলা নাটকে স্বভাবতঃই এসব ঘটনার গুরুত্ব অসীম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থনীতিতে একটা শিল্প-ব্যবসায়ী শ্রেণী দেখা দিয়েছে। বাংলা নাটকও এসময় দেশ ও কালের সঙ্গে তাল মিলিয়েছে। তাই নাটকে একালে দ্বন্দ্বাপেক্ষা প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যচিত্র এসেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, তবে বিদ্বেষের পরিচয় যে নেই তা নয়। সর্বোপরি এ পর্বে মুসলমান সমাজের নানা মুখী চিত্রও নাটক গুলিতে স্থান পেয়েছে বিভিন্ন ভাবেই।

১। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ : রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ক্ষীরোদ প্রসাদ এগারো বছরের অধ্যাপনা ত্যাগ করে সাহিত্যে মনোনিবেশ করেন। বিয়াল্লিশ বছরে প্রায় ৫৭টি গ্রন্থ লেখেন। বর্তমান ক্ষেত্রে আলোচ্য ১৯টি নাটকে মুসলমান চরিত্র তিন শতাধিক। চরিত্র, সংলাপ, কাহিনীতে রয়েছে মুসলমান সমাজ পরিচয়।

ক) আলিবাবা (১৮৯৭) : যখন রঙ্গমঞ্চে রঙ্গনাট্য দেখতে নাট্যমোদী বাঙালী ভিড় করছে, তখন আলিবাবা রচিত ও অভিনীত হয়। আলিবাবা ৪০ চোরের বহু পরিচিত ঘটনা। কাঠ কাটতে গিয়ে ডাকাতের গুহা থেকে সরল গরীব আলিবাবা মোহর নিয়ে আসে। শ্বশুরের অর্থে ধনী অহংকারী আলির সহোদর কাসিম সব জেনে যায়। প্রচুর বস্তা ভর্তি করে ডাকাতের গুহায় কিন্তু বেরোবার কৌশল ভুলে গিয়ে ডাকাতের হাতে মারা পড়ে। আলিবাবা কাটা লাস গৃহে আনলে ডাকাতেরা চড়াও হয় কিন্তু কৌশলে বাঁদী মর্জিনা ডাকাতদের হত্যা করে। মৃত্যুকালে ডাকাত সর্দার জানায় মর্জিনা তারই

১. লেখকের সঙ্গে একান্ত আলোচনায় সুধীপ্রধান (সল্টলেকের বাসভবনে) ২.৮.১৯৯০।

কন্যা এবং দেশের কাজের জন্য তার ধনরত্ন দিয়ে যায় মর্জিনাকে।

তিন অঙ্কের এই নাটকে ধন পেয়ে আলি আল্লাহকেই সেলাম দিয়েছে। কাসিমের মৃত্যুতে ভাইয়ের স্ত্রী সাকিনার সঙ্গে নিকাহতে সম্মতি দেয়। নিকাহতে "পোলাও, কালিয়া, কাবাব, পোস্তা, কোপ্তা, আঙুর, কিস্‌মিস্‌, বাদাম" প্রভৃতি খাদ্যের আয়োজন হয়। কাজি, মোল্লা এলে নিকাহ সমাপ্ত হয়। — এসবই মুসলমান সমাজচিত্র। এ সমাজে বিধবা ভ্রাতৃবধূ হলেও নিকাহ হতেই পারে। হজরত মহম্মদ বিধবা খাদিজাকে নিকাহ করেন। ধনী কাসিম গরীব আলিকে ভাই বলে স্বীকার করতনা, কারণ "কাঠুরিয়ার সঙ্গে ওমরাহের সম্পর্ক .... রাখতে গেলে কোরাণ ঘটিত দোষ হয়"। মুসলমান শাস্ত্রে তা সত্য নয়। ইসলামে আমীর গরীব সকলেই সমান। কাসিম যথার্থই বিশ্বাস করে 'বড় বড় কাজী, মোল্লা, নবাব বাদশা" থাকতে আলিকে কেন খোদা সম্পদ দেবে? কারণ "খোদা ধনীকেই দেন, গরীব কে নয়"। তবুও ক্ষোভে কাসিম সিরাজ অর্থাৎ মদ্যপানে মত্ত হয়েছে।

অন্যদিকে আলির পত্নী ফতিমা অর্থ পেয়েই বাঁদী-বান্দার জন্য অস্থির। নিজেকে নবাব বেগম ভাবতে শুরু করে। আবার স্বামীর নিকাহর চিন্তায় ভারতীয় বধূর মতই সতীন আশঙ্কায় চিন্তিতা হয়। বান্দা বাঁদীর কথায় সমাজে মানুষ কেনা বেচার কথা স্পষ্ট। হাটে কেনা মর্জিনা ও আবদাল্লার জীবনে স্বপ্ন-আশা ভবিষ্যৎ নেই। তবুও দুজনে "আল্লার কিরে দিয়ে শপথ নেয়, উভয়ে মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলার। কিন্তু বাস্তবে সম্ভব নয় বলেই "তোবা। তোবা।" উচ্চারণ করে। তাই আবদল্লা বলে কফিন কিনেছি, কবর কেটে রেখেছি। ভালবেসেও মর্জিনা আলির ছেলেকে বিয়ে করতে পারবে না, কারণ সে কেনা বাঁদী। কফিন মুসলমানের মৃত্যুর পর কবর দেবার প্রাক্কালে ব্যবহৃত কাপড়। পুরুষের ৩টি ও নারীর ৫টি কাপড় দিয়ে বিশেষভাবে মৃতের অঙ্গ আচ্ছাদিত করতে হয়। পতিবিরহেও সাকিনা স্বপ্ন দেখে তার আবার 'সাদী' হচ্ছে, 'কলমা' পড়ছে ইত্যাদি ডাকাত সর্দার লাস খুঁজতে এসেছে আলির বাড়িতে দরবেশ বেশে, ইসলাম ধর্মপ্রচারক রূপে।

খ) 'জুলিয়া' (১৮৯৯) : বোখারার ছদ্মবেশী রাজপুত্র আজিবের চারিত্রিক মহত্ত্বে মুগ্ধ বোগদাদ অধিপতি কালিফ। গানেমের বান্দা বাহার জীবন দিয়ে সাচ্ছা মুসলমানের প্রভু ভক্তির প্রমাণ দিয়েছে। তিন অঙ্কের নাটকে মুসলমান সমাজ চিহ্নিত ফকিরিনী, মোল্লা, কবর, নেমাজ প্রভৃতির কথা এসেছে। খয়রাত অর্থাৎ জাকাত এর কথা ঘোষণা করেছে গানেম। বোগদাদের সওদাগর মারা গেলে সমস্ত মুসলমান রীতি অনুসারে সমবেত হয়েছে কবর স্থানে—সারারাত খোদার নাম নেবে। তারপর কাল সকালে মাটি দিয়ে নেমাজ করে ঘরে ফিরে যাবে। বান্দা বাহার কবরের মাটির মধ্যে কফিনে পেয়েছে এক আত্তরাৎ কে। পীরের দরগায় সিন্নি দেয়া হয়েছে। বাহারের সংলাপে

মুসলমান ক্রীতদাস ও বেগমের জীবনচিত্র — "বেগম ও বাদসার বাঁদী। আজ সাঁচ্চা পেশওয়াজ, হীরে পান্না চুনী হবে— কাল ছ্যা ছ্যা— পরশু দূর দূর— তারপর দিন গলাধাক্কা .... পয়জার- শেষে বাঁদির হাটে"। আজিবের উক্তি "মুসলমান আমি, ...বেইমানি কেন করব? বাহার ও আবদুল্লার আপ্যায়ণে মুসলমান সমাজ রীতি- "আব। .... আল্ হন্ দলিল্লা! ওয়ালাবিল্লা, বাহার, ইনসাল্লা, মাসাল্লা!" ইত্যাদি।

গ) বেদৌরা-(১৯০২) : গীতিনাট্যটির কাহিনী অলৌকিকতায় ভরপুর। সমাজচিত্র তেমনভাবে থাকার কথা নয়, নেইও । তবু ক্ষেত্র বিশেষে মুসলমান সমাজকে চেনা যায়। খালেদান রাজপুত্র কমরলজমান ও চীন রাজকন্যা বেদৌরা বিয়ে না করার প্রতিজ্ঞা করে। পুত্রকে অন্ধকার কারাগরে, কন্যাকে উদ্যানে কয়েদ রাখে উভয়ের পিতা। শেষে পরীদের সাহায্যে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে স্বপ্নে উভয়ের সাক্ষাত, আংটি বদল এবং পার্থিব জগতে মিলন হয়। এই ঘটনায় চরিত্রদের সংলাপে, পোশাকে সমাজরীতিতে মুসলমান সমাজচিত্র এসেছে। চীন, 'সিয়া' ও খালেদান 'সুন্নী'[২] মুসলমানের দেশ। ধর্মের এই ভেদে নাট্যকার দেশাত্মবোধে উভয়ের সমন্বয় ঘটিয়েছেন। স্বামী-স্ত্রীর মিল রাখেতে 'নামাজ' হয়েছে, নইলে 'গোর' অর্থাৎ কবর মিলবে না মৃত্যুর পর বেদৌরার। আবার একাধিক স্ত্রী রাখার ধর্মীয় অধিকার বলেই হায়তনকে বিয়ে করেছে কমরলজমান পিতার মন রাখতে। কারণ, কোরাণ ছুঁয়ে আমি এই বালিকাকে আমার সর্বস্ব সমর্পণ করেছি"। খালেদান অধিপতি এসে পুত্রের সঙ্গে দুই পুত্র বধূকে ঘরে নিয়েছেন।

ঘ) 'প্রতাপ আদিত্য' (১৯০৩) : ইতিহাস প্রসিদ্ধ যশোহরের মহারাজাকে নিয়ে বহুকথিত কাহিনীর প্রথম নাট্যরূপ 'প্রতাপ-আদিত্য'। দেশাত্মবোধ এখানে যুগানুসারে হিন্দু মুসলমানের মিলন চিত্রে সমন্বিত। এ নাটকে মুসলমান হলেন মুঘল ও পাঠান। মামুদ, মদন, আকবর, সেলিম, ঈশা খাঁ, শের খাঁ, আজিম খাঁ প্রমুখের ও হিন্দু চরিত্রের মুখে মুসলমান সমাজ পরিচয় রয়েছে। পাঠান দায়ুদ খাঁর পরাজয় ও মোগলের আবির্ভাব কে ঘিরে মুসলমান সমাজ এসেছে। মোগল মুলুকে পাঠান মামুদ ও মদন ব্রাহ্মণ শংকর চক্রবর্তীর স্মরণাপন্ন। পাঠান হিন্দু সমন্বিত বাঙালী মোগলের বিরুদ্ধে প্রতাপ-আদিত্যের হাত শক্ত করেছে। আজ পাঠান বিদেশাগত হয়েও এদেশের। সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতির চাপে কায়িক শ্রমে দিনাতিপাত করে তারা। পাঠান বলেই মোগল শাসন থেকে বঞ্চিত। কল্যাণীকে মোগল অনুচর হরণ করতে এসে মারা পড়েছে। নবাব নারী হরণের পাঁকে পড়লেও, অন্য মুসলমান হিন্দু নারীর দায়িত্ব পালনে চণ্ডী মূর্তি দর্শনের সৌভাগ্য লাভ করেছে। নাট্যকার বিজ্ঞানী হয়েও উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্য দেখিয়েও ধর্মীয় সংকীর্ণতা পেরোতে পারেন নি। তাই কমল—

---

২. 'সিয়া' 'সুন্নী' বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে প্রথম অধ্যায়ে।

"আমি মুসলমান। হিন্দুর দেবতার কাছে আমি তো যেতে পারব না" বলেছে। প্রতাপ শের খাঁর যুদ্ধে প্রতাপ বলেছে—"হিন্দু মুসলমান একমায়ের দুই সন্তান" .... আমরা ব্রাহ্মণ নই, শূদ্র নই, সেখ নই, পাঠান নই—বঙ্গ সন্তান।" ঈশা খাঁ ও বসন্ত রায়ের পাগড়ী, পোশাক বদলে উভয় সমাজ-ধর্মেব মিলন দৃশ্য রচিত হয়েছে। যদিও সৈনিক আজিম খাঁ নারী লোলুপ, সম্রাট আকবর ও পুত্র সেলিম বাঙালীতে পবিণত প্রায়। আবার প্রতাপ ন্যায় বিচার কালে বলেছেন-'বিধর্মী' মুসলমান "নিকট আত্মীয়ের প্রাণ নিতে দ্বিধাবোধ করেনা।" 'এ ব্যক্তব্য সামাজিক নয়, মুসলমান রাজনৈতিক ইতিহাসের অঙ্গ মাত্র। ইমদাদুল হক অভিযোগ করেছেন— 'নাটকে মৌলভী তোরাপ ও সুবেদার শের খাঁ চরিত্রকে হীন করে আঁকা হযেছে এবং তৎসহ মুসলমান সমাজকে হেয় করা হয়েছে।'[৩] কিন্তু তিনি কমল বা ঈশাখাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেন নি। সব মিলিয়ে বলা যায়, যুগানুসারে নাট্যকার হিন্দুর ইতিহাসেও ক্ষেত্রবিশেষে মুসলমানকে হেয় করেও হিন্দু-মুসলমান, বিশেষত হিন্দু-পাঠানের বাঙালী ঐক্যকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ঙ) 'রঘুবীর' (১৯০৩) : গুজরাটের নবাব পারিষদ জাফরের বেইমানী, অত্যাচারে নবাব কন্যাকে বাঁচাতে ও অন্যায়ের বিচার করতে উদ্যত হয়েছে রঘুবীর। শেষে নারীলোভী, অত্যাচারী রঘুবীরের হাতে নিহত, নবাব কন্যার বিষপানে আত্মহত্যা ইত্যাদিতে গঠিত পঞ্চমাঙ্কের 'রঘুবীর'। জাফর ও হিন্দু মুসলিম সংলাপে মুসলমান সমাজ এসেছে। মামুদের পারিষদ প্রহরীকে ধর্মের নামে প্রলোভিত করে নবাবকে হত্যা করেছে। "পীরের" সামনে "ফকীর" ভাব দেখিয়ে স্বমতে এনেছে। ধর্মই মূল হাতিয়ার পীর ফকীরের প্রতি সাধারণ মুসলমানের দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়েছে। আকাঙ্ক্ষাতে সম্প্রদায় ভেদ এসেছে। হিন্দু কর্মচারী দেবল— "ব্যাটা নেড়ে ...." রাজ্য রাখতে পারল না মামুদসা জাফরই বা কদিন? "এ রাজ্য ভবিষ্যতে আমার"। ইত্যাদিতে মুসলমান 'নেড়ে'। জাফর নবাব হলেও হিন্দু বিদ্বেষ প্রবল—আদেশ দিয়েছে হিন্দুদের পারাপার না করাতে। জানের ভয়ে তারা ভীত। রঘুবীর 'খোদার কসম' দিয়ে রাজী করিয়েছে। এখানে মাঝিরা কায়িক শ্রমিক, ধর্মভীরু মুসলমান সমাজের স্পষ্ট ছবি উন্মোচিত হয়েছে। ওদিকে নবাবকন্যা পরিবানু জাফরের কু- দৃষ্টি থেকে বাঁচতে অনন্ত রাও এর আশ্রয় নিয়েছে। জাফর তাকে না পেয়ে চর লাগায় যে কোন উৎকৃষ্ট নারীকে ধরে আনতে। অনন্তের পালিত পুত্র পরিকে হিন্দু ভেবেই রক্ষা করার শপথ নিয়েছে। যুদ্ধে নিরীহ মানুষকে বাঁচাতে রঘুবীর জাফরের হাতে ধরা দিয়েও ধিক্কারে জাফরকে মুসলমানের মহান আদর্শ স্মরণ করিয়েছে— "মুসলমান পুত্রহন্তাকেও অতিথিপ্রাপ্ত হলে দেবজ্ঞানে অর্চনা করে। তুমি সেই মহান ধর্মে আঘাত করে কাফেরের

৩ দ্রষ্টব্য ড: ওয়াকিল আহমেদের পূর্বলিখিত গ্রন্থ।

কার্য্য করলে''। স্পষ্ট জাফর অধার্মিক মুসলিম, ইসলাম মহান ধর্ম। শেষে জাফর বাহিনী পরাভূত, রঘুবীর সিংহাসনে পদাঘাত করলে যবনিকা নেমেছে। নাট্যকার জাফরকে নিকৃষ্ট করলেও মহান ধর্ম ইসলামের জায়গান করেছেন।

চ) 'পদ্মিনী' (১৯০৬) ঃ ঐতিহাসিক পদ্মিনী কাহিনী কেন্দ্রিক বাংলা ভাষার অনেক গ্রন্থের ন্যায় এটিও পঞ্চামাংকের এক নাটক। সম্রাট আলাউদ্দিন, সহোদর আলমাস প্রমুখদের ঘিরে এখানে মুসলমান সমাজ পরিচয় মেলে। পিতৃব্যকে হত্যাকরে সিংহাসনে বসেছে আলাউদ্দিন। দেশ জয় করতে ভারতে এসে পদ্মিনীর রূপের আকর্ষণে রাজপুত্দের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত। শেষে রাজপুত পরাজিত, পদ্মিনী সহ রমনীদের অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে জহর ব্রত পালন, আলাউদ্দিনের চোখে হিন্দুনারী ধন্য ছায়মূর্ত্তির ঘোষণায় চিতোরের সুদিন ফিরে আসাতে যবনিকা।

এ নাটকে আলাউদ্দিন পণ্ডিত, বিরাট মানুষ, যদিও নারী রূপ মুগ্ধকর। গুজরাট সেনাপতি কাফুর খাঁও বড় মাপের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি, দেশপ্রেমী বীর। সমস্ত মুসলমান চরিত্র শেষাবধি সম্মানের সঙ্গে চিত্রিত। সৈয়দ বংশের উজীর কন্যা নসীবনের সঙ্গে আলাউদ্দিন খিলজীর বিবাহ প্রসঙ্গে উচ্চ-নীচ মুসলমানের সামাজিক ভেদনীতি প্রকাশিত। নসী। ''আমি তোমাকে বিবাহ করে, তোমার নীচ খিলিজী বংশের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছি। সম্রাট! আমি সৈয়দ কন্যা, গোলাম তুমি''। ইসলাম উদার সাম্যবাদের নীতি প্রচার করলেও, এদেশের মুসলমান সমাজ তা সর্বদা মেনে চলেনি। আশরাফ বা অভিজাত এবং আতরাফ বা নীচু শ্রেণীর ভেদ দূরীভূত হয়নি (১ম অধ্যায়ে এ বিষয়ে ব্যাখ্যা রয়েছে)। সামাজিক লেনদেন দূরে থাক, মেলামেশাও ছিল না। উভয়ের প্রভু ভৃত্য সম্পর্ক —এখানে নসীবন যেন সেই বোধে উদ্বুদ্ধ। যা বঙ্গীয় মুসলমানের ক্ষেত্রে সমাজের কালিমা বলে চিহ্নিত।[৪] নসীবন আলাউদ্দিনকে একবার দেখেছে মানুষ রূপে, কখনও শয়তান রূপে। তার স্বামী সম্পর্কে দ্বিধা কাটিয়েছে উজীর-সেরাজা! ..... দয়ামায়া মমতা তার ইচ্ছাধীন। .... সে যখন মানুষ তখন তাতে দয়ামায়া মমতা সমস্তই আছে''। দেবতা ও শয়তান হওয়া তার ইচ্ছাধীন। দু-বছর পূর্বে যার অক্ষর জ্ঞান ছিলনা সেই ''সম্রাট আরবী, পারসী, সংস্কৃত তিন ভাষাতেই সুপণ্ডিত''— নসীবনের এ কথাতেই সম্রাটের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা স্পষ্ট। গুপ্তচর মুসলমানকে চেনা যায় পোশাকে— ''গায়ে কাব্বা, পায়ে পায়জামা-লম্বা দাড়ী, গোঁফ নেই—নেড়া মাথা -লম্বা টুপী''। এ যেন হিন্দুর চোখে মুসলমান দর্শন। সন্ন্যাসী বেশী দুই মুসলমানের কথায় গ্রাম বাংলার মুসলমান সমাজ রীতি— ''এক বদনা-থুড়ি, এক কমণ্ডুল জল নিয়ে আয়। বাল্যকাল থেকে বদনার জলে মুখ ধুয়ে নেমাজ করে এসেছি, জিবকে কত সামলাব। .... কেউ কোথাও নেই—এই বারে একটু আল্লা আল্লা বলে বাঁচি। আবার

৪। এ. এম. তোরাব আলি- 'আশরাফ-আতরাফ' প্রবন্ধে এ বিষয়ে স্বমত ব্যক্ত করেছেন। দ্রষ্টব্য- সওগাত ১৩৩৫ শ্রাবণ।

ফকীরবেশী উজীরের সংলাপে সম্প্রদায় ও ঈশ্বরের মহানতার প্রকাশ—"হিন্দু মুসলমান দুই-ই যাঁর সৃষ্টি, তাঁর কাছে ত বিভেদ নেই ভাই— বিভেদ আমরা আপনা-আপনির ভেতর করে আত্মহত্যা করি। .... হিন্দুদ্বেষী মুসলমান, মুসলমানদ্বেষী হিন্দু" ইত্যাদি।

ছ) 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯) : মীরকাশিম চরিত্র আশ্রিত একাধিক নাটকের একটি 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত'। ক্ষীরোদ প্রসাদ কৃত ইতিহাসের চরিত্র আশ্রিত আজগুবি ঘটনাপুষ্ট এই নাটকটি ১৯১১তে ব্রিটিশ রাজরোষে পড়ে বাজেয়াপ্ত ও বিখ্যাত হয়। পলাশীর যুদ্ধের পরিশিষ্ট নিয়ে নাট্যবৃত্ত গঠিত। গিরিশচন্দ্রের 'মীরকাশিম' এর সব চরিত্রই বর্তমান। নূতনত্ব গাঁজাখুরী, কল্পনার প্রাচুর্য সুকুমার রায়ের 'হ য র ল ব'— কেও হার মানায়। তবে অতি উদ্ভট ঘটনার মধ্যেও নাট্যকার সমকালীন বাংলার দেশাত্মবোধের মধ্যে মুসলমান সমাজের পরিচয় দিয়েছেন—সোহনলাল কন্যা মতির উপর মীরজাফর আসক্ত, ফকীর বেশী মীরকাশিম, সিরাজ বেগম লুৎফউন্নিসা ও কন্যা গুলসনের সিরাজের সমাধিক্ষেত্র বা কবর স্থানে অবস্থান, 'খোদার' দয়ায় অত্যাচারী মীরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যু। ধর্মের কারণেই মীরজাফর জামাতা মীরকাশিমকে নবাব করেছে। আমিয়টের মৃত্যুর পর 'মহম্মদ' তুল্য মীরজাফর রোগ ভোগের পর বিকৃত মস্তিষ্কে মারা গেছে নাটকের শেষে।

জ) 'চাঁদবিবি' (১৯০৭) : ইতিহাসাশ্রিত 'চাঁদবিবিতে' মুসলমান চরিত্র তেইশের বেশী। আহমদ নগরের পাঠান সুলতান ইব্রাহিম শার কালে মোগল এলে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে চিড় ধরে। 'মৌলবীর কেতাব নাড়া', 'নূর নাড়া' নিয়ে দ্বন্দ্ব বাধে। একদা হিন্দু মুসলমান একত্রে কুস্তি করেছে, খেলেছে। কিছু দেশদ্রোহীর সাহাযে মোগল বিজয়ী। আবার হিন্দু-পাঠান সম্মিলিত ভাবে মোগলের বিরুদ্ধে। চাঁদবিবির বীরত্বে মোগল এবার পরাভূত হয়েছে, বেগানা পুরুষ বলে ইব্রাহিম পত্নী মারিয়ম "খাস কামরার পর্দার" আড়াল থেকে কথা বলেছে। আদিল ইব্রাহিমের ভগ্নীপতি ও মামা। মুসলমান সমাজে আত্মীয়র মধ্যে বিবাহ রীতি এখানে স্পষ্ট। ইব্রাহিমের নর্তকী ও সুরার নেশায় রাজ্যবাসী ক্ষুব্ধ, কারণ এসব অনৈশ্লামিক, আকবর সার হারেম, পাঠানদের তোবা, তোবা ধিক্কার, ইব্রাহিমের সৎকারে কবর স্থানে শত্রু মিত্র সকলের উপস্থিতিও মৈত্রী সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে মোগল-পাঠান-হিন্দু।

ঝ) 'বাঙ্গালার মসনদ' (১৯৫০) : ঐতিহাসিক নাটক "বাঙ্গালার মসনদ" এর কাহিনী তে প্রায় সব (২৩টি) চরিত্র মুসলমান। বাংলার নবাব সুজাউদ্দীনকে দুনিয়া ছাড়িয়ে অল্পবয়স্ক সরফরাজ নবাব হলে তাকেও সরিয়ে আলিবর্দ্দী ও আহম্মদ যথাক্রমে পাটনার সুবেদার ও নবাবের উজীর। শেষে এই ভ্রাতৃদ্বয় নানা কৌশলে সদা তৎপর। নবাবের মৃত্যু এবং মৃত্যুর পূর্বে আলিবর্দ্দীর বাংলার মসনদ লাভেই নাটকের

সমাপ্তি। আগাগোড়া ষড়যন্ত্র ও কুচক্রীদের কার্যকলাপে বিভিন্নভাবে মুসলমান সমাজের ছবি ফুটে উঠেছে। শুরুতেই আলিবর্দ্দী ও আহম্মদ নবাব সরফরাজকে না মেনে শত্রুতাব জাল বচনা কবেছে, এদেব সহযোগিতা করেছে আলিবর্দ্দী কন্যা ঘেসেটি ও ওমরাও মুস্তাফা খাঁ প্রমুখেবা, সকলের ছলনা ও কৌশল একমাত্র আশ্রয়। অথচ নবাব সরফরাজ শান্ত-ধীর প্রজাপালক। উজীর ওমারাওদের চক্রান্ত রোধে অক্ষম, তাঁর সহযোগী একমাত্র বাখর খাঁ। চক্রান্তের জাল শক্ত করতে আহম্মদ নবাবকে "বহুমূল্য নজর" অর্থাৎ ঘুষ দিয়েছে সন্তুষ্ট কবতে। 'ঘুষ' ইসলাম অনুমোদন করে না কিন্তু সে কাজে নিমগ্ন আহম্মদ। সেইজন্যই আল্লার উপাসক সরফরাজ তা গ্রহণ করেনি। চক্রান্তকারীদের মধ্যে বিবেকবান নোয়াজিম ঘেসেটিকে বিয়ে করেছে। তার কাছে রূপ মোহ সব নয়। চক্রান্তের জন্য ঘেসেটির চারিত্রিক ত্রুটিকে সে ধিক্কার দেয়। সে লোভী নয়- তার কাছে 'ধর্ম' অনেক বড় 'অর্থ' অপেক্ষা। তাই বলে "স্বামীর সামান্য ফৌজদারীর জন্য ধর্ম্ম বিক্রয় কর্ত্তে গিয়ে, অবিক্রেয় অপবাদের বোঝা মাথায় করে ঘরে ফিরব না" (১/২)। অমাত্যদের চক্রান্তে নিষ্ঠুর চরিত্রহীন রূপে সরফরাজ, রাজ্যে পরিচিত হয়েছে। নবাব নিজে ছদ্মবেশে রাজ্যপরিদর্শনে বেরিয়ে তা বুঝেছে। 'ফকীর' বেশে ঘোরার সময় অজানা অচেনাকে বাঁচাতে নিজ জীবন বিপন্নকরে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। শেষে নবাব বিদ্বেষী বিজয় সিংহ ও স্ত্রী রমাবতী তাদের ভুল বুঝতে পেরে নবাবের অনুগত হয়েছে, তারা বুঝেছে নবাব খারাপ নন, অপপ্রচার মাত্র। সরফরাজের সংলাপে স্ত্রীর সঙ্গে কথায় মুসলমান শাসকের পতিত্বের পরিচয়। পিতার মতই তিনি একপত্নী নিষ্ঠ। মা জিন্নত চান "স্ত্রী কন্যার ইজ্জত বেচে" উজীরদের তাড়াতে হবে, কিন্তু পিতাব নির্দেশে আহম্মদের ন্যায় উজীরদের তাড়িয়ে শত্রু বৃদ্ধি না করে "রমণী সংগ্রহ কার্য্যে" নিযুক্ত রাখতে হবে। (১/২) সমকালীন অনেক নবাবদের মতই এখানেও নারী সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত লোকদের দেখা যায়। রমণী কুঞ্জে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য সরফরাজ ফররাবাগে এসেছেন। বাখর এখানে থাকতে নিষেধ করলে নবাবের সংলাপে নবাবদেরই কথা—"কেন পারবো না? .... নবাবরা তো দুশো পাঁচশো বেগম রাখে। তবে রাবেয়া কাঁদবে কেন? আমি পোনের শো বেগম রাখবো।" (২/৩)।

এসময়ই নবাবের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হয়ে মর্ত্তজা ও গাউস ছদ্মবেশী নবাবের কাছেই আশ্রয় নিয়েছে। আহম্মদ ফররাবাগে এসে নতর্কীদের দিয়ে নবাবকে আনন্দ দিতে চায় কিন্তু সে থাকবেনা, কারণ "আমি হজ্ব করে এসেছি", সে ফকীরই সার করেছে, ফকীরের এখানে থাকার জো নেই। ধর্ম সম্পর্কে জেনেও ধর্মকে নিয়েই এখানে মুসলমান ছেলেখেলা করেছে। সাধারণ নারী মালেকা সতীত্ব বাঁচাতে খোদাকে, ফকীরকে ডাকে, নবাব তাকে বাঁচিয়ে ভগিনী সম্মোধন করে; নবাব স্ত্রী রাবেয়ার কাছেও মহান

সদাশয়। "আমার স্বামী একপত্নী নিষ্ঠ"। রাবেয়ার এ সংলাপে নবাবের সুনামের পাশাপাশি, নিজ ভুলবুঝে ফকীরের নির্দেশে স্বামীগৃহে পা বাড়িয়েছে। সরফরাজ বলে "শুনেছি আমার মাতামহ ব্রাহ্মণ"— অর্থাৎ পিতা সুজাউদ্দীন হিন্দুনারী বিবাহ করেছেন। চতুর্থ অঙ্কে আলিবর্দ্দীদের চূড়ান্ত চক্রান্তে নবাব বিপর্যস্ত। হায়দারি ফকীর "নেমাজ" সময় ধরে তাদের সৎপথে আনতে চায়। নবাব ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদের বরখাস্ত করলে তাদের অবস্থা ঘেসেটির বর্ণনায়—"দিবারাত্রি কেবল হা আল্লা হা আল্লা করে কাঁদছেন" (৪/৪)। ঘেসেটি বেগম কে নবাব অপমানিতা করেছে, আলিবর্দী আরও উত্তেজিত। দেখাযায় নোয়াজেম ও ঘেসেটি খুড়তুতো ভাইবোন হয়েও স্বামী-স্ত্রী। ইসলামে সে নির্দেশ আছে। ১৪ রকমের নারী ব্যাতিরেকে বিবাহ হয়— কাকার কন্যা চোদ্দ শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না। ইতিমধ্যে দিল্লীর বাদসা মহম্মদ সার সনদ এসেছে—তা নিয়ে আলিবর্দ্দী মহাবৎজঙ্গ উপাধি নিয়ে মুর্শিদাবাদের পথে—ছেদন খাঁও সর্দারদের ধর্মের নামে প্রলোভিত করে পক্ষে এনেছে; সব বুঝে ছেদন খাঁ 'মর্ম্ম' অপেক্ষা 'ধর্ম্ম' বড় বলেই প্রতিজ্ঞা পূরণে নবাবের বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়েছে—ধার্মিক ছেদনের এই বোধ ইসলাম অনুসারী। ফতেচাঁদের মুখে নারীর পর্দানসীনতা অপেক্ষা টাকা বড়। নবাব আক্ষেপ করেছে— "মুসলমান তার পবিত্র সম্পত্তি চির জলন্ত বিশ্বাস হারিয়েছে" (৪/৬)। কারণ ইসলামে 'ইমান' অর্থাৎ বিশ্বাসই সর্বাপেক্ষা বড়। আলিবর্দ্দী ইসলামের বিশ্বাঘাতকতার আশ্রয়ে যুদ্ধ জিতেছে"— "লাল রুমালে ইট মুড়ে কোরাণ বলে" (৫/১) পাঠালে, ধর্মপ্রাণ নবাব তাকে ক্ষমা করেছে, জয়ী হয়েছে অধর্ম। ছেদন খাঁ "পবিত্রকোরাণ" স্পর্শ করে শপথ করেছিল, তাই প্রভূ-নবাব পক্ষকে হত্যা করে জালিমের হাতে নিহত হয়েছে। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে নবাব আলিবর্দ্দীকে বাংলার মসনদ দান করলে, নবাবের জ্যোতির দিকে তাকিয়ে আলিবর্দ্দী ভয় পেয়ে স্থান ত্যাগ করেছে। অর্ধম বাংলার মসনদ জয়ের মূল, নবাব মহান-ধার্মিক। বিপরীতে অধার্মিক আলিবর্দ্দী মসনদ পেয়েছে সত্য কিন্তু ইমানের কাছে, ধর্মের কাছে আলিবর্দ্দীর ভীতিতেই ইসলামের মহত্ব হয়েছে জয়যুক্ত।

এও) 'পলিন' (১৯১১) : তিন অঙ্কের নাটিকা। আঠারোর অধিক নারীপুরুষ চরিত্র মুসলমান। সাধারণ অবস্থা থেকে আল মামুদ তুরস্কের সুলতান হয়েছে। কিন্তু তাঁর দরিদ্র স্ত্রীকে দেশময় খুঁজে পায়নি। প্রকৃতির পাহাড়ে উঠে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতমা সুন্দরী আলমামুনের কন্যা রেবেকাকে দেখার অপরাধে সিস্তানের রমণীর সঙ্গে যুদ্ধ বেধেছে। নানা ঘটনাচক্র পেরিয়ে নাটকের শেষে স্ত্রী কন্যার সাক্ষাৎ পেয়েছে আলমামুন। তেমনভাবে না হলেও বিভিন্ন ঘটনায় অভিজাত মুসলমানের রীতি নীতি, জগতের মুসলমানীত্ব, সম্পর্কের চিত্র পাওয়া যায় নাটিকাটিতে। আলমামুনের রাজ্যে "জগতের জাতি সমবেত" হয়ে স্বাধীনতা ভোগ করে, কিন্তু সুলতান তার দরিদ্র জীবনের প্রথমা

স্ত্রীও গর্ভস্থ সন্তানের জন্য ব্যাকুল। সুলতানের বর্তমান কন্যা রাবেয়া দুনিয়ার সেরা সুন্দরী। পাহাড়ে জনৈক বালক উঠেছে, রাবেয়া অন্ত:পুর থেকে তাকে দেখে উন্মাদ প্রায়। বালককে ধরতে সুলতানের দেহরক্ষী ব্যর্থ। বালকবেশী আসাদের মতে— "খোদারই পাহাড়, খোদারই দরিয়া, খোদারই দুনিয়া" এতে কোন অপরাধ নেই। কিন্তু সুলতানের মতে সে "অন্দরের আবরু নষ্ট করেছে" আসাদের কাছে পরাজিত সুলতানের উজীরের শাস্তি হয়েছে সেই বালকের বান্দা হয়ে থাকার। হাসান এতকাল "কোরাণের আদেশ বলে পালন করে" এসেছে আলমামুনের হুকুম। সিস্তান রাণী অলমামুনের আল্লার পাহাড়ের উপর সুলতানের অধিকার দাবীতে যুদ্ধের জন্য দূত পাঠিয়েছে। দুতেরা "পোলাও কাবাবে" আপ্যায়িত—খাবারে ও মসলাতে উচ্চবিত্ত মুসলমান সমাজ পরিচয় (২/৩)। অবশেষে আসাদ রূপী পলিন হয়েছে জগতের সেরা সুন্দরী। ধার্মিক মুসলমানের মনের জোরে সুলতান সিস্তান রাণীর হাতে বন্দী হয়েও শেষে সকলের প্রাপ্তির মিলনে নাটকে শেষ হয়েছে।

ট) 'মিডিয়া' (১৯১২) : অলৌকিক শক্তির আধারে মানবত্ব ও প্রেমের চিরন্তনত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে নাটক 'মিডিয়া' জিবার পরমাণু শক্তির অধিকারী হয়েও দুনিয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, সংসারকে মনে করে অসার। কিন্তু শেষে তুর্কী-সুলতান আল-মন্‌সুর ও গ্রীক রাজকন্যা মিডিয়ার প্রেমের কাছে পরাজয় স্বীকার করে ঘোষণা করেছে "জড় প্রকৃতির প্রতি পরমাণুর অন্তরালে চৈতন্যময়ীর লীলা। সেই মা .... জগতে লীলাবর্ষণ করে, তাই জিবার তার সর্বাশ্রেষ্ঠ উপহার শিষ্যা মিডিয়াকে প্রাণময়ী শক্তির প্রতিষ্ঠা ঘটাতে" তুলে দিয়েছে আলমন্‌সুরের হাতে। নাটকের ২০টি চরিত্রই মুসলমান। গ্রামে রমণীর গানে, কৃষকের কথায় মুসলমানের সামাজিক চিত্র রয়েছে। রাজার অত্যাচারী মোসায়েবদের আগমণে "গেরস্ত মেয়েছেলে সব ভিন্ন গায়ে সরিয়ে" দেওয়া হয়েছে। গ্রাম্য সর্দার এলাই পৌত্রী লুনাকে তার দিদির সঙ্গে চলেযেতে বলে "ফজরে (প্রত্যুষে) আবার আসিস। জিবারের পরমাণু সাধনাকে এলাই মনে করে "আরে আল্লা—সেটা .... পাগল .... অমর হবার দাওয়াই খুঁজে মরেছে" (১/২)। কিন্তু মিডিয়ার কাছে জিবার "হজরত"। যদিও তার কাছে জাতি সম্প্রদায় নয়- "মানবত্বই তার ধর্ম্ম, মনুষ্যত্বই তার জাতীয়ত্ব।" এ শুনে এলাই বলেছে "অন্ধকারে ডুবিয়ে হজরত আমাকে জ্ঞান দিয়েছে, যে সহায় সম্বলহীন, খোদা তার সহায়" (২/২)। এদের কাছে ধর্ম মনুষ্যত্ব আল্লাহই সর্বাপেক্ষা মহান। যথার্থ মুসলমানের মতই আল্লাহের উপর সমস্ত কিছু অর্পণ করেছে 'ইমান' বলেই।

ঠ) 'খাঁজাহান' (১৯১২) : সম্রাট সাজাহানের সময়ের ইতহাসাশ্রিত ঘটনা মালবের সুবাদার খাঁজাহান লোদীর স্বাধীন মানসিকতায় সম্রাটের ক্রোধ, বিরোধ। শেষে সাজাহান তাঁর স্বদেশ প্রিয়তায় মুগ্ধ, অবশেষে অনিদ্রা অনাহারে খাঁজাহানের মৃত্যু-মহাবৎ খাঁর

মাতুলের চেষ্টায় হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য প্রচেষ্টায় রয়েছে মুসলমান সমাজের নানা পরিচয়। ঘরে অতিথি এলে মেয়েদের লজ্জার কারণ নেই, মুসলমানের কাছে অতিথি মহান। খাঁজাহানের কাছে অপমানিত মহাবৎ খাঁ অতিথেয়তা ভুলে ক্রুদ্ধ। দাদাজী তাই স্মরণ করান—"যদি মুসলমানের অভিমান রাখ, তাহলে অতিথি বিনাশের কথা মনে স্থান দিও না।" সোফিয়াতে মুগ্ধ হয়েও চোখ ফেরায় নারায়ণ কেননা-"আপনি পর্দ্দানসীন ওমরাহ নন্দিনী; যবনী" কিন্তু মহাবৎ কন্যা সোফিয়া এই বাধা মানতে রাজী নয়। মহাবৎ তাকে "মোগল হারেমে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত" থাকার নির্দেশ দিয়েছে। খাঁজাহান মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও "মুসলমান কলঙ্ক সাজাহানের নাম দুনিয়া থেকে মুছে" দিতে বদ্ধ পরিকর, কারণ সে অতিথির সম্মান রাখেনি। বন্যায় মৃত স্ত্রী কন্যাকে 'কবরস্থ' করেছে খাঁজাহান। সাজাহান উজীরের সামনে প্রতিজ্ঞা করেছে খাঁজাহান পুত্র আজিমৎ যেখানে মারা গেছে সেখানে মসজিদ স্থাপিত হবে। সোফিয়া "হিন্দুর অভিবাদন জানিনা আপনাকে সেলাম করি", মহাবৎ নারায়ণকে বলেছে "ভিক্ষা এই—ওই যবনীরে (সোফিয়া) ব্রাহ্মণ করিয়া লও"। সোফিয়া নারায়ণের সঙ্গে সহমরণে যেতে চেয়েও বলে — "আমি মুসলমানী। আমার পরশে প্রভুর অগতি হবে কিনা?" উত্তরে দাদাজী "চিতা শয্যার" সম্মতিতে সহমরণের কথা ঘোষণা করে সোফিয়া। ইত্যাদিতে মুসলমান সমাজ নির্দিষ্ট খণ্ড খণ্ড চিত্র 'খাঁজহান' নাট্যে ছড়িয়ে রয়েছে।

ড) 'রূপের ডালি' (১৯১৩) : ইতিহাসের পটে অলৌকিকতা ভরা রঙ্গনাট্য। বণিক পুত্র ওসমান ফকীর প্রদত্ত তলোয়ারে সর্বশক্তিমান—সব অন্যায়, অপরাধের বিরুদ্ধে, নির্যাতিতা নারীকে উদ্ধার করে। বোখরার নবাব খাঁজা খাঁ "খোদার দয়াতে রাজ্য" পায়। স্ত্রী রোশেনা 'হাজি সওদাগরের' দোকানের ওড়না নিয়ে মত্ত। কৎলু খাঁকে দাড়ি নিয়ে জব্দ করে বাঁদী মনিয়া। সমর খন্দের ছদ্মবেশী সুলতান আসগর আলি মির্দ্দা কন্যাকে সমর্পণ করে সাধারণ মুসলমান ওসমানের হাতে- ইসলামের উদার সমভাবের ভাবনাতেই। টুকরো টুকরো চিত্র গুলো বাংলাদেশে প্রচলিত. মুসলমান সমাজকেই পরিচিত করিয়েছে। আজগুবি সত্ত্বেও ইসলাম দর্শন ধর্ম-সমাজ ভাবনা স্পষ্ট হয়।

ঢ) 'আহেরিয়া' (১৯১৫) : ইতিহাসের কিছু চরিত্র নিয়ে রচিত কাল্পনিক ইতিবৃত্ত 'আহেরিয়া'। নাটকীয়তার বিচারে উৎকৃষ্ট এই নাটক রাজপুত ইতিবৃত্তের একটা ক্ষীণ চিত্র গৃহীত হয়েছে। বারাহালাঙ্গাইয়ের সঙ্গে ভট্টিদের বিরোধে নাটকে মুসলমানের স্বল্প কিছু বিষয় পাওযা যায়। তাদের মধ্যে সংলাপে মুসলমান সমাজ ও ধর্মনীতির প্রসঙ্গ এসেছে। 'খোদা', 'সেলাম', 'কাবা-চাপকান' ইত্যাদির পরিচয় খুবই গৌণরূপে স্থান পেয়েছে।

ণ) 'বাদশাজাদী' (১৯১৫) : ইস্তাম্বুলের বাদশাহ আজিজ ও খুল্লতাত কে কেন্দ্র করে

বিরোধ, অবশেষে মিলনে সমাপ্তি, আজিজ "বিশাল মোসলেম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর"। পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে পিতৃব্যকে খুঁজতে বেরিয়েছে। সমর খন্দের রাজকন্যা লিরিয়ানকে বিয়ে করা এবং নিরুদিষ্ট পিতৃব্য কে ফেরানো উভয় সমস্যায় পড়েছে। সমর খন্দের পূর্বতন সুলতান লিরিয়ানকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু লিরিয়ান কালিফ আজিজকে চায়। শেষাবধি আজিজ পিতৃব্য, দিদি জুমেনা ও স্ত্রী লিরিয়ানকে পেয়েছে। হামিদা স্বামীর পাপের জন্য ক্ষমা চাইলে আমিন মুক্ত হয়েছে। পাঁচ অঙ্কের কাহিনীতে নানাভাবে মুসলমান সমাজ এসেছে। মুসলমানের আতিথেয়তা, কর্তব্যবোধ, মুসলমানীত্বর গুরুত্ব প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন দৃশ্যে। মুসলমান কালিফের দেশজ কেউ কিছু চাইলে তার স্বামী ধর্মনৈতিক কারণে তা পালন করতে বাধ্য। তদুপরি আজিজ হামিদার ভাষায় "হজরতের প্রতিনিধি"। কালিফ— "সমস্ত দুনিয়ার মুসলমান প্রজার নালিশের বিচার করতে বিধিবদ্ধ আমার অধিকার। সুলতান নন্দিনীকে বিপদমুক্ত না করলে ধর্ম্মত: আমার কালিফ নামে কলঙ্ক স্পর্শ করবে।" সমরখন্দের বোখারা প্রাসাদ থেকে লিরিয়ানকে উদ্ধার করতে হামিদা বাঁদী বেশে আসে। জুম্মাবিবি খেতে না দিয়ে কাঠ দেয় লিরিয়ানকে। তাকে উদ্ধার করতে গেলে মুখ দেখাতে পারছে না, কারণ "আমি মর্যাদা নাশ করতে পারিনা" পরপুরুষের সামনে আবরু খুলে। জেলালকে ভালবেশে লিরিয়ান আংটি বদল করেছে। হামিদা আমিনের ঘরে এসেছে অতিথি হয়ে—"আমি এখন বাঁদী নয়— অতিথি।" ধার্মিক মুসলমানের গর্ব থাকলে আমিনের শ্রদ্ধার বস্তু এখন হামিদা। আজিজ জানিয়েছে জেলাল তার পিতৃব্য-অর্ধমোসলেম রাজেশ্বর। নিজে "মুসলমান এই আমার পরিচয়। শেষে আমিন কন্যা আমীরণকে সমর্পণ করেছে আজিজের হাতে, পিতৃব্যের মেয়ের সাথে বিয়ে হয়েছে। সমস্ত রাজত্ব আজিজকে ফিরিয়ে দিয়েছে। উন্মুক্ত হয়েছে সকলের মিলনে বেহেস্ত বা স্বর্গ।

ত) 'বঙ্গোরাঠোর' (১৯১৭) : ক্ষীরোদপ্রসাদের স্মরণীয় এক নাটক। যদিও নাটকটি প্রচার পায়নি যথাযথ। হিন্দু মুসলমানের ঐক্য প্রচেষ্টায়বৈপ্লবিক মানসিকতা স্মরণযোগ্য। বাংলায় পাঠান রাজত্বের শেষ সময় নাটকে গৃহীত। ইতিহাস-রোমান্স কল্পনায় হিন্দু বীর রঙ্গলাল ও পাঠানী কলিবেগমের প্রেম ও প্রাণ দেওয়া নেওয়ার বিষাদময় ঘটনা নাটকে স্থান পেয়েছে। মেদিনীপুরের মৌজাদার রতিলাল পাঠান সাবাজ খাঁ হয়েছে, মন্দিরের চূড়া ভাঙা পাঠানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে, যদিও বাস্তবে তা হয়নি। তার পুত্র নন্দলাল ও রঙ্গলাল যথাক্রমে মৌজাদার ও রাজপুত বীর। রঙ্গলাল দস্যুর হাত থেকে পাঠান উজীর সুলেমানের যুবতী কন্যা কলিবেগমকে উদ্ধার করে। প্রচারিত হয় উদ্ধার নয়, পাঠানীকে অপরহণ করা হয়েছে। কলি ইজ্জত রক্ষক রঙ্গলালকে স্বামী বলে ঘোষণা করেছে। ওদিকে পাঠান রাঠোর আক্রমণ করেছে। সুলেমান সত্য জেনে কন্যাকে আর্শীবাদ করেও পাঠানের ভয়ে আত্মগোপন করেছে। গোপাল মন্দির পাঠান

ধ্বংস করলে, তারই স্তূপে চাপা পড়ে মারা গেছে রঙ্গলাল—রাঠোর কুলকে রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে গেছে কলিবেগম ও সাবাজ বা রতিলালের পাঠান স্ত্রীর গর্ভজাত জৈনুদ্দিনের উপর।

নাটকে সৈন্য ছাড়াও এগার জন পুরুষ ও একজন মহিলা মুসলমান রয়েছে। কালু সর্দার ও তার পুত্র ভোলাই মেদিনীপুরের প্রভুভক্ত প্রজা। অন্যেরা পাঠান ও মোগল। এখানে হিন্দু মোগল মিলিতভাবে পাঠানের বিরুদ্ধে। রঙ্গলাল স্ত্রীলোকের আর্তচিৎকারে— "আল্লা! আওরাৎ কি ইজ্জত" রক্ষাকারীকে আহ্বান, করলে, রঙ্গলাল মুদ্দা খাঁ ও দলবলকে হারিয়ে নারীকে উদ্ধার করে। আমীর কন্যা পর্দ্দানসীন, অসূর্য্যম্পর্শা পাঠানী", তাই মন দুর্বল হলেও রঙ্গলাল সরে যেতে চায়। ভোলাই কলিকে ডাকতে গেলে সমাজরীতি—"এই তোমাকে মোচরমানের সেলাম। আর এই হ্যাঁদুর পেরণাম, জানিয়েছে। কিন্তু কলি-রঙ্গ হিন্দু-মুসলিম বলেই উভয়ের পাথরের মত ব্যবধান। কলিবেগম পর্দ্দানসীনতার বেড়া ছিঁড়ে সংকোচে রঙ্গলালের কাছাকাছি এসেছে, দামী ওড়না পেতে একত্রে বসেছে, কারণ—"যিনি আমার উজ্জত বজায় রেখেছেন, তার সম্মুখে সঙ্কোচের অভিনয় দেখানো আমি ভদ্রতা মনে করিনা।" রঙ্গলালের প্রতি প্রেম, দামী ওড়না ছেড়ে মোটা কাপড়ে কলির আসক্তি স্বদেশী-বয়কট আন্দোলনের ইঙ্গিত যেন। এই নারীর কাছে ধর্ম অপেক্ষা ইজ্জত দামী, তাই হিন্দুর আশ্রয়েই থাকতে চায়। প্রয়োজনে নিজেই নিজের ছুরি দিয়ে ইজ্জত রক্ষা করবে।

রাঠোর নারীহরণের অভিশাপে পাঠান আক্রমণের ভয়ে শঙ্কিত, কিন্তু মাতৃসম রঙ্গলালের বৌদি ভুবনেশ্বরী হিন্দুর গোপাল মন্দিরেই কলিকে আশ্রয় দেয়। 'মুসলমানী' হলেও অতিথি দেবীস্বরূপা। দেশাত্মবোধের উন্মাদনা সত্ত্বেও সে যুগে অকল্পনীয়। সর্বোপরি কলিকে রক্ষা করতেই রুখে দাঁড়ায় রাঠোর। কলি মন্দিরে যাত্রাধ... রঙ্গলালকে স্বামী বলে স্বীকার করেছে, ভুবনেশ্বরীকে তা জানিয়েছে। "সাম্রাজ্যের প্রলোভনও অন্যপুরুষ আমার ইঙ্গিত আকর্ষণ করতে পারবেনা।" এতে ভুবনেশ্বরী কলির চিবুক স্পর্শ ও চুম্বন করে ঘোষণা করেছে—"তুমি রাঠোর কুলবধূ-আমার মা।" এখানে সমাজধর্মের উর্দ্ধে সতীত্ব, স্নেহ, প্রেম, মনুষ্যত্ব বড় হয়েছে, কিন্তু শেষাবধি বিধর্মী পিতার পাঠান পুত্রের সঙ্গে রঙ্গলালের মিলন ঘটেছে। বালক জৈনুদ্দিন জানে সে 'রাজপুত মুসলমান।' পিতা সাবাজ জানিয়েছে মসজিদে "যিনি থাকেন তার আকার নেই। .... তবে ও মন্দিরে যিনি আছেন, তাঁর আকার আছে।" সে মুসলমান হয়েও মন্দির ভাঙতে বাধা দেবার অধিকার নেই জানিয়েছে—একথা ইসলাম সম্মত নয়, ফকীর নসীবের কথায় ইসলাম ধর্মের উদারতা প্রকাশিত। জৈনুদ্দিনের পোশাকে ওমরাহ পুত্রের পরিচয়। ভোলাই জেনেছে যে মুসলমানের 'পীর' সেই হিন্দুর 'গোপাল'। খোদা, আল্লা, গোপাল একাকার, আপাত দৃষ্টে মুসলমানকে ছোট করা হয়েছে মনে

হলেও বস্তুত: সমস্ত নাটকে জুড়ে ঐক্যবদ্ধ মানসের চিরন্তন প্রেমের জয়গান ঘোষিত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান সমমর্যাদা পেয়েছে নাট্যকাররে দৃষ্টিতে-বাড়তি মাত্রা যোগ করেছেন পাঠান রাজপুতের সন্মানজনক মিলন ঘটিয়ে।

থ) 'আলমগীর' (১৯২১) ঃ ঔবঙ্গজেবের শেষ জীবনের ঘটনা নিয়ে নাটকে মোহনদাস গান্ধীর সত্যাগ্রহের প্রভাবে ঔবঙ্‌গজেব যেন গান্ধীর প্রতিমূর্তি। ধর্মনিষ্ঠ সুন্নী মুসলমান বাদশাহ ঔরঙ্‌গজেব কাফের নয়, সত্যাশ্রয়ী ভীম সিংহের হাতে জল খেয়ে মারা গেছে। ঔরঙ্‌গজেবকে ঘিরে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রচেষ্টা রয়েছে। মুসলমান নারীপুরুষ নাটকে সতেরটির বেশী। সব মুসলমান শুধু সন্মানীয়ই নন—মহান মানবতা নিয়ে নাটকে উপস্থিত। রাজপুত মোগলের বিরোধে দিলীর খাঁর একনিষ্ঠতা, কামবক্সের মহত্বে, বাদসা পুত্র আকবরের নারী ও যুদ্ধের মত্ততাই কাহিনী জমজমাট। উদীপুরী বেগম বৃদ্ধ স্বামী ঔবঙ্‌গজেবের জন্য উদ্বিগ্ন, কারণ সম্রাট রূপকুমারীকে বেগম করতে চায়। কিন্তু জিজিয়া কর স্থাপনে ব্যস্ত ঔরঙ্‌গজেব, হিন্দুরা রুষ্ট। ইসলামের স্বার্থে এই পুনঃস্থাপন। সব 'হিন্দু' নয় যাঁরা যুদ্ধে যোগ দেবে না তারাই এই কর দেবে-মুসলমান হলেও। কিন্তু মুসলমান মাত্রই ইসলামের পতাকা উড্ডীন রাখতে যুদ্ধে যেতে বাধ্য। হিন্দুরা রুষ্ট হলেও রাজনৈতিক কারণে সম্রাট চরম অপরাধ করেন নি। সম্রাটের চেষ্টা রয়েছে রাজপুতের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করতে । অন্যথায় তার "কবরে প্রবেশের আর বিলম্ব নেই।" ঔবঙ্‌গজেব ভগ্নী জাহানারা যথার্থ লিখেছেন—"সাপুড়ে যেমন বাঁশির সুরে সাপ নিয়ে খেলা করে, ঔরঙ্‌গজেবও তেমনি ধর্মের বাঁশী বাজিয়ে সিংহাসনের খেলা আরম্ভ করলেন। মানুষকে বোঝালেন তিনি মক্কাযাত্রী ফকির, এই দববেশের আলখাল্লা মক্কাযাত্রার পূর্বাভাষ।"[৫] সিদ্ধান্তে অটল সম্রাট রাজপুতদের মধ্যে ভাঙন ধরাতে চাইছেন। তাঁর সংলাপে ইতিহাস ও চরিত্র স্পষ্ট-"মমতা-তাও কারও উপব নেই। ভালবাসি একমাত্র ধর্ম্ম। ফকিরী নিতে গিয়ে সেই ধর্ম্মের জন্য আমি বাদশাহী নিয়েছি। ধর্ম্মের গায়ে আঘাত লাগবার সম্ভাবনা হয়েছিল, তাই অমন প্রজারঞ্জন পিতাকে সিংহাসন চ্যুত হতে হয়েছে। দারা দুনিয়া ছেড়েছে, সুজা কাফেরের হাতে প্রাণ দিয়েছে। এমনকি "প্রিয় পুত্র মহম্মদ গোয়ালিয়র দুর্গে তার যৌবন স্বাস্থ্য সমাধিস্থ করেছে।" দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভাবিত ভাবনায় সম্রাট ইসলামপ্রেমী-নিষ্ঠুর, বিপরীত বৈশিষ্ট্যে জটিল ব্যাক্তিত্ব।

ধর্মীয় উদারতা, বিলাসিতা প্রশ্রয় দেননি, মদ জুয়া শুধু নিষিদ্ধ করেননি, নিজে,—"নিরামিষ আহার করতেন, জল ও দুধ ছাড়া অন্য কোনও পানীয় স্পর্শ করেননি, মাটিতে ঘুমোতেন! .... হিন্দু মুসলিম, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকল প্রজাই তার

---

৫. জাহানারার আত্মজীবনী—অনুবাদক মাখনলাল রায়চৌধুরী ১৩৫৭।

সকাশে উপস্থিত হয়ে বিচার প্রার্থনা করতে পারত।'[৬] হিন্দু, শিয়া এমনকি বিলাসী সুন্নীরাও তার শত্রু হয়েছিল। এই ভাবনা নাটকেও চিত্রিত হয়েছে। দিলীর কে ঔরঙ্গজেব বলেছেন- "........ঈশ্বর সকলেরই, ঈশ্বর একমাত্র মুসলমানের নন। মুসলমান ও অন্য ধর্মাবলম্বী সকলকেই তিনি সচক্ষে দেখেন।" আকবরের মত ভণ্ডামির আশ্রয় না নিয়ে ইসলামী সাম্রাজ্য অটুট রাখতে—দৈত্য, আবার ঈশ্বরের দূত। নাট্যকার তাকে জাতীয় ভাবনায় যুগানুসারী করেছেন মাত্র। যদিও নাটকের শেষ অঙ্কের ঔরঙ্গজেব ইতিহাসে নেই। যদিও স্বীকার্য—দেবালয়ের পুরোহিতদের কাছে পুরুষাণুক্রমে রক্ষিত ঔরঙ্গজেবের ফরমান গুলো সাক্ষ্য আলমগীর প্রচার করেছেন—উচ্চ-নীচ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই শান্তিতে থাকবে। শরিয়ত মতে ঘোষণা করেছিলেন—"হিন্দুদের মন্দির ও প্রতিমা পূজার স্থান সমূহ অক্ষত থাকবে .... আমাদের হিন্দু প্রজাগণ সুখে শান্তিতে বাস করুক এবং আমাদের মঙ্গল কামনা করুক এই আমরা চাই।"[৭] আবার "ঔরঙ্গজেব মথুরার মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করেন[৮]—তাও সত্য।

দ) 'আলাদীন' (১৯২২) : সাধারণ ঘরের সন্তান আলা যাদুকরের ও পরীর কল্যাণে গুপ্তধন পেয়ে দৈত্যের বদান্যে নবাব কন্যার স্বামীতে রূপান্তরিত। এই ঘটনা সংলাপে দৃশ্যে মুসলমান রীতি রয়েছে। আলার মা স্বামীর বন্ধুর কাছে ছেলেকে পাঠাতে মিঞা সম্মোধন করেছে। একে অপরকে জানিয়েছে সেলাম। কাসিমের কারিগররা চোগা-চাপকান সেলাই করে। উজিরের ব্যাটা তাঞ্জামে চেপে যায়, চারজন গোলাম তাকে কাঁধে চাপিয়ে নিয়ে যায়। খোদার এই অসম বিচারে আলা বড় লোক হবার স্বপ্ন দেখে। যাদুকর "চাচা" সেজে প্রচুর ধন দিতে চেয়েছে, কারণ "ফকিরী নিয়ে কোন দরগায় ....চেরাগ জ্বেলে তসবী" পড়বো"। কৌশলে যাদুকর আলাকে মাটি চাপা দিয়েছে যক্ষ বানাতে। পরীরা তাকে উদ্ধার করে। এদিকে নবাব কন্যার সাদী দিতে চায় উজির পুত্র আসগরের সঙ্গে। মেয়ে অসম্মতি জানালে নবাবের নির্দেশে হাটে কেনা বাঁদীরা সাহাজাদীকে শাস্তি দিতে ব্যর্থ চেষ্টা করে। আলার মা মোহর এনে নবাবকে তার ছেলের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। নবাব মোহর হাতানোর পথ খুঁজতে থাকে। আসগর মামদো ভূতের হাতে মার খেয়ে পালায়, নবাব সব বুঝতে পেরে আলার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেয়।

ধ) 'গোলকুণ্ডা' (১৯২৬) : ইতিহাস মূলক রচনা তে ১৮টির বেশী মুসলমান রয়েছে। গোলকুণ্ডার সুলতান কুতুব শার কন্যা মনিজা ও আরজবন্দের সঙ্গে আওরঙ্গজেব পুত্র মহম্মদের বিবাহ প্রস্তাব ওঠে। ঘটনাচক্রে উজীরের পরিত্যক্ত ও

৬. 'ইসলাম ও ভারত'—সুরজিৎ দাশগুপ্ত ১৯৭৩।

৭. মহম্মদ আব্দুল কুদ্দুস—'আওরঙ্গজেবের সত্য স্বরূপ'-মাসিক মোহাম্মদী, ১৩৩৯।

৮ আব্দুর রহমান ফেরদৌসীর সাক্ষাৎকার—

ফকির হাসরৎ সার পালিত পুত্র হাসানের সঙ্গে বিয়ে হয়। ক্রুদ্ধ আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধে কুতব বিজয়ী হয়। আওরঙ্গজেব ছদ্মবেশে পুত্র মহম্মদকে নিয়ে ভারত দর্শনে বেরিয়ে ইসলাম ও মোগলের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন—"পৌত্তলিকতার এই বিশাল ভারত আজ মুসলমানের পতাকা তলে । রাজ্য লিপ্সা একে ইসলামের আয়ত্তে আনেনি, এনেছে ধর্মলিপ্সা। তাই পুত্রকে পিতৃনির্দেশ অমান্য করতে বলে, কারণ—তৈমুর বংশের কে না পিতৃদ্রোহী হয়েছে? আমার পিতা .... পিতৃব্য খসরু ....জাহাঙ্গীরকে খসরুর প্রতিদ্বন্দিতা করতে গিয়ে আকবরের বিরুদ্ধাচরণ করতে হয়েছিল। কুতব শার সঙ্গে বিরোধ বাধলে পিতৃভক্ত মহম্মদ পিতৃদ্রোহী হয়ে হাসানের সেনাপতি রূপে মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে। "ভারতবর্ষের ইতিহাসে এপ্রথা নতুন নয়।" কুতব কন্যাদের "নারীত্বের মূল্য" না দিলেও ইসলাম সম্মানের কথা বলেছে। এ নাটকে ক্ষীরোদ প্রসাদ রাজপুতকে হীন ও মুসলমানকে মহান করার চেষ্টা করলেও নাসিরের মুখে নাট্যকার ভাবনা স্পষ্ট হয়েছে। পাল্কীর যাত্রী আরজ মানুষের কাঁধে চাপবে না বলে বনের মাঝে নেমেছে। পথে ক্লান্ত, শীর্ণ হাসানকে দেখে "পর্দ্দানসীনতা" ভেঙে "বেগানা পুরুষের" সঙ্গে কথা বলেছে। ইসলামী সম্ভ্রম অপেক্ষা কর্তব্য বড় হয়েছে আরজের কাছে। এছাড়া ইরানের বীর রেজাক খাঁ মহান চরিত্রের মুসলমান রূপে নাটকে উপস্থিত। সে মুসলমান বলেই মৃত্যুকালে আওরঙ্গজেবের ঈশ্বর প্রার্থনার সময় দিয়েছে। অন্যরাও মর্যাদায় আচরণে যথার্থ মুসলমান হয়ে উঠেছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদের আলোচিত নাটক গুলোতে দেখা যায়, যুগ মানসিকতায় গিরিশচন্দ্রের প্রভাবে দেশাত্মবোধ কে কাজে লাগিয়েছেন। সবগুলো নাটক মর্যাদায় উতরে যায়না, তবুও ইসলাম দর্শন সমাজের গভীরে প্রবেশ না করেও মুসলমানকে এঁকেছেন। ক্ষেত্র বিশেষে মুসলমান হীন চরিত্র হয়েছে মনে হলেও মুখ্যত: হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য প্রদর্শন করিয়েছেন। মুসলমান মহান করে এঁকেছেন। বিশেষত, ঈশা খাঁ, আকবর, কমল, বঙ্গোরাঠোর এর একাধিক চরিত্র, আলমগীর প্রমুখের নামোল্লেখ করতেই হয়।

২। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে মুসলমান সমাজ ঃ একালের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাট্যকার দিজেন্দ্রলাল রায়। বিলাতফেরৎ স্বদেশ প্রেমী ব্যক্তিত্বে ও বাণীতে ঋজুতাকেই জীবনের মৌলিক অবদান করেছেন। সত্যবোধ তাঁর জীবনে শ্রেষ্ঠ সম্পদ—সামাজিক আচরণ, চাকরির জটিল ক্ষেত্র, সাহিত্যের বঙ্কিম গতি পরিক্রমা কোন ক্ষেত্রেই আপন স্বকীয়তাকে বিসর্জন দেননি। তোষণ নীতির বিরোধী দিজেন্দ্রলাল শাসকের রূঢ় মানসিকতাকে বুঝেও থেমে থাকেননি। 'প্রতাপসিংহ' নিয়ে ব্রিটিশ তাঁকে বারবার চাকরীতে বদলি করলেও তাঁর সিদ্ধান্তে ছিলেন অটল। বর্তমান ক্ষেত্রে. মূল রাণা

প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস, নূরজাহান, সোরাব রুস্তম, মেবার পতন, সাজাহান নাটকে দেশাত্মবোধের উন্মাদনায় এসে মুসলমান সমাজ, জীবনীকার জানিয়েছেন—'তাঁহার ঐতিহাসিক নাটকগুলি অতিসাবধানতার সহিত লিখিত, কোনস্থানেই তিনি ইতিহাসকে অতিক্রম করেন নাই, যেখানে ইতিহাস নীরব; মাত্র সেখানে তাঁহার মোহিনী কল্পনা অতি নিপুনতার সহিত কর্ণপাত করিয়াছে'।[৯] তাই অলোচ্য নাটক গুলোতে ইতিহাসের সঙ্গে সমকালীন সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে।

ক) 'রাণাপ্রতাপ সিংহ' (১৯০৫) : রাজ্যভ্রষ্ট মেবারের রাণা প্রতাপ ও মোগল সম্রাট আকবরের বিরোধ। অনেক বাধা পেরিয়ে চিতোর ব্যতীত সব উদ্ধার। শেষে আকবর তার চারিত্রিক মহত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে ও কন্যা মেহেরের অনুরোধে সারাজীবন প্রতাপকে বন্ধুর স্বীকৃতি দেন। এই কাহিনীতে কাল্পনিক মেহেরউন্নিসা ও সম্রাট ভাগিনেয়ী দৌলত্তউন্নিসার সঙ্গে রাণার ভাই শক্তসিংহের প্রণয় মূলক উপকাহিনী যুক্ত হয়েছে। শক্তসিংহের কথায় জানা যায়—সেনাপতি মানসিংহ— "সম্রাটের শ্যালক পুত্র" বৈবাহিক সম্পকে' হিন্দু-মুসলিমানের আত্মীয়তা। হল্‌দিঘাটের যুদ্ধে মেহের যেতে চাইলে আকবর অবাক হয়েছে- "সে কি! স্ত্রীলোক যুদ্ধে যাবে কি?" মেহেরের উত্তর— "কেন, স্ত্রীলোক কি মানুষ নয় যে চিরকালটা চাবিবন্ধ হয়ে থাকবে?" মেহেরের পক্ষে হজরত মহম্মদ, কোরাণও সমর্থন করে। নারী শিক্ষার জন্য সুদূর চীনদেশেও যেতেপারে, যুদ্ধেও যেতে পারে।[১০] মেহের দৌলতের সংলাপে মোগলপরিবারের অনূঢ়ার যন্ত্রনার চিত্র—তাদের বিয়ে হবেনা। শুধু স্বপ্ন দেখে, হায় তুলে, খেয়ে ঘুমিয়ে "ওমর খাইয়াম পড়ছি, চিত্ত-চকোরের চেহারাটা কড়িকাঠের গায়ে এঁকে নিচ্ছি অথচ সম্রাট," আমাদের পিতার ও শতাধিক বেগম আছে। মোগল যুবতীর এই যন্ত্রনা বাস্তবিক, ইতিহাস সম্মত। জাহানারা লিখেছেন 'মুঘল রাজকুমারীর বিবাহ হবেনা—এই ছিল সম্রাট আকবরের আদেশ। সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আকবর মুঘল রাজকুমারীকে উৎসর্গ করেছিলেন।[১১] হলিদিঘাটের যুদ্ধ শিবিরে দৌলত ইসলামের শাসন মানতে নারাজ — "মুসলমানের এই বিষম আবরু প্রথার আমি হাড়ে চটা।" পর্দা প্রথা অনুযায়ী নারী মুখ ও হাতের কব্জি খোলা রেখে যেকোন পুরুষের সঙ্গে কথা বলা, বাজার করতে পারে—শ্রদ্ধেয় ফেরদৌসী সাহেবের এই স্পষ্ট উক্তি সূত্রে মেহের কোন অর্ধামিক কাজ করেনি। শক্তি সিংহের সংলাপে আকবর "এক কূট বিবেকহীন, কপট, রাজনৈতিক" আর "সেলিম এক নির্বোধ .... বিদ্বেষ পরায়ণ রক্ত পিশাচ।" অবশেষে মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত বন্দী শক্ত সিংহকে মুক্ত করেছে মেহের। কিন্তু 'যবনীকে বিবাহে' দ্বিধা প্রকাশ করেছে শক্ত সিংহ। যদিও তার পূর্ব পুরুষ বাপ্পারাও যবনী বিবাহ

৯। দেবকুমার রায়চৌধুরী—দ্বিজেন্দ্রলাল।

১০। প্রাগুক্ত পাদটীকা—'৮'।

১১। প্রাগুক্ত পাদটীকা-'৫'

করেছিল। আকবরের নিকটে দৌলত শক্ত সিংহের বিবাহের কথা স্বীকার করলে সম্রাট রুষ্ট হন। মেহেব বলেছে—"কাফেরের সঙ্গে মোগলের বিবাহ এ নূতন নয় সম্রাট!"

রাজনীতির প্রশ্নে মেহের নাট্যকারের বাহন ও কোরাণ সমর্থিত কথা বলেছে- "ধর্ম্ম এক, ঈশ্বর এক! নীতি এক .... মানুষ এক।[১২] কিন্তু আকবরের কাছে প্রভেদ হল- দৌলত মুসলমান আর শক্ত সিংহ কাফের, সে মুসলমান হলে তাঁর আপত্তি হত না। আকবরের কাছে একশ স্ত্রী হল "প্রয়োজনের পদার্থ, বিলাসের সামগ্রী, সন্মানের বস্তু নহে।" একথা অবশ্যই ইসলাম অনুমোদিত নয়। স্ত্রী-নারী সম্মানের যোগ্যা — স্বয়ং হজরত মহম্মদ তা দেখিয়েছেন। এখানে আকবর হীন মনে হলেও যুক্তি ও ঘটনায় সবই স্বীকার্য নয়। কেননা কারও কারও কাছে তিনি জাতীয় সম্রাট হলেও তা রাজনৈতিক কারণেই। তিনি সুন্নীশ্রেণীর হয়েও নিজে সিয়া-সুন্নী কিছুই মানতেন না, আকবর এক লিঙ্গের মন্দিরের বেদীর উত্তোলন করে .... কোবাণ রেখেছিলেন; আবার বিরুদ্ধ শক্তিকে সংহত করতে হিন্দুকে দিয়েছিলেন মুসলমানের পাশে সম্মান, অধিকার।[১৩] মেহের ক্ষোভে প্রতাপের গৃহে আশ্রয় নিলে রক্ষণশীল রাজপুত প্রতাপ তাকে কন্যার মত রেখেছেন—এটা বাস্তব কিনা সে প্রশ্ন ওঠে। হয়ত দেশাত্মবোধের খাঁড়া পড়েছে এখানে। তবে নাট্যকার কল্পিত 'আদর্শবাদের বাস্পে ঐতিহাসিক নাটকের বাস্তবতা, প্রত্যক্ষতা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে"[১৪] একথা সত্য। যবনী বিবাহের অপরাধে শক্তসিংহকে ত্যাগ করেছে প্রতাপ। সেলিমের সঙ্গে মানসিংহ ভগ্নি রেবার বিবাহে দর্শকদের কথাতে হুমায়ুন, সেলিম, মোগলের একাধিক বিবাহের খবরও প্রকাশিত। উল্লেখ্য ইসলাম শতাধিক বিবাহের অনুমতি কোথাও দেয়নি। শেষাবধি আকবর কন্যা মেহের জাতি ধর্মের উর্দ্ধে সার্বভৌম প্রেম—বিশ্বপ্রেমের প্রতীক হয়ে উঠেছে, যার পূর্ণরূপ 'মেবার পতন' নাটকের মানসী চরিত্র।

খ) দুর্গাদাস (১৯০৬) : পিতা কার্ত্তিকেয় চন্দ্রের দেবচরিত্র সম্মুখে রেখেই 'দুর্গাদাস' লিখিত, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার পাশাপাশি এ নাটকে মুসলমানও মর্যাদা পেয়েছে। ভারত সম্রাট ঔরঙ্গজেব, মৌজাম-অজীন-আকবর কামবক্স' সম্রাটের চার পুত্র, সেনাপতিদ্বয় দিলীর খাঁ ও তাহাবর খাঁ, জনৈক মুসলমান কাশিম, স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ার, আকবর কন্যা রাজিয়া-উৎ-উন্নিসা উল্লেখ যোগ্য মুসলমান চরিত্র। যশোবন্তের স্ত্রী ও নাবালক পুত্রকে রক্ষা করা, স্বাধীনতা, জিজয়া করের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, মোগলের পরাজয়, দুর্গাদাস ও দিলীর খাঁর মহত্ব প্রকাশের কাহিনী

১২। কোরাণের সুরা ইউনিস-১০ সুরা ১১ পারায়-'সমগ্র মানব একজাতি'। আম্বিয়া ২১ সুরার ১৭পারাতে বলা হয়েছে- 'মানুষেব ধর্ম মূলত· এক"—কোরাআন শরীফ"—মাওলানা মোবারক করীম জওহর, কলি, হরফ-১৯৭৪।

১৩। প্রাগুক্ত পাদটীকা-৫।

১৪। নাট্যকার দিজেন্দ্রলাল- সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত-১৯৭৯।

দুর্গাদাস। গুলনেয়ার ও রাজিয়ার ব্যর্থ প্রেম, কৃত কর্মের জন্য সম্রাটের অনুতাপ প্রভৃতিতে এসেছে মুসলমান সমাজ। সমর সিংহের সংলাপে ঔরঙ্গজীব "আকবরের মত ভণ্ড নহেন। মহাশয় খাঁটি মুসলমান সরল গোঁয়ার ধার্মিক মুসলমান। ....বিবাহচ্ছলে হিন্দুর হিন্দুত্ব নাশ করেন না।" ঔরঙ্গজীবও তা স্বীকার করেন। জিজয়া করের বিরুদ্ধে রাজপুত ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। উল্লেখ্য এজন্য ঔরঙ্গজীবকে দায়ী করা হলেও - এ কর চালু করেছিলেন তাঁর পূর্বপুরুষেরা। তিনি পুনঃ প্রচলন করেন মাত্র। ঐশ্লামিক বিধিতে প্রত্যেক মুসলমানের 'ফরজ' ইসলামের পতাকার জন্য যুদ্ধে প্রাণ দিতে হবে। কিন্তু অহিন্দুরা এই শতার্ধীন নন। তাই যুদ্ধ খরচের জন্য বাড়তি কর চাপানো। যে হিন্দু যুদ্ধে যোগ দেবে সে এই করের বাইরে থাকবে। তবে সম্রাট স্বধর্ম রক্ষণে সমস্ত রকম অত্যাচার করেছেন। সেজন্য অনুতপ্ত; আবার "কোরানের কুৎসা ....মসজিদ অপবিত্র ....মোল্লার অপমানে" নিষ্ঠুর। কোরাণের নিন্দার জন্য জিভ কেটে নিয়েছেন। শেষে জেনেছেন তারই কৃতকর্মে পুত্রেরা অমানুষ, দুঃখে ব্যথায় রাজপুত পাঠানকে ক্ষমা করে মক্কা যাত্রা পথে মারা গেছেন।

দিলীর খাঁ ধর্মে-কর্তব্যে মহান মুসলমান, অন্যায়কে সর্বতোভাবে বাধাদেন। সত্য কথা বলতে ভয় নেই। তাইবর খাঁ সম্রাটকে হত্যা করতে গেলে বেইমানকে নিহত করেও পুরস্কার নেয়নি—কারণ এ তার 'কর্তব্য'। তাঁর কাছে 'দুর্গাদাস তীর্থ', দুর্গাদাসের কাছে দিলীর মক্কা। অন্যদিকে আকবর আজীম "গোঁড়া মুসলমান মদ ছোঁয় না, গান শোনেনা, দশবার নেওয়াজ পড়ে" ইত্যাদি মিথ্যে বলে তাহবর সম্রাটকে খুশী করতে চায়। আর সে নিজে রাজ্য ত্যাগে প্রস্তুত, কিন্তু "সুরা, নারী আর গান ত্যাগ কর্ত্তে প্রস্তুত নই"। উল্লেখ্য, ইসলামে মদ হারাম, গান নিষিদ্ধ নয়, তবে আলেমগণ গানের 'কথা' ও 'সুরে' কিছু বিধিনিষেধ করেছেন। আকবরের 'উর্দু' ভাষা ব্যবহার এনে দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙালী মুসলমানের অনেকদিন বাংলাকে অবজ্ঞা করার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যশোবন্তের শিশু পুত্রকে বাঁচাতে কাশিমকে দায়িত্ব সঁপেছেন দুর্গাদাস। কারণ "তুমি মুসলমান, তোমকে কেউ সন্দেহ কর্ব্বে না"। মুসলমানের নিন্দা শুনে কাশিম বলেছে— "মহারাণী, মোদের জাতের নিন্দা করো না—মোরা জাত খারাপ নই। মোরা সব হতে পারি, নেমক হারাম নই"। যথার্থ ধার্মিক মুসলমান সমাজজাত কাশিম।

গ) 'নুরজাহান' : পাঁচ অঙ্কে বিধৃত জাহাঙ্গীরের রাজত্বের পটভূমিতে রচিত ট্র্যাজেডি নূরজাহান। শের খাঁ পত্নী মেহের কে পেতে তার স্বামীকে হত্যা করে বন্দিনী মেহেরকে চার বছর পরে জাহাঙ্গীর বিয়ে করে। মেহের হয় সম্রাজ্ঞী নূরজাহান। প্রতিহিংসায় সম্রাটকে হাতের পুতুল করে সব পেয়েও শেষে আত্মধিক্কারে পাগলিনী, খুরমের সাজাহান নাম নিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠানে নাটকের সমাপ্তি। নাটকের কুশীলব সকলেই

মুসলমান। জাহাঙ্গীর সুন্নী শ্রেণীর মুসলমান। ইনি শবিয়ত মানতেন, কোরাণ হাদিসের বিধান পালন ছিল কর্তব্য। কিন্তু ধর্ম বিষয়ে ছিলেন উদাসীন। আকবরের ধর্মনীতিকেও ক্ষুন্ন করেননি, কিন্তু তার চর্চাও করেননি।[১৫] শের খাঁর সংলাপে সম্রাটের নারী লোলুপতার কথা। মেহের কে পাবার নেশায় জাহাঙ্গীর উন্মত্ত। আকবর প্রচলিত প্রথা—"সম্রাটের যাঁরা অতি আত্মীয় .... তাঁদের মহিলারা অবগুণ্ঠিত হয়ে মাঝে মাঝে" নৃত্য দেখান— এ ইতিহাসেও সত্য। এরই সুযোগে মেহেরকে দেখে ফেলেন সেলিম। সেই সূত্র ধরে সম্রাট হয়ে মেহের কে পেতে চেয়েছে। পেয়েওছে কিন্তু তা তাব পতনের কারণ হয়েছে। মোগলবংশে পিতৃদ্রোহীতা বংশগত ঐতিহ্য, তাই খুরমের পিতৃদ্রোহীতা বা রাজদ্রোহীতা। শের খাঁকে কৌশলে হত্যাকরে— মৃত্যুর পূর্বে সে "পশ্চিমাভিমুখী হইয়া .... নিদ্রিত নয়নে প্রার্থনা"— অর্থাৎ নমাজ করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

আগ্রা প্রাসাদে শের খাঁর বিধবা পত্নী মেহের বিয়েতে সম্মতি দেয়নি, শর্তসাপেক্ষে রাজী হয়েছে চারবছর পর। এখানে মুসলমান সমাজের একাধিক বিবাহ প্রসঙ্গও এসেছে। যদিও মুসলমান সমাজে "প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েরা স্বেচ্ছায় চিরকুমারী থাকিতে পারেন।"[১৬] মেহের সম্রাটের বিয়ে বা নিকাহ্‌র প্রশ্নে সম্ভ্রান্ত মুসলমান সমাজের বিবাহ চিত্র পাওয়া যায়। একই সঙ্গে সম্রাটপুত্র খুরমের সঙ্গে "মেহেরের ভাই" আসফের কন্যার" বিয়ের কথা ব্যক্ত। মুসলমান সমাজে এই বিয়ে সিদ্ধ। (এবিষয়ে ১ম অধ্যায়ে আলোচনা হয়েছে) খাদিজা ওরফে মমতাজ সাজাহানের মুখে দেহে নিরাকার আল্লার স্মৃতিকে কল্পনা করেছে। নূরজাহান সাজাহানকে কুমন্ত্রণা দিতে গিয়ে মোগল বা অভিজাত মুসলমান পরিবারের ঐতিহ্য এনেছে। সতীন পুত্র ও ভাইয়ের জামাতাকে ভাবী সম্রাটের প্রলোভন দেখিয়ে খসরুকে হত্যা করতে উত্তেজিত করেছে। ইসলামী বিধি অমান্য করে জাহাঙ্গীর নৃত্য-গীত সুরাপানে মত্ত হয়েছে। শেষে নূরজাহানকে পরাভূত করে সাজাহান নাম নিয়ে খুরম বসেছে দিলীর সিংহাসনে। কর্ণ সিংহের সঙ্গে মিলন ঘটেছে সাজাহানের। তার কথায় বাঙালী হিন্দু মুসলমানের রক্তাক্ত ইতিহাসের সত্যতা—"হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই"। রাণা ও সম্রাটের উষ্ণীষ বদল ও আলিঙ্গনে সমকালীন যুগ চেতনার প্রতিচ্ছবি।

ঘ) 'সোরাব রুস্তম' : তিন অঙ্কে "অপেরায় আরম্ভ হইয়া ক্রমে ক্রমে নাটকে শেষ হইয়াছে" (দ্বিজেন্দ্রলাল)। স্থান পেয়েছে পারস্যবীর রুস্তম ও পুত্র সোরাবের জীবনের কাহিনী। চরিত্র সব মুসলমান। সমাজ সেভাবে না এলেও ঘটনা মুসলমানেরই। বীর রুস্তম তুরাণ রাজকন্যা তামিনাকে বিয়ে করে পারস্যে এসে সুরাপানে মত্ত। ২০ বছর পর তাদের পুত্র সোরাব পিতার সন্ধানে যায়। পথে গুহাস্থানের ইরাণ দুর্গ দখল করে

১৫। প্রাগুক্ত পাদটীকা '৬'।

১৬। "মুসলমান সমাজে কন্যাদায়" লেখক খাজা; দ্রষ্টব্য মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা,১৩২৭।

সোরাব। গুহাস্থানের কন্যা আফ্রিদ সোরাবেব বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে পিতৃহত্যাকারীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চায়। রুস্তম চিরকাল স্বেচ্ছাচারী, নিষ্ঠুর, পারস্যরাজ কৈকাসুর এর পক্ষে এতদিন যুদ্ধ করেছে। সোরাব এসেছে কৈকাসুরের স্বৈরাচারকে ধ্বংস করতে। সৈন্যধ্যক্ষ তাতারের বেইমানীতে পিতাপুত্রের পরিচয় হয়নি। যুদ্ধে সুরা পাগল রুস্তম অন্যায় ভাবে না জেনে সোরাব কে হত্যা করেছে। তামিনা এলে পিতা পুত্রের পরিচয় হয়েছে, মারা গেছে রুস্তমও। আফ্রিদ পরপারে সোরাবের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য করেছে আত্ম হত্যা। রুস্তম প্রস্তরবৎ স্থির, ঝড়-বৃষ্টি-বিদ্যুতের নিশিতে পদতলে সন্তানহারা তামিনা—নাটকে নেমেছে যবনিকা।

দেশবিখ্যাত বীর রুস্তম সাধারণ নাগরিকের 'সেলাম' পাইনি বলে ক্রুদ্ধ হয়ে তুরাণ রাজসভায় আসে। তুরাণ রাজকন্যা স্বপ্নে দেখা, কানে শোনা রুস্তমকে পতিত্বে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে গভীর রাতে রুস্তমের নিদ্রা কক্ষে এসেছে নির্ভয়ে পত্নীর দাবি নিয়ে— "অসূর্য্যম্পশ্যা রূপী নারী আমি" হয়েও। কৈকাসুরের মহিষীর কথায় কফোনি অর্থাৎ কবরে দেবার পূর্বে মুসলমান মৃতদেহ আচ্ছাদনের কাপড় অর্থাৎ কফিন। আফ্রিদ মুসলমানী হয়েও বালকবেশে যুদ্ধে এসে সোরাবের অস্ত্রে উষ্ণীষ খুইয়ে নারীরূপ প্রকাশে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে রুস্তমের সাহায্য নিয়েছে সোরাবকে ভালবেসেও। শেষে মৃত প্রণয়াস্পদ সোরাবের বুকে আছড়ে পড়ে আপন ছুরিকাঘাতে সোরাবের অনুগামিনী হয়েছে। রুস্তম বীর হয়েও ভাঁড়, সুরাসক্ত, বিলাসী। শেষে পুত্রকে হত্যা করে নিজেও মারা গিয়ে বিয়োগান্ত নাটকের নায়ক। তামিনা যথার্থ মুসলমানীর মর্যাদা রেখেছে শেষাবধি।

ঙ) 'মেবার পতন' ঃ এক "মহানীতি—বিশ্বপ্রেম" প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত। রাণা প্রতাপের পুত্র অমর সিং অনিচ্ছা সত্বেও দুবার মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পর, প্রতাপ সিংহের বিধর্মী ভ্রাতুষ্পুত্র মহাবৎ খাঁ হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামী ও অহংকারের বিরুদ্ধে মোগল সেনাপতি হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে যথার্থ শিক্ষা দিতে। তৃতীয় যুদ্ধে মোগল জয়ী হয়ে মহাবৎ অমরসিংহর দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নাট্যকারের মানসকন্যা মানসী ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধের মাঝকানে দাঁড়িয়ে যথার্থ 'মানুষ' হবার গানে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেছে — এ ঘটনায় বারবার এসেছে হিন্দু মুসলমান সমাজ চিত্র। প্রতাপের সেনাপতি গোবিন্দ সিংহের তরবারি "মুসলমানের রক্তের স্বাদ" পেতে চাই। চারণী দল গান গেয়ে সাতশ বছরের মুসলমানের দর্প চূর্ণ করতে চায়। সগর সিংহ ও অজয় সিংহের সংলাপে মুসলমানের ধর্ম-নীতির কথা—সগর—"ও রক্তবীজের বংশ। কত কাটবে? আর মুসলমানের দল সংখ্যা যদি কমে যায় ত আবার গোটাকতক হিন্দুকে মুসলমান করে আবার লড়বে"। সগর পুত্র মহীপৎ সহজেই কলমা পড়ে "মুসলমান হল"। গোবিন্দ সিংহের কন্যা কল্যাণীর স্বামী মহাবতে এ পরিণত হলে, পিতা তাকে জামাতা বলে

স্বীকার করে না । মহাবতের বিশ্বাস—ইসলাম ধর্ম সত্য। হিন্দু ধর্ম তার স্ত্রীর পতিভক্তির পুরস্কার নির্বাসন দিয়েছে। সেই ক্ষোভে আজ মাতৃভূমি হিন্দুর বিরুদ্ধে সে। এখানে সংঘাত ধর্মের সঙ্গে ধর্মের আবার। মহাবৎ স্বীকার করেছে— জাতিতে সে রাজপুত, ধর্মে মুসলমান। গোবিন্দ সিংহও মহাবতের হাতে মরতে চেয়েছে কারণ সে "যবন ধর্মে হলেও জাতিতে রাজপুত"। এখানে জাতিত্বই বড়। আবার সত্যবতী কে দিদি ডাক দেওয়ার পর ভ্রাতা-ভগ্নির স্নেহই বড় হয়েছে — ধর্ম বাধা হয়নি। শেষ দৃশ্যে মহাবত - অমর দ্বন্দ্ব যুদ্ধের মাঝে মানসীর কথা ও চারণীদের গানে—জাতি-ধর্ম-দেশ এর উর্দ্ধে মনুষ্যত্বই বড় হয়েছে—মিলন ঘটেছে হিন্দু-মুসলমানের। অবশ্য এই ঘটনায় হিন্দু-মুসলমান ধর্মের উদারতা, রক্ষণশীলতা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব স্বল্পক্ষেত্রে হলেও এসেছে।

চ) 'সাজাহান' : সমালোচকদের মতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক 'সাজাহান'— দ্বিজেন্দ্রলাল তো বটেই, বাংলা নাটকেও। সাজাহানের জীবনের শেষ সাত বছরের ঘটনায়, স্রষ্টার নাট্যিক কল্পনায়, শিল্পসিদ্ধিতে নাটকটি অমরত্ব পেয়েছে। এখানে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ভাবে মুসলমান সমাজের অনেক ছবি রয়েছে। সাজাহান যুগচেতনা অপেক্ষা চিরন্তন মানবিক রসচৈতন্যে অধিক সার্থক। ঔরঙ্জেবের মনস্তাত্বিক আবেদনে স্বার্থ-সিদ্ধি, কোরাণ হাতে শপথ, মহম্মদের কর্তব্য বোধ, জাহানারার অনূঢ়া জীবন প্রভৃতিতে উচ্চ বংশীয় মুসলমান সমাজের পরিচয় মেলে। সর্বোপরি শয়তান ঔরঙ্জেব কে শেষাবধি ক্ষমা করে শুধু দুটি মুসলমান চরিত্রের সীমা অতিক্রম করেনি, চিরন্তন পিতা পুত্রের সম্পর্ক স্থায়িত্ব পেয়েছে — যা মুগ্ধ করেছে হিন্দু-মুসলমান বাঙালীকে। যদিও ঔরঙ্জেব চরিত্রাঙ্গনে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনেছেন অনেকে। রাজনৈতিক কারণেই সুন্নি ঔরঙ্জেব শিয়া পন্থী দারার হাতে সাম্রাজ্য ছেড়ে না দিয়ে, বংশের ধারানুসারে ভাইদের হত্যা করে সুন্নি মুসলমান সাম্রাজ্য কে স্থায়িত্ব দিতে চেষ্টা করেছেন। শেষে সম্রাট হয়েও পিতার নিকট ক্ষমা প্রদর্শন ও স্থবির পিতার সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রচেষ্টার ঔরঙ্জেবের নৃশংসতা দুর্বল হয়েছে অনেকটা।

দারা-জাহানারর কথায়-মোগল বংশরীতি জ্যেষ্ঠ পুত্রই সিংহাসনে বসার অধিকারী। নর্মদাতীরে যুদ্ধ কৌশল রচনায় ঔরঙ্জেব ধর্মকে করেছে হাতিয়ার—"যুদ্ধের পূর্ব্ব দিন আমি জনকতক সৈন্যকে মোল্লা সাজিয়ে এপারে পাঠিয়েছিলাম।" তারা বুঝিয়েছে" কাফেরের অধীনে, কাফেরের সঙ্গে দারার পক্ষে যুদ্ধ করা বড় হেয় কাজ; আর সেটা কোরাণে নিষিদ্ধ।" এতেই সহজে জয় হযেছে। সেনাপতি দিলীর সমীপে দারা পুত্র সোলেমানের "জানু পেতে ভিক্ষা" তে মুসলমানের পরিচয়। দিলীর "........আমি দারার নিমক খেয়েছি। মুসলমান জাত, নেমকহারামের জাত নয় ...." ইত্যাদি ইসলাম অনুসারী। যদিও শায়েস্তা খাঁ মুসলমান হয়েও বিশ্বাস ঘাতক। আগ্রাদুর্গে বন্দী সাজাহান ঔরঙ্জেব পুত্র মহম্মদের কাছে পিতার খোঁজ চাইলে, মহম্মদ বলেছে—

"আকবরের কবরে নওয়াজ পড়তে" গেছেন। ক্ষুব্ধ সাজাহান দুর্গ বাইরে আসতে চেয়ে শপথ করেছেন মহম্মদের কাছে। তাতেই ইসলাম ধর্ম— পৃথিবী দিয়ে শুধু নয়— "(রাজমুকুট আনিয়া ও শয্যা হইতে কোরাণ লইয়া) দেখ মহম্মদ! এই আমার মুকুট, এই আমার কোরাণ! এই কোরাণ স্পর্শ করে শপথ কর্চ্ছি ....এই মুকুট আমি তোমার মাথায় পরিয়ে দেবো"। আবার ঔরঙ্জেব মোরাদকে ধর্মের নামে মদের পথ ধরিয়েছে, যদিও তা ইসলাম সমর্থিত নয়। অথচ সে নিজে কখনও মদ ছোঁয়নি কোরাণের নির্দেশেই। সে নিজে সর্বদা ইসলাম শাসন বজায় ও ইসলাম প্রচারেই নিয়োজিত। নিষ্ঠুর হয়েছে ধর্মও রাজনৈতিক কারণে। তবুও সাচ্চা মুসলমানের কর্তব্য নিষ্ঠায় অটুট থাকতে চেয়েছেন। তাঁর স্বগত সংলাপ সে কথার প্রমাণ দেয়। "আমার হাত ধরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ খোদা! আমি এ সিংহাসন চাইনি। তুমি আমার হাত ধরে এ সিংহাসনে বসালে! কেন? তুমিই জান" (২/১)।

সুজা-পিয়ারার প্রেম ভালবাসাতেও কন্যার বিবাহ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে মুসলমান সমাজের বিবাহ রীতি —ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদের সঙ্গে কন্যার বিবাহ সম্মন্ধ স্থির হয়েছে। পিতৃব্যের কন্যার সঙ্গে মুসলমান সমাজে বিবাহে বাধা নেই (পূর্বে ব্যাঘ্যাত হয়েছে)। দেশদ্রোহীতার অপরাধে জাহানারা সম্রাট ঔরঙ্জেবকে দায়ী করতে চাইলে, ধর্মই হাতিয়ার— "সেই খোদারই 'ফকিরি কচ্ছি"। বলে ভেল্কি দেখিয়ে সুচতুর ঔরঙ্জেব সভাকে স্বপক্ষে এনেছে। "আল্লার নামে শপথ" করেছে। খিজুয়ার যুদ্ধে ও দিলদারের কথাতে— "শত্রুতা বাড়াবার জন্য মানুষ কেন এতগুলো ধর্মের সৃষ্টি করেছিল"! আবার দিলদারের সংলাপেই—মুসলমানের দাড়ি, পশ্চিমমুখো হয়ে নমাজ পড়া, কাছা না দেওয়া, ভাষা ব্যবহারের বাম থেকে ডাইনে না গিয়ে ডান থেকে বায়ে যাওয়া (উর্দু)র বাস্তব সত্য সমাজ পরিচয় হিন্দু-মুসলমানকে পৃথক করেছে; স্পষ্ট চিত্র মিলেছে মুসলমান সমাজে এ প্রসঙ্গে মুসলমানী পোশাকাদি, রীতিও স্থান পেয়েছে। সুজার চোখে ভাইদের পরিচয়েও—"দারা হিন্দু ধর্মের পক্ষপাতি-ভণ্ড। ঔরঙ্জীব গোঁড়া মুসলমান—ভণ্ড। মোরাদও মুসলমান-গোঁড়া নয়-ভণ্ড।"

দারার পক্ষে যোগ দিয়ে ঔরঙ্জেবের শ্বশুর মারা গেলে সুজার উক্তিতে মুসলমানের ধর্মবোধ— "বৃদ্ধ যোদ্ধা .... মারা গেল-সুদ্ধ ধর্মের খাতিরে। শোভানাল্লা।" যদিও এ ধর্ম ন্যায়ের পক্ষে কর্তব্য বোধ। কাজী অন্যায় ভাবে বিচারের নামে দারার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। এবিচার কাজীর নয়, সম্রাটের ইচ্ছা। দিলদার বলেছে- "জাঁহাপনা। সে কাজীরা যখন দারার মৃত্যু দণ্ড উচ্চারণ কর্চ্ছিল; তখন তারা ঈশ্বরের মুখেরদিকে চেয়েছিল না। তখন তারা জাঁহাপনার সহাস্য মুখখানি কল্পনা কর্চ্ছিল, ... বিচার! যেখানে মাথার উপর প্রভুর আরক্ত চক্ষু চেয়ে আছে, সেখানে আবার বিচার।" ঔরঙ্জেব দণ্ডাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে চাইলে "জিহন। খোদাবন্দ! দারা কাফের। কাফেরকে

ক্ষমা কর্ব্বেন আপনি খোদাবন্দ এই ইসলাম ধর্ম্মের রক্ষার জন্য আপনি আজ ঐ সিংহাসনে বসেছেন— .... ধর্মের মর্যাদা রাখবেন।" তাই ইসলাম ধর্মের জন্য জিহন তার প্রাণদাতা দারাকে হত্যা করেছে-"সম্রাটের আজ্ঞা। কাজীর বিচার"-এ সোলেমানকে মৃত্যু দণ্ড দিয়ে ঔরঙ্জেব "খোদার নাম" করার সুয়োগ দিয়েছেন। ঔরঙ্জেবের ভ্রাতাদের হত্যার পর মহম্মদ পিতাকে ও ঈশ্বরের কাছে প্রশ্ন করেছে- "এছাড়া কি আরো নরক আছে? সে কি রকম খোদা!" ৫/৫ দৃশ্যে দেখা যায় ঔরঙ্জেব স্বভাব শয়তান নয়, তার মধ্যেও রয়েছে মুষ্যত্বের, বিবেকের চেতনা। তাই নাটকের অন্তিমে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে পিতার কাছে। পুত্রশোকাতুর পিতা, পিতার অনুরোধে জাহানারা তাকে ক্ষমা করেছে। যদিও দারা কন্যা জহরৎ তাকে ভয়ংকর অভিশাপ দিয়েছে। কিন্তু এখানেই সমাজ-ধর্ম নাট্য-কাহিনী-চরিত্র-পরিবেশ—দেশকাল পেরিয়ে চিরন্তনত্ব পেয়েছে পিতা-পুত্রের বন্ধনগ্রন্থিতে। এ নাটকেও জেবুউন্নিসা, জাহানারা অনূঢ়াই থেকে গেছে। উপযুক্ত পাত্রের অভাবে আকবর পরবর্তীকালেও মোগল রমণীর বিয়ে হয়নি। (জাহানারার আত্মজীবনীর কথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে।)

দ্বিজেন্দ্রলাল দেশাত্মবোধক আন্দোলনের সময় নাটক গুলো নিখেছেন। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতা, সত্যতা প্রকাশ পেয়েছে। উদীপুর বেগমের মদ্য পান ইত্যাদিতে মুসলমান বিকৃত হয়েছে কোথাও। আকবরের সমন্বয় বাদী ভাবনাও প্রকাশিত। আবার ক্ষমা প্রদর্শন, বন্ধুত্ব তাকে যেমন মহৎ কয়েছে, তেমনি নারীর সন্মানহীনতা, মোগলের বিবাহ প্রথা তাকে ছোট করেছে। মোগলের পরিবার ও সমাজ ধর্ম ও বংশপ্রথা বড় হয়ে উঠেছে। নূরজাহান, জাহাঙ্গীর শেষাবধি মহৎ, মেবার পতন-এ হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ও মনুষ্যত্বের জয়গান, সাজাহান-এ ধর্ম সমাজে চিরন্তন পিতা-পুত্র। সব মিলিয়ে তুলনায় দ্বিজেন্দ্রলালের মুসলমান সমাজ অনেক বেশী কর্তব্য পরায়ণ উদার—মহান।

৩। রবীন্দ্রনাথের নাটকে মুসলমান সমাজ : রবীন্দ্রনাথ উদার হৃদয়ের কবি-সাহিত্যিক।[১৭] সাহিত্যের সমস্ত দিক তাঁকে আশ্রয় করেই বিশ শতকের প্রথমার্থ রবীন্দ্রযুগ। নোবেল বিজয়ী এই বিশ্বকবি বিভিন্ন ধরণের নাটক লিখেছেন। তাঁর সৃষ্টির বৈচিত্র্যের মধ্যে বর্তমান আলোচ্য—কাব্যধর্মী নাটক প্রকৃতির প্রতিশোধ (১৮৮৪) এবং মুকুট ১৯০৮, প্রায়শ্চিত্ত (১৯০৯) এর কথা উল্লেখ করতেই হয়।

ক) প্রকৃতির প্রতিশোধ : রূপকাশ্রিত অনাথা বালিকাকে কেউ স্থান না দিলে তপস্যা মগ্ন সন্ন্যাসী তাকে আশ্রয় দেন। বালিকাটি স্পষ্ট মুসলমান না হলেও পথিকদের

১৭ রবীন্দ্রনাথ মানবতাবাদী ...... একস্বর বাদী ব্রাহ্ম ...... সুফী কবি, মুসলিম বিদ্বেষ তাঁর ছিলনা, নিন্দাও করেননি কোথাও—প্রবন্ধ 'পঁচিশে বৈশাখ'—ড: আহমেদ শরীফ। দ্রষ্টব্য পূর্বপাকিস্থানের প্রবন্ধ সংগ্রহ সম্পাদনা মৈত্রেয়ী দেবী; ১৯৭০।

কথায় "ম্লেচ্ছ কন্যা", তাই সে ঘৃণার পাত্রী, অশুচি, অনাথা। ম্লেচ্ছ-অন্য ধর্মের মানুষ, রবীন্দ্রনাথ তাকে সন্ন্যাসীর চরিত্র দিয়ে সম্মান জানিয়েছেন। কথা কাব্যে কেশর খাঁ, পাঠান, নবাব দুটি চরিত্র সৃষ্টি; হিন্দু মুসলমান, স্বদেশী, সমাজ প্রভৃতি প্রবন্ধ, রাখীবন্ধন উৎসব, একাধিক ছোটগল্পে সৃষ্ট মুসলমান চরিত্র, বিশেষত: 'মুসলমানীর গল্প'-র বলিষ্ঠতার মধ্যে মুসলমান সমাজের যে পরিচয় বিধৃত, তাতে রবীন্দ্রনাথকে সম্প্রদায় সমাজের উর্দ্ধে উদার মানবপ্রেমিক বলে শ্রদ্ধা জানাতেই হয়।

খ) 'মুকুট' ঃ এ নাট্যে ঈশা খাঁ মহান উদারতা দিয়ে অঙ্কিত। ত্রিপুরায় রাজপুতের বিরোধ কাহিনীতে সর্বাপেক্ষা আদর্শবাদী, কর্তব্য পরায়ণ চরিত্র—সেনাপতি ঈশা খাঁ। ইনি "খাঁটি মুসলমান চরিত্র—জান ও জবান যাহার এক"।[১৮] ঈশা খাঁ শুধু সেনাপতি নন, রাজকুমার দের অস্ত্রগুরু। রাজকুমার রাজধরের ঔদ্ধত্যকে ব্যঙ্গের চাবুকে নিন্দার মধ্যে দিয়ে শায়েস্তা করেন। ইনি স্পষ্ট বাদী, বিবেকবান শুধু নন, নির্ভীক, সাচ্চা মুসলমান, মানুষ। স্বধর্মের বোধে হারজিৎ "আল্লার ইচ্ছা" যুবরাজের মুখে ঈশা খাঁ পরিচয় —"ওঁর সাদা দাড়ির মতো সমস্তই ওঁর মুখ।" শিষ্যদের আর্শীবাদে আল্লার কৃপা প্রার্থনা করেন। যুদ্ধে পারঙ্গমতা দেখান বৃদ্ধ বয়সেও। কিন্তু যুদ্ধের ছলনা তাঁকে বিমর্ষ করে। তিনি দেখতে পান—"আল্লার দূতেরা এক একসময় ঘুমিয়ে পড়ে, শয়তান তখন সমস্ত হিসাব উলটা করে দিয়ে যায়।" এ মুসলমানের সততার প্রকাশ। চাতুরীতে পাওয়া আরাকান রাজের মুকুটকে কর্ণ ফুলির জলে ফেলে দিয়েছেন। যুদ্ধের ভয়াবহতায় ধর্মনিষ্ঠ ঈশা খাঁর আল্লার প্রতি নির্ভরতা। তাঁর মৃত্যু ভয় নেই রাজকুমারদের নিশ্চিন্ততা তাঁকে উদ্বিগ্ন করেছে। নইলে "যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত্যু তো বিবাহ শয্যায় নিদ্রা। মৃত্যুকালে যুবরাজদের "আল্লার হাতে" দিয়ে গেছেন। যুবরাজ অপরাধের জন্য মার্জনা চাইলে তাঁর শেষ সংলাপ—মার্জনার কিছুনেই—"তোমার নির্মল প্রাণ আজ আল্লা যদি নেন তবে তার স্বর্গোদ্যানের কোনো ফুলের কাছেই সে ম্লান হবে না।" শিষ্য সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য যাঁর— তাঁর ধর্মের নিষ্ঠতা, উদারতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনা। শেষে সকল যুবরাজ "ঈশা খাঁর কবরে মাটি" দিয়েছে।

গ) 'প্রায়শ্চিত্ত' ঃ এখানে রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবন পরিবেশে রাজনীতি ও ইতিহাসকে যুক্ত করেছেন। প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্তরায়কে হত্যা বিষয়ে কাহিনীর ভিত্তিতে নাটক গড়ে উঠেছে। মজঃফরপুরের রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, বিপ্লবের ষড়যন্ত্র কবিকে অহিংসার পথে নিয়ে যায়। টলষ্টয় বুঝেছিলেন অন্যায়ে অন্যায়ের প্রতিকার হয় না—এ নীতি গান্ধী জীবনে গ্রহণ করেন, রবি কবি তাকে সাহিত্য রূপ দিলেন। স্বল্প ক্ষেত্রে হলেও বসন্ত রায়ের সঙ্গে আনলেন কবিপ্রাণা এক মহৎ পাঠান চরিত্র।

বসন্তরায়ের পাশে দণ্ডায়মান এক পাঠানকে প্রতাপাদিত্য গোপনে বসন্তরায়কে হত্যা করতে পাঠিয়েছে। কিন্তু বকশিষের বিনিময়ে সে বৃদ্ধকে মারতে চায়না, কারণ

১৮. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র জীবনী ২য় খণ্ড ১৩৬৭।

হত্যাকরে যা পাবে, হত্যা না করলে তদপেক্ষা বেশী পাবে। বসন্ত তার উপকারী, তাই অকৃতজ্ঞের মত কাজ সে করতে পারবে না। এর পেছনে কাজ করেছে তার ধর্মবোধ— "আমাদের কবি বলেন .... যে আমার উপকার করে আমি তার কাছে ঋণী। কোন কালেই সে ঋণ শোধ করতে পারব না।" সে বারবার কবির "বয়েৎ" আওড়েছে। পাঠান জানে অস্ত্রতে শত্রুকে বশ করা না গেলেও— "সংগীতে শত্রুকে মিত্র করা যায়।" সে বেইমান নয় বলেই প্রতাপাদিত্য কেও চিন্তা থেকে নিশ্চিন্ত করতে চায়।

আর এক মুসলমান লছমনকে "রামচন্দ্র রায়ের ছিন্ন মুণ্ডু" আনতে প্রতাপ নিযুক্ত করেছে। এখানেই পূর্বের পাঠান হোসেন খাঁর পরিচয় মেলে— প্রভুর হাসিতেই তার হাসি, নইলে সব অন্ধকার। এরপর প্রতাপ মুক্তিয়ার খাঁ নামে এক মুসলমানকে পাঠিয়েছে বসন্তরায়ের ছিন্ন মুণ্ডু আনতে মুক্তিয়ার বলেছে "মনিবের আদেশ পালনে পাপ নেই"—পিশাচের মত হলেও কর্তব্য পরায়ণ মুক্তিয়ার। কিন্তু প্রভুর আদেশে এসব করতে হচ্ছে বলে মুক্তিয়ার মার্জনা চেয়েছে বসন্তরায়ের নিকটে। বৃদ্ধ উদয়কে একবার দেখতে চাই বললে, আদেশ নেই বলে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেছে। — "(মাটি ছুঁইয়া সেলাম করিয়া জোড় হস্তে) মহারাজ আমাকে মার্জ্জনা করবেন—আমি প্রভুর আদেশ পালন করছি মাত্র। আমার কোনো দোষ নেই।"হোসেন যেমন প্রভুভক্ত, মুক্তিয়ারও তেমনি কর্তব্য সচেতন। বসন্তরায়ও "মিঞা" বা "খাঁসাহেব"দের যথার্থ সম্মান দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ মুসলমান সমাজের উঁচু নিচু সবার সঙ্গেই মিশেছেন। তাঁর নাটকে মুসলমান শুধু নয় হিন্দু-মুসলমান নয়—মানুষই বড় হয়ে উঠেছে। ঈশা খাঁ শুধু সম্মানীয় নন, ধর্মীয় অনুশাসনে ও কর্তব্যবোধেও উজ্জ্বল। কর্তব্য, সাহস বেইমানী না করা প্রভৃতিতে চরিত্রগুলো যথার্থ মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেছে। ক্ষীরোদ প্রসাদের নাটকে অন্যান্যদের প্রভাব পড়েছে, এসেছে যুগ প্রভাব। কিন্তু আলোচিত নাটক গুলোতে সার্বিকভাবে মুসলমান সম্মানীয় হয়ে উঠেছে। 'বঙ্গেরাঠোর'-এ মুসলমান সমাজতো বটেই হিন্দু রক্ষণশীলতার বাঁধন ছিড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে ঐশ্লামিক অনুশাসনকেও স্থান দিয়েছেন। মুসলমান ক্রীতদাসের জীবনচিত্র ও উঠে এসেছে মুসলমান সমাজের। বাংলার মুসলমান সমাজের শ্রেণী বিভাজনও স্থান পেয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালে ইতিহাসের সঙ্গে সৃষ্টি শীল কল্পনার মিশ্রণে সার্থক মুসলমান সমাজ ফুটে উঠেছে। দুর্গাদাসে মুসলমানকে দুর্বল মনে হলেও—সার্বিক ভাবে তাঁর নাটকে মুসলমান শ্রদ্ধেয়। বিধর্মী মহব্বতের কর্তব্য, বীরত্ব, নূরজাহানের মনস্তত্ত্বে, ঔরঙ্গজীবের ধর্মনিষ্ঠাতে যথার্থ রূপ পেয়েছে। মুসলমান নারী ইসলাম অনুসারী সম্মানিত দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে। পরবর্তী অধ্যায়ে গতানুগতিক ধারায় বিশেষ যুগ-কল্লোলের পরিচয় মিলবে; ব্যক্তি ও শ্রেণী মুসলমান বহুল-বিচিত্র ভাবে স্থান পেয়েছে বাংলা নাটকে।

পঞ্চম অধ্যায়

১৯২৩-৫০খ্রীষ্টাব্দে বাংলা নাটকে মুসলমান সমাজ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ঘটে গেছে ১৯১৪ থেকে ১৯১৮-র মধ্যে এবং তার প্রভাব আমাদের দেশে ক্রমশঃ অনুভূত হচ্ছে। সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতিতে সংকট শুরু হয়েছে। পুরানো মূল্যবোধ বিপর্যয়ের মুখে, সংশয়, হতাশা দানা বাঁধছে মনে। জাতীয় আন্দোলন ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছোচ্ছে। ১৯২১-২২ সালের আন্দোলনে গান্ধীজীর পরাজয়, খিলাফতের সঙ্গে ঐক্যচেষ্টা ব্যর্থ, জাতীয়তাবাদ প্রবেশ করতে শুরু করেছে; বিশেষতঃ বাঙলায় ধীরে ধীরে সোসালিষ্ট ধারা আসছে। ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থনীতিতে একটা জোর শিল্প-শ্রেণী দেখা দিয়েছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটছে বারবার (১৯২২-২৭)[১]। এসময় নতুন প্রশ্নের জাগরণে নতুন মুল্যবোধ দেখা দিল সাহিত্যে। 'কল্লোল', 'কালিকলম', 'প্রগতি' প্রভৃতি পত্রিকা রবীন্দ্রীয় শিল্পী দর্শন থেকে সরে এসে মহাযুদ্ধের পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শে আধুনিকতার পতনে উন্মুখ।[২] ১৯২৩ থেকেই নতুন ধারার নাট্য-রচনার সূচনা, 'নবনাট্যের উঁকিঝুকি', নাট্যকার অভিনেতা নতুনত্ব আনয়ণে প্রয়াসী। এসময়েই গোর্কির 'মা'-ব অনুবাদ, 'পথের দাবী' প্রকাশিত হয়।'' 'কল্লোল' গোষ্ঠীর রচনার লক্ষ্য সাধারণ মানুষ হলেও, তা দর্শন বিহীন। 'টেরো কমিউনিজম' -এর দর্শনের মতই নজরুলের আবির্ভাব, হুগলীর নেতাদের সঙ্গে মজফ্‌ফর আহম্মদ যুক্ত — এ সময় নাটকে মুসলিম চরিত্র আনা সম্ভব ছিল না, অনুশীলন সমিতি মুসলমান সহ্য করত না।''[৩] হিট্ নাটক 'গৈরিক পতাকা'-র আবির্ভাব কিছুদিন পরেই। এখানে মুসলমান আছে—ঐক্য প্রচেষ্টাই নাটকে প্রধান স্থান নিয়েছে। অধ্যাপক শিশির কুমার ভাদুড়ী সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয় হয়েও পেশাদারী নাট্যক্ষেত্রে যোগ দিয়ে 'রঙ্গমঞ্চকে সামাজিক পাতিত্য হইতে উদ্ধার'[৪] করার চেষ্টায় নেমেছেন (১৯২১)। 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর সঙ্গে যুক্ত তরুণ সমাজ সংগীত, চিত্রকলা, নাট্যাভিনয় প্রভৃতি বিষয় তাদের জোরালো মত ব্যক্ত করে চলেছেন, ''নাট্যাভিনয় ও মুসলমান ''সমাজ'' প্রবন্ধে আবদুল সালাম খাঁ নাটকের দৃশ্যরূপের উপর গুরুত্ব ও সাধারণ মানুষের চেতনার মাধ্যমে সমাজের উন্নতির পক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি প্রয়োগ করেছেন।[৫]

১। রমেশচন্দ্র মজুমদাব — বাংলাদেশের ইতিহাস (৪র্থ খন্ড) তে বলেছেন — সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯২২-২৭ মধ্যে ১১২ টি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাতে ৪৫০ জন মৃত, আহত ৫০০০ জন। ১৯২৭-এ ৩১ টি দাঙ্গা হয়।

২। দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায় — 'নাট্যতত্ত্ব বিচার'।

৩। সাক্ষাৎকারে — সুধী প্রধান —৬.১১ ১৯৮৯।

৪। প্রাগুক্ত পাদটিকা —'১'।

৫। 'শিখা পত্রিকা— ১৩৩৩।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই দ্বিতীয় পর্বে নাট্য আন্দোলন শুরু। এ আন্দোলনে শক্তি সঞ্চার করেছে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের আদর্শ ও তার সঙ্গে নাট্যকর্মে বিশ্বাসী অন্যান্য সহযোগী গোষ্ঠীর কর্ম প্রয়াস। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই নাট্যশালার অবক্ষয়, অবসন্নতা, পৌনপুনিকতা, অর্থনীতির বিরাট ভাঙনে পুরনো মূল্যবোধের ধাক্কা। নতুন মূল্যবোধের অন্বেষণে পীড়িত, দুর্গত মানুষের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যবসায়িক থিয়েটারের উপেক্ষা প্রভৃতির সন্ধিক্ষণে নতুন মূল্যবোধে গণনাট্য সংঘের জন্ম। (গণনাট্য সংঘের নামে প্রথম প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ১৯৪১ - এপ্রিল, বাঙ্গালোরে, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা ১৯৪৩ - ২৫শে মে)[৬]। বিটিশের শাসন ও শোষণে ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন ভারতীয় শিল্পের ধ্বংস সাধনেই নয়, শাসক গোষ্ঠী দেশীয়দের পরিবর্তে উচ্চপদে ইংরেজদের নিয়োগ, বেনিয়ান, মুৎসুদ্ধি, ইংরেজী শিক্ষিত কেরাণীর সৃষ্টি হলে গ্রামের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষীণ হতে শুরু করে। ১৯৪৩ -এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়, কলকাতায় হত্যাকাণ্ড, 'নোয়াখালিতে হিন্দু মেধ যজ্ঞ' প্রভৃতির ফল ছেচল্লিশের দাঙ্গা। ইতিপূর্বে ১৯৪০ খ্রীষ্টব্দে লীগের পাকিস্থান প্রস্তাব, মেদিনীপুরে সাইক্লোন ও ভয়াবহ বন্যা, ভারত ছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২), বোম্বাইয়ে নৌবিদ্রোহ, নেতাজীর দিল্লী দখলের ব্যর্থ চেষ্টা, পরে বঙ্গ বিভাগ, পাকিস্থান সৃষ্টি, ভারতের অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়ে ব্রিটিশের স্বাধীনতা দেবার নামে ক্ষমতার হস্তান্তর সাধন ইত্যাদিতে জনমানস বিধ্বস্ত। দেশের চরম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের সমকালীন মর্মদন্তুদ বাস্তবের গ্লানি ও নিষ্ঠুরতার রূপ এসে ধাক্কা দেয় বাংলার নাট্যশিল্পকে। ১৯২৩-৫০ এই সাতাশ বছরে ঘটে পাওয়া বহুবিধ ঘটনায় নতুন ধারায় নাট্য রচনা যেমন হয়েছে, তেমনি পুরনো গতানুগতিক ধারায় নাটক রচনাও বজায় ছিল। আলোচ্য সময়ের অভিনয়ের ইতিহাসে দেখা যাবে পেশাদারী মঞ্চে সমকালীন বাস্তব ও গ্লানির সঙ্গে নাট্যাভিনয়ের কোন সম্পর্কে ছিল না। পুরনো ও নতুন ধারার নাটকেই মুসলমান সমাজ চিত্র রয়েছে। নাট্যকার মোট আটজন, মোট নাটকের সংখ্যা ২০টি।

১। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাটকে মুসলমান সমাজ ঃ

ক) 'অযোধ্যার বেগম' (১ম অভিনয়-স্টার ১৩২৮) ঃ নট-নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক নাটক "অযোধ্যার বেগম"। সমকালের দর্শকপ্রিয় নাটকটি বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব মীরকাশিমের নবাবীর শেষ পর্বের কাহিনী আশ্রিত। যুদ্ধে পরাজিত মীর কাশিম আত্মগোপন কালে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লার আতিথ্য গ্রহণে নাটক শুরু; মীরকাশিমের দুরবস্থা বর্ণন, পরে মিলনান্তক ঘটনায় অযোধ্যার বেগমের দেশপ্রীতি ও মাহাত্ম্যের বর্ণনায় নাটকের

৬। সুধী প্রধান — 'নবান্ন': প্রযোজনা ও প্রভাব ঃ— ১৯৮৯।

সমাপ্তি। পাঁচ অঙ্কের এই নাটকের নারী পুরুষ ২৮ জন প্রায় সকলেই মুসলমান। তাদের সংলাপ, আচরণে ফুটে উঠেছে মুসলমান সমাজ পরিচয়। মীরকাশিম, ফয়যুল্লা, অযোধ্যার বেগম, গফুর প্রমুখরা মহৎ ধর্ম পরায়ণ মুসলমান রূপে অঙ্কিত। নাট্যকার যুগ মানসিকতায় হিন্দু মুসলমান মৈত্রীকেই শুধু তুলে ধরেননি, ইসলামের সমপ্রাণতা, ইমানদারী, উচ্চ-নিম্নবিত্ত মুসলমানকে সমমর্যাদা দিয়েছেন, প্রয়োজনে স্বার্থপর হিন্দু চরিত্রাঙ্কনেও দ্বিধা করেন নি।

অযোধ্যার নবাব সুজাউদৌল্লা মুসলমান কিন্তু নারীলোভী, শয়তান "পাঁচশো বেগম" তার, বেগম ও সন্তানদের বাঁচাতে দেশ জয় করতে চায়। সেজন্য আশ্রিত মীরকাশিমের সঙ্গে ইসলামের আতিথ্যের মর্যাদা ভুলে বেইমানী করতেও বাধে না। অতি লোভী, অর্ধামিক সুজা-র মৃত্যু ঘটে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ। অন্যদিকে সুজাউদ্দৌল্লারই কর্মচারী বৃদ্ধ হাফেজ সুজার হুমকিতেও ভয় না পেয়ে যথার্থ মুসলমানের ধর্ম রাখতে যুদ্ধ ক্ষেত্রেই "শেষ নামাজ"- এর শপথ নেয়, কেননা তারা জানে "সব হারালে আবার পাওয়া যায়। কিন্তু ইমান .... আর ফেরে না"। তার মত ফয়যুল্লাও জানে "আমরা ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধ করছি, ইমানের জন্য যুদ্ধ করছি, খোদা কি আমাদের সহায় হবেন না?" কেননা পয়গম্বর বলেছেন "সর্বস্বের বিনিময়ে নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেবে", মীরকাশিমকে আশ্রয় দিয়ে সেই আদেশই তারা পালন করেছে। অযোধ্যার নবাব বেইমানী করতে চাইলেও বেগম তাদের যুগিয়েছে প্রেরণা। তবে তাদের পরাজয় কেন হবে? বিবেচক হাফেজ বলেছে "কোরান সরিফে লেখে আল্লার মর্জ্জী বোঝা মানুষের সাধ্য নয়"। এখানে স্পষ্টই দুই প্রকৃত মুসলমানের মুখে ইসলামী অনুশাসনও বাস্তব চিন্তা। ফয়যুল্লা শুধু ধার্মিক মুসমলান নয়, জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ,- "এদেশের দরিদ্র যারা, দুর্ব্বল যারা, তারা আমার ভাই। .... লাঞ্ছিতা নারী, সে হিন্দুহ'ক — মুসলমান হ'ক আমার ভগ্নী"। তার নেতৃত্বেই তাই বেরার গরীব হিন্দু - মুসলমান কৃষক অত্যাচারী দেওয়ানের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেওয়ানের মালখানা দখল করে, "আল্লা আল্লাহো " ধ্বনির মাধ্যমে ধৃত ফয়যুল্লাকে আসফ গুলি করতে গেলে বউবেগম বুকে পেতে বাধাদেয়, মুক্ত হয় ফয়যুল্লা, অথচ মুর্ত্তজা ও হায়দারবেগ "কোরান স্পর্শ করেও" আশ্রিতের রক্ষা যুদ্ধে কোন পক্ষ নেবে বুঝতে পারেনা। কিন্তু বউবেগম ফয়যুল্লাকে বাঁচাতে গুলির সামনে বুক পাতলে হায়দার পরিস্থিতির বিচারে — 'মা'! আপনি অসূর্যম্পশ্যাদেবী, ... বেগমের আব্রু নষ্ট করবেন না"— অনুরোধ করতে ভোলে না।

আর নবাব মীরকাশিম সৎ, স্বাধীন চেতা শুধু নয়, যথার্থ মুসলমান, মানব প্রেমিক। বৃক্ষতলে পথশ্রান্ত মীরকাশিম স্ত্রী পুত্রদের নিয়ে দুরবস্থায় রয়েছে, বান্দা গফুর প্রভুভক্তিতে তাদের রক্ষা করেছে সর্বস্ব দিয়ে; নবাব তাকে যথার্থ শ্রদ্ধা জানাতে

ভোলেন নি — "আমরা মানুষ .... আর গফুর! এই মানুষের মধ্যে দেবতা তুমি! প্রভুভক্ত ভৃত্য — সেই মানের মধ্যে ইমানদার"। আর রোহিলার মাথার মণি " হাফেজ রহমত পাঠানের গৌরব, বীরত্বের আধার, মমতার আধার, আত্মসম্মানের অভ্রভেদী চূড়া। আর তারই উপযুক্ত পৌত্র বীর ফয়যুল্লা কি মহান — কি উচ্চ — কি হৃদয়বান। কিছু দেখলে না — শুধু দেখলে মুসলমানের ধর্ম্ম আর তার ইনাম"। হাফেজ, ফয়যুল্লা শুধু নয়, মীরকাশিমের এ সংলাপে তারও চারিত্রিক মহত্ত্ব প্রস্ফুটিত, কেননা মহান হৃদয় না হলে এ উক্তি পাষণ্ডের মুখে শোভনীয় নয়। মীরকাশিম শত দুঃখে পড়েও যথার্থ মুসলমানের মতই "খোদা"কেই ভরসা করে। অযোধ্যার বেগম স্বামীর দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাইতে এলে মীরকাশিমের সংলাপে নাটকের মিলনান্তক সমাপ্তি যেমন ইঙ্গিত, তেমনি তার মহানুভবতার পরিচয় — "তুমি মানবী নও দেবী। তুমি ফয়যুল্লা আমার আশ্রয়দাতা দেবপুত্র। .... তুমি গফুর সেবাপরায়ণ ভৃত্য নও — কাশেম আলির পিতা" — বলে মারা গেছেন।

মুসলমান নির্যাতিতা ছায়ার মুখে নবাব সুজাউদৌল্লার পরিচয়— "নবাবের অনেক বেগম — কেউ গাছতলায়, কেউ অট্টালিকায়। .... প্রাণ নিয়ে খেলা — জাত নিয়ে খেলা", আর নবাব সৈন্যেরা "আওরাৎ মানে না, ছেলে মানে না, বুড়ো মানে না, মেয়েমানুষ নিয়ে খেলা করে", শুধু তাই নয় বন্দিনী নারী জিন্নৎকে বাঁচাতে তার পোষাকে পরে সুজার ছুরিকায় ভুলে জিন্নৎ নিহত হয়েছে। আর অযোধ্যাব বেগম মহীয়সী নারী, স্বামীর অপকর্মের জন্য ব্যথিতা, স্বামী ব্যভিচারী, বিলাসী, হৃদয় বলতে তার মধ্যে কিছু নেই "ধর্ম্ম — মুসলমান অনেকদিন ভুলেছে।" বেগম পারিষদদের সৎ-সাহসী হয়ে স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হাফেজ, ফয়যুল্লাকে উদ্বুদ্ধ করে দেওয়ায় আলি 'রমণীকে' বাঁচতে নির্দেশ দেয়। ফয়জাবাদের খোর্দ্দ মহলে সুজার বেগমরা ক্ষুধার জ্বালায় বিদ্রোহিনী, খোজা নায়েব "পাঁচশো বেগম"কে বাঁচাতে চিন্তার ভারে কুঁজো; বেগমদের ভাষায়— "আমরা তো বেগম নই, বাঁদী— নবাবের আসবাব" — নবাবের কাছে নারীর মর্যাদার প্রকাশ। কিন্তু বউবেগম এসে তাদের রক্ষা করছে। বেগম "খোদার আশীর্ব্বাদে শান্তি"কে ফিরে পেতে "মক্কায়" যেতে প্রস্তুত হয়েছে। মীরকাশিমের কাছে স্বামীর কৃত কর্মের জন্য মার্জ্জনা চাইতে গিয়ে মীরকাশিমের মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে কাশিমের মৃত্যুর পর তার পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণের শপথ নিয়েছে। তাঁর কাছে ধর্মবোধ, তীর্থস্থান অপেক্ষা কর্তব্যবোধ ও জাতীয়তাবোধই বড় হয়েছে— "আর মক্কায় নয়, ...আজ থেকে এই ভারতভূমি আমার পবিত্র তীর্থ .... আমার নিত্য সেবার বস্তু হবে .... গুলনেয়ার (কাশিমের স্ত্রী), ... ফয়যুল্লা, তোমার মহত্তের পুরস্কার জিন্নৎ! দোয়াব আলি, আর প্রাসাদে নয়, ... এই নিজ বাসভূমিতে কুটীর নির্ম্মাণ কর .... যতদিন বাঁচবো এই গুলনেয়ারের

পাশে ব'সে নীরব অশ্রু ধারায় স্বামীর কৃত কর্মের প্রায়শ্চিত্ত করবো — দেখি তাতে যদি পরলোকে শান্তি পান। এই আমার ব্রত, এই আমার ধর্ম্ম।"

এছাড়া ৫/২ - এ "মোল্লাগণের সাক্ষরিত একরারনামা র" জোরে রাজ্যের অর্থ অধিকারে মোল্লা নির্ভরতার চিত্র। ৪/২ - এ হিন্দুরা স্বার্থের খাতিরে মুসলমানের দাড়ি পরে, দেওয়ান দাড়ি পরে বাড়িতে ঢুকলে দাই "মোছলমানের" রূপ বর্ণনা করেছে — "এই এত বড় দাড়ি, প্যাঁজ রসুনের খোসবো ছড়াতে ছড়াতে আসছে"। গিন্নীর চোখে এই 'মোছলমান', 'মামদো' অর্থাৎ মুসলমান ভূত। তাই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে মাথায় জল ঢালে। সেওয়াল সে পোষাকে 'রাজার জাত' বলে তুলে রাখে। এখানে হিন্দুকে স্বার্থসিদ্ধির নামে কাজ হাসিল করতে ছোট করা হয়েছে। আবার মুসলমান সমাজ তথা সমকালীন মানসিকতা প্রকাশিত হয়েছে।

খ) 'ইরানের রাণী' (১৯৩০ আর্ট থিয়েটার ১ম অভিনয়) : অপরেশচন্দ্রের অপর নাটক **'ইরানের রাণী'**তে মুসলমান সমাজের পরিচয় রয়েছে। ইরানের অধিপতি দাউদ শাহ্ দারার পিতা বাদশা জাফর শা'র হত্যাকারী। জাফরের অনুচর নাদেরের পরামর্শে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে ইরান অধিপতির চাকরী নিয়েছে দারা। দাউদের পত্নী দারার প্রেমে পড়ে স্বামীকে খুন করে, দারা এই খুনী নারীকে পিশাচী বলে প্রত্যাখ্যান করে। নারীর ক্রোধে দারা বাদশার খুনী হয়ে কারাগারে যায়। শেষে রানী বিবেকের দংশনে দারাকে মুক্ত করতে গিয়েও প্রত্যাখ্যাতা হয়। রানীর আত্মহত্যা ও চিঠির স্বীকারোক্তিতে দারা মুক্ত হয়। কাজীদের পরামর্শে দারা প্রেমিকা গুলরুখের হাত ধরে খোরাসনের সিংহাসনে বসে। তিন অংকের এই কাহিনীর বিভিন্ন দৃশ্যে মুসলমান সমাজ চিত্র রয়েছে।

দাউদ শা নিষ্ঠুর, পরাক্রমশালী, স্বেচ্ছাচারী প্রভুকে খুন করে রাজা হয়েছে। তার দৃষ্টিতে "পুরোহিতের মন্ত্র ও দাড়ি দুই - ই লম্বা .... একটু ছোট হওয়া আবশ্যক"। অত্যাচারী বিদ্রোহী প্রজাদের বিরুদ্ধে জাফরের স্বৈরাজারী হুঙ্কার, সেইসঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের চিত্র প্রকাশিত — "গরীব চাষা রাস্তার মুটে" প্রজারা। আর প্রজাদের বক্তব্য "মানুষ সব এক। একজন একজনের কাছে মাথা নোয়াবে কেন?" কিন্তু বাদশা তা না শুনে 'চাবকানো'র হুকুম জারী করলে রানী বাধা দেয়। উত্তরে ক্রুদ্ধ বাদশার সংলাপে অনৈশ্লামিক নারীর সম্মান ও তার অত্যাচারী চরিত্র স্পষ্ট। স্বাধীনতার প্রশ্ন তুললে এই রাণীদেহও দ্বিতীয়া রাণীর মত "গৃধিনীতে আহার" করবে। তৃতীয় পত্নীর কথায় মুসলমানের একাধিক স্ত্রী গ্রহণ রীতি প্রকাশিত। প্রাক্তন বাদশা জাফরের পুত্র দারা ইরান অধিপতির পার্শ্বচর হয়েও শেষে রাণীর গুপ্তহত্যা ও প্রেমের ফাঁদে কারাবাসে যায়। শেষে রাণীর-ই স্বীকারোক্তি তে সিংহাসনে বসে। খুনী রাণীকে দারা জানাতে ভোলেননি যে — ঘুমন্ত স্বামীকে খুন করে নারীত্ব, প্রেম ধ্বংস

করেছে। আত্মহত্যা করার 'অধিকার কারও নেই' জানিয়েছে। রাণী কারাগারে গিয়েছে 'বোরকা' পরে। বাদশার হত্যার খবরে নাগরিকদের কথাবার্তায় মুসলমানী প্রথা ব্যক্ত — বাদশার রক্ত "আলকাতরার মত কালো; অমন অত্যাচারীর রক্ত কি লাল হয় রে—মুখ্যু! ...... যাদের শরীরে কালো রক্ত .... তারাই হয় দুষ্টু - বদমাইস" (৩/১) । বিচারের কথায় মুসলমানের বিচার রীতি — "বড় বড় কাজীরা দাড়ি নাড়বে" — বিচার করবে কিন্তু "পর্দ্দানসীন" স্ত্রীলোক ইরানের সিংহাসনে বসবে কেন? কেননা এদেশের নিয়ম 'বোরকা' পরা পর্দ্দানসীন নারী সিংহাসনে বসতে পারে, ইসলামে ও সে বিধান আছে।

অপরেশ চন্দ্রের নাটক দুটিতে দেখা যায়, ইতিহাসের পটে কাহিনী গঠিত হলেও মুসলমান মাত্রই অসম্মানীয় নয়। নাটকে মানবতা ও প্রেমই বড়। পাশাপাশি সমকালীন সমাজচিত্র, বোরকা, পর্দ্দা, কাজীর বিচার ক্ষমতা ইত্যাদি চিত্রের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিচয় নেই।

২। সুধীন্দ্রনাথ লাহা : 'মারাঠা মোগল' (১৯০৪)

সুধীন্দ্রনাথের 'মারাঠা মোগল' মোগল সম্রাটের ঔরংজেব ও ছত্রপতির পৌত্র সাহুকে ঘিরে রচিত। নাটকে ঔরংজেবের, সেনাপতি জুলফিকার খাঁ, দাউদ খাঁ ও সৈন্যাধ্যক্ষ রোস্তম খাঁ, সেনাপতি আলিমর্দ্দনকে ঘিরে মুসলমান সমাজ চিত্র এসেছে। শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীকে হত্যা করিয়ে শম্ভুজীর স্ত্রী ও পুত্র সাহুকে বন্দী করে রাখেন ঔরংজেব। কিন্তু ধর্মপরায়ণ মোগল বাদশাহ নিষ্ঠুর বলে পরিচিত হলেও দীর্ঘ ১৭ বছর সাহুকে পুত্র স্নেহে পালন করেন। মাতা পুত্র দীর্ঘদিন হিন্দুর মতই বাস করেছে। ঔরংজেব মুসলমান করতে চাইলেও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা সম্রাট কন্যা (জিন্নত উন্নিসার) নাটকে হায়তোননেসার চেষ্টায় সাহু হিন্দুই থেকে যায়। মৃত্যুর এক বছর পূর্বে ঔরংজেব মাতা-পুত্রকে মুক্তি দেন; অনুরোধ করেন বাদশাহ বংশের কেউ বিপদে পড়লে যেন সাহায্য করে সাহু।[৭] নাটকে এই ঘটনা ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণে দেখান হয়েছে।

ঔরংজেব খেলার ছলে সাহুকে 'নেমাজ' শেখাতে চাই। তাকে ইসলাম করে দাক্ষিণাত্যের রাজা করতে ইচ্ছুক। কিন্তু ছদ্মবেশী মৌলবীর কাছে সাহু পিতৃহন্তাকে চিনেছে। মৌলবী সাহুর গৃহশিক্ষক হয়ে "টুপিটা, দাড়িটা আর এই পায়জামাটা" পরিয়ে মোগল শিবির থেকে উদ্ধার করতে চাই। সম্রাট সব জেনে সাহুকে অনুরোধ করেন -"আমার এত স্নেহের বিনিময়ে শুধু একটি ভিক্ষা আমার! এরাজ্যে ইসলামের প্রতিষ্ঠাকর।" মারাঠা মোগল বিরোধ বাধলে সাহুকে চাবুক মারার নির্দেশ দিলে হায়তন তাকে জড়িয়ে ধরে রক্ষা করে। নাটকে ঔরংজেব স্নেহের কাছে পরাজিত।

৭। ড. সৌরেন্দ্র চন্দ্র নন্দী — 'বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের সমালোচনা' — ১৯৮১।

তাই তাকে মারাঠার সিংহাসনে বসিয়েছেন অবশেষে — ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। এ নাটকে ঔরংজেব এবং অন্যান্য মুসলমান সুন্দর রূপে চিত্রিত, বিশেষতঃ হায়তননেসা। এছাড়া নৃত্য, গীত, বোরখা, নমাজ ইত্যাদির কথাও এসেছে— যা একান্তই মুসলমান সমাজের।

৩। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাটক ঃ মুসলমান সমাজ ঃ

ক) 'গৈরিক পতাকা'(১৯৩৭) ঃ নাট্যকার শচীন্দ্র সেনগুপ্ত নতুন দৃষ্টিকোনে নাট্য রচনায় প্রয়াসী হয়ে লেখেন 'গৈরিক পতাকা'। কল্লোলের প্রতিষ্ঠা, মুসলীম লীগের ক্রমশঃ শক্তি বৃদ্ধি, দেশের চরম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সংকটকালে মর্মন্তুদ বাস্তবের গ্লানি ও নিষ্ঠুরতার সঙ্গে পেশাদারী মঞ্চে অভিনীত নাটকের কোন সম্পর্ক ছিলনা। মৌলানা আজাদ লিখেছেন•কংগ্রেসের ভুলে লীগ জন্মেছে। শুধু তাই নয় কংগ্রেস নেতৃত্বের "Short and Swift straggle" এর ধারণায় সাহিত্যিক নাট্যকার, শিল্পীদের সৃষ্টিশীল চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন।[৮] এসময়ই নতুন দৃষ্টিতে লেখা হয়েছে 'গৈরিক পতাকা'। নাটকটি সুভাষচন্দ্রকে উৎসর্গ করা হয়। এনাটকে মুসলমান রয়েছে এবং হিন্দু- মুসলমান ঐক্য চেষ্টা শিবাজীর জাতিগঠন ও স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞার মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়েছে। 'টপ সিক্রেট' এই নাটকটিকে যেভাবে পরিণতির দিকে নাট্যকার নিয়ে গিয়েছেন— সেখানে ছত্রপতি মুসলমানের বিরুদ্ধে নয়, যেকোন পরাধীন শাসকের বিরুদ্ধে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র লিখে গেছেন — 'বাংলা স্টেজ হিন্দু মুসলমান ইউনিটি প্রচার করেছে'।

পাঁচটি অঙ্কে মুঘল তথা ঔরংজেবের সঙ্গে শিবাজী তথা মারাঠাদের সঙ্গে বিরোধ নিয়ে কাহিনী গঠিত। শিবাজী হিন্দুর আদর্শ প্রজাপালক রাজা। তাঁর কাছে গরীব ধনী সবাই সমান —" রাজত্বের চেয়ে মানুষ বড়"। তাই চাষা, গরীব, মাওলা, প্রজাদের অস্পৃশ্য না করে আশ্রয় দেন। বিজাপুরের মুসলমান প্রজাদেরও আশ্রয় দেন। কারণ "মুসলমান রাজশক্তির" বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম হলেও "দরিদ্র মুসলমান প্রজারা ত উৎপীড়ন করেনা।" তাই তাঁর প্রজারা "জাতিধর্মনির্বিশেষে" সকল অধিকার ভোগ করতে পারে — ধর্ম্ম নয়, মনুষত্বই বড়। আবার বিশ্বনাথ মুলানা মহম্মদের পুত্রবধূ মেহেরকে শিবিকায় তুলে নিয়ে আসলে লজ্জিত শিবাজী সিংহাসন ত্যাগে উদ্যত। কঠোর শাস্তি দিয়েই থেমে থাকতে পারেননি। যখন শুনেছেন মুলানার মুখে-"লম্পট এই বিশ্বনাথ, আমার পুত্রবধূকে অসূর্যম্পর্শা মুসলমান কূলবধূকে নিয়ে এসেছে তোমার পাশবিকতার অনলে আহুতি দিতে।" তখন শিবাজী— "(মেহেরের কাছে গিয়ে) যদি এসেছ মা, তাহলে অন্তঃপুরে চল। তোমার মর্যাদা রক্ষা আমাদের ধর্ম্ম।" এরপর ক্ষমা চেয়ে মুলানা ও মেহেরকে অতিথির সম্মান দিয়ে, তারা মুক্তঘোষণা করেছেন।

৮। প্রাগুক্ত পাদটীকা —'৩'।

মোগল ওমরাহ আদিল শাহ নিষ্ঠুর অত্যাচারী। কিন্তু রণদুল্লা খাঁ অন্য শাস্তি দিতে অনুরোধ করে— কারণ "বিজাপুরের ওপর খোদার অভিশাপ টেনে আনবেন না"। মুলানা মহম্মদ কর্তব্যপরায়ণ সাহসী, গর্বিত মুসলমান। "কাফেরের কাছে করুণা প্রত্যাশা করিনা। যুদ্ধে পরাজিত হয়েছি .... পীড়ন আমার প্রাপ্য। কিন্তু আমার পুত্রবধূ .... স্বামীহীনা ওর মর্যাদা রক্ষার শাক্তি থেকে আমাকে বঞ্চিত কোরো না খোঁদা"। এই আবেদনে মেহের সগর্বে বলেছে, বাবা আমি অসহায় নই। মুসলমান কুলবধূ জানে তার শক্তি কোথায়! ইত্যাদিতে উভয়ের চরিত্র স্পষ্ট। চিরসত্য বাক্য চন্দ্ররাও উচ্চারণ করেছে— "অন্যায় কেবল মুসলমানই করেনা সূর্য্যরাও। মুসলমান যে দেশে নেই , সে দেশেও শক্তিমান দুর্বলের ওপর অত্যাচার করতে কসুর করেনা।" শায়েস্তা খাঁর শিবিরে পারিষদরা নাচ- গানের অনুমতি চাইলে তা ধর্মবিরুদ্ধ কাজ।" কিন্তু যুদ্ধের জন্য দেহমনে পটুত্ব প্রয়োজন, কিন্তু "সরাব টরাব এনো না যেন" — বলেছেন। শেষে সুরা-নারী সবই এসেছে, "হুরী পরীদের জলসা" সবাইকে মাতাল করেছে। এসময় শিবাজীর আক্রমণে শায়েস্তা খাঁ পলায়নে বাধ্য হয়েছে। দিলীর ও ঔরংজেবের কথপোকথনে নিষ্ঠাবান দিলীর হিন্দু সভ্যতা ও জাতি প্রসংসা করলে, ঔরংজেব — "আর মুসলমান দিলীর? জাতি হিসাবে খুবই ছোট? সভ্যতা তাদের কখনো ছিল না, এখনও নেই- কেমন?" ইত্যাদিতে স্বজাতিকেই বড় করা হয়েছে। সম্রাট বলেছেন হিন্দুর মনে একট ক্ষোভ রয়েছে, দিলীর। তাদের বিশ্বাস যে, সব থাকতেও তারা শুধু মুসলমানের চক্রান্তেই সব হারিয়েছে।" আবার মুসলমান পোলাদ খাঁ ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান রূপেই চিত্রিত। শিবাজী পালাবার জন্য অসুখের ভান করলে তার উক্তি-"খোদা রাজাকে আজ নিরাপদেই রাখবেন। নইলে মুঘলের নামে কলঙ্ক রটবে। সম্রাট বড় চিন্তিত হয়ে পড়েছেন।" হিন্দু ধর্মের অঙ্গ ফল পাঠানো— এই মিথ্যাকে সত্য ভেবে পোলাদ জানিয়েছে— "বেশ আপনাদের ধর্মের উপর মোঘল হস্তক্ষেপ করতে চায়না," ইত্যাদিতে পোলাদ খাঁর কর্তব্যপরায়ণ বোধসম্পন্ন মুসলমানের পরিচয় পাই।

খ) 'আবুল হাসান' (১৯৩৫) : নাটকের ভূমিকা সূত্রেই- গোলকুণ্ডার শেষ স্বাধীন সুলতান আবুল হাসানের জীবন নিয়ে নাটকটি রচিত। ইতিহাসের মাতাল হলেও নাট্যকার তাঁর পৌরুষের আশ্রয়ে দার্শনিক মনোভাব এনে নাট্যকার আবুলহাসান চরিত্র গড়েছেন। এই নাট্যে ১৮টির বেশি পুরুষ ও ৬টির বেশী নারী চরিত্র মুসলমান। কয়েকটি হিন্দু চরিত্র থাকলেও তাদের মুখে হিন্দু সমাজ নয়, মুসলমান সুলতান আবুলহাসানের মহত্বই প্রকাশ পেয়েছে। আবুল মদ্যপায়ী, কিন্তু নিষ্ঠুর নয়; তার মধ্যে সাধারণ মানুষের অবস্থা থেকে সুলতান হয়েও 'আল্লার মর্জির' প্রতি নিষ্ঠা, সাধারণ প্রজাকুলের প্রতি মহত্ব বোধ তাকে উজ্জ্বল করে। সর্বোপরি আবুলহাসান প্রেমিক— প্রেয়সীর ও মানুষের।

নাটকে দেখা যায়, গোলকোণ্ডার সুলতান সৈয়দ আবদাল্লার ওমরাওরা যুবক কুতবশাহী আবুলহাসানকে তাড়িয়ে দিলে দীন-দরিদ্র হয়ে গুরু ফকীর সাহেবের গৃহে দিনতি়পাত করে, তার কন্যা মমতাজকে ভালবাসে সহজ সরল-শান্ত যুবক। কিন্তু সুলতান মুসাখাঁ প্রমুখদের পাঠায় তাকে ফিরিয়ে আনতে প্রাসাদে। গুরুর নির্দেশে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবুলহাসান প্রাসাদে গিয়ে সুলতানের জামাতা হয়, বড় জামাতা সৈয়দ আহম্মদ ও কন্যা মা-সাহেব সিংহাসনের দাবীদার হয়েও পার্ষদ ও 'আল্লার মর্জিতে' আবুলহাসান সুলতান হয়। ঘোষণা করে (গুরুর ইচ্ছানুসারে) ''পথ প্রাসাদ আমি এক করে ফেলব।'' (১/৬), প্রজাদের সঙ্গে মেশে নির্বিকারে। মুসলমান হ'য়েও ওমরাও প্রজাদের সঙ্গে আনন্দে সুরার নেশায় মত্ত হয়। কিন্তু ভুলতে পারে না প্রনয়ী মমতাজকে, শান্তির ব্যাঘাত ঘটে স্বপ্নেও। এদিকে মোগল সম্রাট ঔরংজেব গোলকুণ্ডা দখল করতে চাই ইসলামের প্রসার কামনাতেই ''মুসলমানের অনুচিত আচরণ'' (৪/১) বন্ধ করতে। যদিও সাম্য বোধ মুসলমানের অনুচিত আচরণ তো নয়ই, বরং আর্দশ, তবে সুরাপান নিঃসন্দেহে অনৈশ্লামিক। আবুলহাসানও জানে ''আলমগীর ধর্মসাধনের জন্য শয়তান, ''ঔরংজেব নিজেও সিংহাসন চান না....... ইসলামের প্রতিষ্ঠাই তার ব্রত। তিনিও ফকির ....'' (২/৩)। হিন্দু মদন্নার কথাতেই বোঝাযায়- সুলতানের নামে আবুলহাসানের ''সন্ন্যাস আপনার সার্থক'' (২/২)। গোলকোণ্ডার প্রজারা বিদ্রোহ করলে হাসান নিজেই প্রজাদের কাছে ধরা দিয়ে সৈন্য বলে নয়, ভুল স্বীকার করে প্রেম বলে মিত্র আনে। শেষে গোলকোণ্ডা বাসির সাহায্যে ঔরংজেবকে পরাজিত করে আনন্দে যথার্থ মানুষের মানুষ হয়ে উঠতে আহ্বান করে, কিন্তু ভোলে না স্বভাবজাত সুরা সকলের হাতে তুলে দিয়ে নিজে সুরায় মত্ত হতে।

এছাড়া নাটকের মুসলমানেরা প্রায় সকলেই মহান। বিশেষতঃ হাসানের পত্নী জিন্নৎ স্বামীর প্রেয়সী মমতাজ সত্তা কে জেনে নর্তকী রূপী মমতাজকে বলেছে মমতাজের সঙ্গে স্বামীর বিয়ে দিতে চাই স্বামীর শান্তির জন্য, মমতাজকে প্রধানা বেগম করতেও তার দ্বিধা নেই। কেননা ''বহু বিবাহের রীতি আমাদের ধর্ম বিরুদ্ধ নয়। কুতবশাহী সুলতানদের বহুবেগমই থাকতেন'' (৪/১)— এসংলাপে ইসলামী রীতিতে 'বহুবিবাহ' নয়, সর্বাধিক চারটি বিবাহ করা যায় (বিবাহ নিয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা রয়েছে)। তবে বহু বেগম থাকতেন—সন্দেহ নেই। মমতাজের এশুনে মনে হয়েছে মমতাজ ''মর্তের নন্ বেগমসাহেবা বেহেস্তের অর্থাৎ স্বর্গের। মমতাজ হাসানকে প্রাণাধিক জেনেও নীরবে সহ্য করেছে তার অনুপস্থিতি; নতর্কী সেজে গোপনে সুলতানের কাছে কাছে থেকেছে, সব বুঝেও পত্নীত্বের দাবী করেনি, প্রেমাস্পদকে সেবাই তার মূল ধর্ম। আবার সে গোড়া থেকেই সুলতানি মানস সম্পর্কে সজাগ- বাবুর্চি বাহাদুর তাকে প্রাসাদে নিয়ে যেতে চাইলে সে স্পষ্টই

বলেছে— "আমাকে কাবাব করে সুলতানের খানা বানাতে চাও (১/১)"। তবুও প্রেমের টানে প্রাসাদে গেছে বাহাদুরের হাত ধরেই। অন্যদিকে সুলতান সৈয়দ আহম্মেদ ওমরাও মজঃফর, সুলতানের জ্যেষ্ঠা কন্যা মা-সাহেব সিংহাসনের নেশায় চক্রান্ত সৃষ্টি করে; কৌশলে কর্তব্যপরায়ণ বীর পাঁজিখাঁকে বন্দী করে কারাগরে রাখে। ঔরজেবের সঙ্গে মিলিত হবার ষড়যন্ত্রের কথা ভেবেও বলে "আমাদের এই শিয়া সম্প্রদায় ভুক্তদের সে যেমন অবিশ্বাস করে (২/২)"—এ সংলাপে ইসলামের দুই শ্রেণীর মুসলমান সিয়া-সুন্নী, চিরন্তন বিরোধচিত্র (পূবেই আলোচিত হয়েছে) ফুটে উঠেছে। কাজী সাহেব বিচার করতে এসে বলেছেন যথার্থ কথা — "শিয়াসুন্নী বিরোধ" মুসলমানে শোভা পায়না; সর্বোপরি "মুসলমানে মুসলমানে বিরোধ ইসলাম সম্মত নয়," "আর্দশ মুসলমান ভারতে নেই" (৫/৩) ইত্যাদিতে মুসলমানের বিরোধ চিন্তা থাকলেও ছত্রপতি শিবাজী ও আবুহাসানের মিলিত সভায় মোগল ঔরংজেবের এর দৃষ্টি থেকে গোলকোণ্ডা যুদ্ধে জয়ী হয়ে স্বাধীন থেকেছে। পেমে-মহত্বে-মিলনে স্মরণীয় হয়ে উঠেছে বাইরে সুরামত্ত 'আবুলহাসান' হজের 'বৈরাগী' হয়ে।

গ) 'সিরাজদ্দৌলা' (১৯৩৮) : নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'সিরাজদ্দৌলা'কে ঐতিহাসিক বলেও যুগের প্রয়োজনীয় করে নিয়েছেন। এ নাটক দেখেন সুভাষচন্দ্র বসু। ফজলুল হক নাটক দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন। ইনিই 'অ্যামিউজমেন্ট ট্যাক্স' ফ্রি করেছেন এসময়। নাট্যকার 'নিবেদন' অংশে জানিয়েছেন তাঁর উদ্দেশ্য ও মনোবাসনা— সর্বত্র ইতিহাসকে না মেনে সুভাষ চন্দ্র বসুর আদলে সিরাজকে আঁকলেন যুগ প্রয়োজনে। সমালোচকের মতে 'শচীনের সিরাজদ্দৌলা — সুভাষচন্দ্র বসু।'[৯] ইতিহাসকার এ সিরাজকে না মানলেও নাট্যকার মেনেছেন—আমাদেরও দৃষ্টি সেদিকেই। ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই এই সিরাজের সৃষ্টি। ১৯৩৮-এ ভারতবর্ষের তরুণ যুবদলের কাছে সুভাষচন্দ্র মূর্ত প্রতীক। গান্ধীর শান্ত নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে তিনি হিন্দু-মুসলমানের একতাবদ্ধ এক ভারতের রূপ মেলে ধরেন সকলের সামনে। সুভাষ এ সময় নয়নের মণি বাঙালীর, গান্ধী কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সোচ্চার বাঙালী। কবি, গীতিকার, ঔপন্যাসিকরা থেমে নেই। শচীন সেনগুপ্ত লিখলেন 'সিরাজদ্দৌলা'— সুভাষের প্রতীক বলেই এ সিরাজ বয়সে পক্ক, রাজনীতিতে প্রবীণ, 'চিন্তায় প্রাচীন, কণ্ঠে উত্তাল। বক্তৃতায় মানুষকে বিভোর করার শক্তি অসাধারণ'।[১০] এ নাটকে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের কথা বড় ভূমিকা নিয়েছে। সিরাজ হিন্দু- মুসলমানের মিলিত সত্তা। সুভাষের সেতু বন্ধনের কর্মপদ্ধতির প্রতিধ্বনি। 'পলাশীর যুদ্ধের সময়ও হিন্দু

৯। 'বাংলা ঐতিহাসিক নাটক সমালোচনা ও বিচার' — সৌমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, ১৯৮১।

১০। 'সিরাজদ্দৌলা' — শচীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত (১৩ সং), 'নিবেদন' অংশ দ্রষ্টব্য।

মুসলমানের বিরোধ ছিল না।[১১] এ নাটকে সমাজ রাজনীতি অপেক্ষা সিরাজের হিন্দু মুসলমানের মিলন প্রতিষ্ঠাই মুখ্য হয়ে উঠেছে— ব্যবহৃত হয়েছে সমকালীন বাঙালী — বাংলার ভাব প্রবণতা।

তিন অঙ্কের 'সিরাজদ্দৌলা'র বারোটির বেশী প্রধান চরিত্র মুসলমান এবং স্ত্রী চরিত্র তিনজন। বলাবাহুল্য মুসলমানকে ঘিরেই নাটকের শুরু, বিস্তৃতি ও পরিণতি। নাটকের কাহিনী সর্বপরিচিত— নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে মীরজাফর, রায়দুর্লভ প্রমুখদের স্বার্থদ্বন্দ্ব এবং পলাশীর যুদ্ধের ষড়যন্ত্রকারীদের লালসার স্রোতে পড়ে নবাবের ইংরেজ হস্তে পরাজয় ও মহম্মদী বেগমের ছুরিকায় মৃত্যু। কিন্তু ইতিহাসের সিরাজ আলোচ্য ক্ষেত্রে নতুনতর দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে উদ্ভাসিত। সিরাজ উদার, সরল হলেও বাঙালীর ও বাংলার দুর্দিনের পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন। আলেয়ার হাসি দেখে তার সংলাপে সেকথা স্পষ্ট। আবার তারই মধ্যে — "বেগমেরা হাসতে জানেনা, হারেমের নর্ত্তকীরাও নয়"— ইত্যাদিতে নবাবের একাধিক বেগম ও নবাব হারেমের নর্ত্তকীদের পরিচয় পাই। লুৎফার কাছে সেই চিন্তাগ্রস্ত নবাব। আর "দরবার কক্ষে নৃত্যবিলাস" নিয়ে শত্রুরা কটাক্ষ করলেও সিরাজ জানায় শুধু প্রথম নয়, তবে নিশীথ রাতে দরবারে বেগমের আবির্ভাব এই-ই প্রথম বেগম সাহেবা। এখানে দরবারে অনৈস্লামিক নৃত্যগীত ও মুসলামানীর স্বাধীনতা প্রসঙ্গ। ঘসিটি বেগম লুৎফাকে কালা করতে "কানে শীসে গলিয়ে .... জিভগুলো কেটে" দিলেই হবে, সিরাজ নিজেই তা করবে। এতে লুৎফা জানিয়েছে সিরাজ "একটা মশা পর্যন্ত মারতে পারে না" ইত্যাদিতে ঘসিটি ও সিরাজের চরিত্র স্পষ্ট। আবার ইংরেজের আসবাব, পোষাক পছন্দের হলেও লুৎফা নিজের ঘরে তা রাখতে পারে না, কারণ স্বদেশ প্রেমী সিরাজের মতে "তাদের কাছ থেকে কিছু নেওয়া পাপ।" সিরাজকে দোষী ভাবলে ষড়যন্ত্রকারীদের সামনে নবাব স্পষ্টই জানিয়েছে সে অন্যায় করলে বিচার পরে হবে, কিন্তু বাংলার দুর্দিনে কেউ যেন তাকে ত্যাগ না করে সেটাই অনুরোধ, বিজ্ঞের পরিচয় যেমন রাখে তেমনি নিম্নোক্ত সংলাপে তার তথা সমকালীন বাঙালী মনস্কামনা ব্যক্ত হয়েছে — "বাংলার মান, বাংলার মর্য্যাদা, বাংলার স্বাধীনতার রক্ষার প্রয়াসে .... শক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে সর্বরকমে সাহায্য করুন। .... যদি এই বিপদ থেকে আমরা পরিত্রাণ পাই, ... আমার বিচারে বসবেন .... দণ্ড .... আমি মাথা পেতে নেবো .... আমি সুষ্ঠু মনে সিংহাসন ছেড়ে দেব। .... বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংলা শুধু মুসলমানের নয়— মিলিত হিন্দু মুসলমানের মাতৃভূমি গুল্‌বাগ এই বাংলা। অপরাধ .... মিলিত হিন্দু মুসলমারের কাছেই করিচি ....

১১। পলাশীর যুদ্ধের সময় হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ ছিল না। চাকরী হিন্দুদের প্রধান জীবিকা হয়। মুর্শিদকুলি খাঁর পর সুজা খাঁ, সবফবাজ, আলীবর্দী, সিবাজের আমলে তা বৃদ্ধি পায়।'
দ্রষ্টব্য ঃ 'পলাশীর যুদ্ধের সময় বাংলার অবস্থা'-প্রাবন্ধিক নরেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ। 'ইতিহাস' পত্রিকা, ১৩৬০।

পক্ষপাতিত্বের অপরাধে কেউই আমরা অপরাধী নয়। সুতরাং আমি মুসলমান বলে আমার প্রতি বিরূপ হবেন না ...... (২/১)'' ইত্যাদি। শত অপরাধেও সিরাজ নিষ্ঠুর নয়, সাজা দিতে পারেন না অপরাধীদের। কারণ ''পারি না শুধু আমি কঠোর নই বলে, পারিনা শুধু পরের ব্যথায় আমার প্রাণ কেঁদে ওঠে বলে''। (ক্ষোভে দুঃখে সিরাজ প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন''(২/১) ইত্যাদি সিরাজের ছবি। তাই পনের মাসেব রাজত্বে বিপর্যস্ত সিরাজ পলাশীকে ''রাক্ষসী পলাশী'' বলেছে, মীরন পলাশীর যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ জানালে নর্তকী আলেয়া ''সিন্নি'' চড়িয়েছে কিনা তার খোঁজ নিতে আসে, কৈফিয়ৎ নিতে আসে সমাজ পরিত্যক্তা সামান্য এক নর্ত্তকীকে। শেষে ''কোরান স্পর্শ করে শপথ'' করেও মীরজাফরের বেইমানীতে সিরাজ পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়নে বাধ্য হয়। ধরা পড়লে নকল সিংহাসনের সামনে নবাবকে বেইজ্জতি করে মহম্মদীবেগ মীরনের নির্দেশে সিরাজকে ছুরি বিদ্ধ করেও হত্যা করে। মৃত্যু কালেও মহান সিরাজ বলে যায় — ''কাউকে আমি অভিশাপ দেব না। সুখে থাক ভাই সব। বাংলায় শান্তি ফিরে আসুক,'' বলেই পড়ে গেল। নাট্যকার বন্ধনীতে জানিয়েছেন — '' একখানি হাত রহিল সিংহাসনের উপর। সমস্থ দেশ যেন কাঁপিয়া উঠিল। জনতা মাথা নত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িল'' (৩/৩)।

সিরাজদ্দৌলা ছাড়াও নাটকের শুরুতে দেশপ্রেমী গোলাম হোসেন রূপী পুরুষদের পোষাকে হিন্দু মুসলমান ইংরেজের মিলন চিত্র — ''গোলাম হোসেন কুর্নিশ করিতেছে। .... একপায়ে প্যান্ট আর বুট, আর একপায়ে নাগরাই পাজামা আর নাগরার দেহের এক অর্দ্ধে ইংলিশ কোর্ট আর এক অর্দ্ধে নামাবলীর মেরজাই। গলায় কণ্ঠি, নাকে তিলক, মাথায় অর্ধেক টপ-হ্যাট আর অর্ধেক ফেজ। গোঁফ কামানো আর চাপা দাড়ি। প্রকাণ্ড এক গোছা টিকি''(১/১) ইত্যাদি। গোলামের চোখে বাংলার দেশপ্রেমিক নেই একটাও— ''সবাই স্বার্থান্বেষী, শুধু একজনই আছে'' সে হতভাগ্য নবাব''। আলেয়াও জানায় দুষ্টেরা প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলতেই নবাবের কুৎসা রটায়। আলেয়া বৈষ্ণব গীতি গায়। সিরাজকে পালাতে সাহায্য করে ধরা পড়েও শত অত্যাচারে মুখ খুলে না সিরাজের অনুসন্ধানের পক্ষে। বেগম লুৎফাও সরলা, সুন্দর শুধু নয় ইসলামী নীতি, প্রথম স্ত্রী কর্তব্যে সচেতন — এই সংলাপই সে প্রমাণ যথেষ্ট — ''জাঁহাপনা, ... আমি জানি রাজনীতি ক্ষেত্রে বেগমের আবির্ভাব অনধিকার অসঙ্গত। কিন্তু আমি শুধু বেগম নই, নবাবের হারেমের শোভাবর্দ্ধন করার জন্য প্রাণহীন পুতুল হয়ে থাকতে আমি আর প্রস্তুত নই জাঁহাপনা। আমি নবাবের স্ত্রী, নবাবের সহধর্ম্মিনী, নবাবের সুখদুঃখের অংশ ভাগিনী। নবাব আমার ইষ্ট, আমার আরাধ্য''।

শচীন সেনগুপ্তের আলোচিত তিনটি নাটকে হিন্দু মুসলমানের চিত্রণে নাট্যকার উদার মানসিকতার পরিচয় রেখেছেন। 'গৈরিক পতাকা'তে শিবাজী শুধু নন, মুসলমানও মহান। 'আবুল হাসান' হিন্দু মুসলমান নয়, মুসলমান প্রায় সকলেই মহৎ। আবুল হাসান সুরাপ্রেমী হয়েও মহান মানুষের 'বৈরাগী' মনের বাস্তব চিত্রায়ণ। 'সিরাজদৌলা' হিন্দু-মুসলমানের মিলিত সত্তা - বেহেস্ত্। যদিও এখানে মুসলমানরা অনেক ক্ষেত্রেই হিন্দুর ন্যায় আচরণ কবেছে মুসলমান নাম চরিত্রের আড়ালে। বস্তুত: নাট্যকারও 'মুসলমান' ও তার সমাজের গভীরে সেভাবে প্রবেশ করতে সচেষ্ট হননি। যুগ প্রভাবই বড় করে দেখা দিয়ে স্রষ্টার মানসে। এক কথায় নাটক তিনটিতে মুসলমান সমাজ ও সমাজ প্রতিনিধি মুসলমানরা নাট্যকারেব হাতে বাস্তব সুন্দর হয়ে উঠেছে। নাট্যকারের 'রাষ্ট্রবিপ্লব', কামাল 'আতাতুর্ক', প্রভৃতিতে একই মানসিকতার প্রতিফলন লক্ষিত হয়।

৪। নাট্যকার মন্মথ রায়ের নাটকে মুসলমান সমাজ পরিচয় ঃ

মন্মথ রায় বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এক স্মরণীয় নাম। একাঙ্ক-পঞ্চাঙ্ক নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর অনেক নাটক লিখেছেন দীর্ঘকাল ধরে । আমদের আলোচ্য কালসীমার তিনটি একাঙ্ক ও একটি পূর্ণাঙ্ক নাটকে মুসলমান সমাজের পরিচয় রয়েছে। এগুলো বিশ শতকের তিরিশের দশকের টালমাটাল পরিস্থিতি, সারাবিশ্বে রাজনীতির ব্যাপক ভাঙা গড়াব খেলা ইত্যাদির মধ্যে রচিত হয়েছে। যুগপ্রভাবে মন্মথ রায়ের লেখনী অসাম্প্রদায়িক। মুসলমান কর্তব্য পরায়ণ, সৎ সুন্দর।

ক) 'উদ্ধার' (১৯৩৮) ঃ এ পর্যায়ের প্রথম নাটিকা। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ভাদ্রের বন্যা বিধ্বস্ত গ্রাম নাটিকাটির পটভূমি। শত শত গ্রাম ও জীবন বন্যার জলের —তলায়। গ্রাম ছাড়া হয়েছে সকলেই। যারা পালাতে পারেনি তাদেরই কয়েক জন এক মাচানে রয়েছে। বৃদ্ধ অসুস্থ পুরোহিত রামহরি ও তার দ্বিতীয় পক্ষের যুবতী সুন্দরী স্ত্রী সৌদামিণীর সঙ্গে সতীন পুত্র নরু, তাদের ভাগচাষী মুসলমান পরান সেখ, একটা পাঁঠা এবং মহাজন প্রিয়লাল। প্রিয়লাল সৌদামিণীকে নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু সৌদামিণী রাজী নয়। এরা সকলে ক্ষুধার্ত। এসময় পরান কৌশল প্রিয়লালের প্রান সর্বস্ব জমির দলিলপত্রাদি জ্বালানী করেও রান্না করেছে। প্রিয়লাল জানতে পেরে পরানকে গুলী করতে গিয়ে জেনেছে কার্তুজ গুলো সৌদামিণী জলে দিয়েছে, নিঃস্ব হতোদ্যম প্রিয়লাল তার ভেলা নিয়ে চলে যেতে চেয়েছে। কিন্তু পরান তাদের ছেড়ে যাবে না, কর্তব্যের তাগিদে। দুদিন না খেয়ে থেকেছে, কারণ সে খেলে নরু বা সৌদামিণীর 'পেট ভরবে না'। বাধ্য হয়ে সাধের পাঁঠাকে মেরে কাঁচা মাংস খেতে উদ্যত হয়। প্রিয়লাল এতে ধিক্কার দিলে পরান সেখের স্পষ্ট উক্তি- ''তোমরা ভদ্দর বড় লোক'' ভাত খেয়েও তাকে দাওনি খিদে কিসে মরবে? শেষে পরান চলে যেতে

চায় তাদের ছেড়ে, কারণ সে গেলে সামান্য অন্নক'টি নরু ও সৌদামিণী খেয়ে বাঁচবে, তাদের অনাহারে রেখে খেতে পারব না, কিন্তু অন্যত্র মরতে পারবে। এতে ব্রাহ্মণী সৌদামিণী অভিভূত হয়ে বলেছে পরান তাদের ছেড়ে গেলে কষ্ট পাবে, পরান থেকে গেছে। অবশেষে তাদের রিলিফের নৌকায় স্থান হয়েছে। প্রিয়লাল সব হারালেও বাকিরা সব পেয়েছে; বিশেষতঃ মুসলমান পরান কর্তব্যে, দয়াপরায়ণতায়, নির্ভীকতায় যথার্থ মানুষ রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে—সৌদামিণীর কাছে, আমাদের কাছেও।

খ) 'ক্ষণ স্বপ্ন' : ক্ষুদ্র এই নাটিকায় নন্দলাল সেনের কন্যা নন্দিতা দেবীর সঙ্গে নন্দন দাসগুপ্তের বিবাহের কথাবার্তা সম্বলিত এক পরিবারের ঘটনা, এনাটকে উচ্চবিত্তের ঘরে বাবুর্চি রহিমের সাক্ষাৎ মেলে। মুসলমান সমাজে অনেককেই কায়িক শ্রমে নিযুক্ত হতে হয়েছে। এক সময় বাবুর্চির কাজের মত অনেক কাজই মুসলমানদের একচেটিয়া ছিল। আলোচ্য নাটিকায় তেমনই এক বাবুর্চি রহিমের সাক্ষাত মেলে। কিন্তু বিশেষ ভাবে উল্লেখের বিষয় এই বাবুর্চি রহিম বিত্তবান হিন্দু নন্দলাল সেনের রান্নাশালায় কর্মরত। শুধু তাই নয়, রহিম বাড়ির অন্য চাকরাণী চাকরদের সঙ্গে মিলে মিশে থাকে। বাড়ীর ম্যানেজার সবার সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখে। সেবাও নিজ প্রয়োজনে রহিমের ''এক রাত্তিরের ছুটি'' মঞ্জুর করে। ''বলে দেয় ''দু'একটা নুতন রান্না শিখে এসো বরং......।'' রহিম জানায়- ''জরুর''। রহিমের পরিচয় বা মুসলমানিত্ব বেশী প্রকাশিত না হলেও সম্ভ্রান্ত হিন্দু গৃহে মুসলমান বাবুর্চি।

গ) 'বসুন্ধরা' : এই নাটিকা কলকাতার উপকণ্ঠে একটা দ্বিতল গৃহের একটা নিম্ন তলার ঘর ও ঘরভাড়ার দ্বন্দ্বের ঘটনাশ্রিত। এখানে ভাড়া দেওয়া কেন্দ্র করে মুসলমান বেলিক ও তার সাকরেদদের কর্তৃত্ব প্রকাশিত হয়েছে। এখানে বেলিক বা মুসলমান চরিত্রেরা মস্তান গোছের, এরা টাকার বিনিময়ে কাজ করে, আবার পাহারা দিয়েও টাকা অর্থাৎ ঘুষ খেয়ে কর্তব্যে অবহেলাও করে। এখানে মুসলমান চরিত্র কর্মে ও ব্যবহারে হীন হয়ে পড়েছে। কিন্তু সমাজে সমকালে-একালেও এঘটনা বাস্তব সত্য। মুসলমান চরিত্রের এই পরিচয়ে মুসলমানের সম্মান কমেছে বলে মনে হয়। অবশ্য তাদের সম্প্রদায় হিসেবে আলাদা না করলে কোন গোল থাকে না।

ঘ) 'মীরকাশিম' : *পাঁচ অঙ্কের এই ঐতিহাসিক নাটকটির রচনা কাল ১৯৩৮ এর* ১৮ই নভেম্বর থেকে ৭ই ডিসেম্বর। নাট্যকার নিজেই বলেছেন ''এই নাটকে ইতিহাস বিকৃত হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস।[১২]'' দেশাত্ম বোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্য নিয়েই নাটকটি রচিত। নাটকটি হিন্দুমুসলমান ঐক্য সম্পাদনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সমকালে। *মীরকাশিমের আত্মানুশোচনার মধ্য দিয়ে সেই উপলব্ধির স্বরূপ বোঝা* যায়। এটাকে স্বাধীনতা আকাঙক্ষা মীরকাশিমের মধ্য দিয়েই নাট্যকার প্রকাশ করতে

১২। 'বাংলা নাটকে মন্মথ রায়ের দান'— জয়তী বিশ্বাস।

চেয়েছেন। গিরিশচন্দ্রের "মীরকাশেমে"র মতই এখানেও মীরকাশিম স্বাধীনতাপ্রেমী ইংরেজ বিরোধী। তাঁর কাছে মসনদ অপেক্ষা দেশপ্রেম বড়, স্বাধীনতা মহান। যদিও রচনাশৈলীতে দুই নাট্যকারের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তবে এ নাটকটিও ব্রিটিশ রাজরোষে পড়ে, 'সেন্সরের ছুরিতে কনেকটা কাটা যায়।'[১৩] নাটকটিতে বেশ কয়েকটি মুসলমান চবিত্র রয়েছে। মীরকাশিম বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব, মীরজাফর, কাশেম পত্নী, মনিবেগম, নফাজ খাঁ, তকী খাঁ, আরাব খাঁ, নাজাম, খাজা-উদ্দোলা, উল্লাখাঁ, আতাউল্লা প্রমুখ। এদের কথাবার্তায় ও হিন্দু-ইংরেজ চরিত্রদের সংলাপে মুসলমান সমাজের পরিচয় মেলে। এই মুসলমানরা অধিকাংশই সুন্দর-শ্রদ্ধার সঙ্গে চিত্রিত। কয়েকটা চরিত্র শয়তান, লোভী হলেও নাট্যকারের কোথাও মুসলমানকে হীন করে আঁকার মানসিকতা লক্ষিত হয়না।

নবাব মীরকাশিম স্বাধীন চেতা। সাহেবদের সঙ্গে বিরোধে হিন্দু রায়দুর্লভ, রাজবল্লভকে অনুরোধ করেন তাঁকে সাহায্য না করলেও যেন বেইমানী না করেন। আসলে হিন্দু-মুসলমানের ধুয়া তুলে ফয়দা লুটতে চাই আমিয়টের কথাতে তা স্পষ্ট। কিন্তু নবাব এখনো রাতে শোনেন সিরাজের অন্তিম হাহাকার— "বেইমানি। বেইমানি"। নাফাজ খাঁ নবাবকে জানিয়েছে তকী খাঁ সাহেবদের ত্রিশটা বানিজ্যের নামে গোলা বারুদ ভর্তি নৌকা আটক করেছে। আরাব খাঁ জানিয়েছে এনিস প্রমুখ সাহেবরা নবাবের চুক্তি অমান্য করে পাটনা আক্রমণ করেছে, নরনারীদের উপর অত্যাচার করেছে। নবাব বাংলার শান্তিকামী মানুষের বুক ফাটা আর্তনাদের জন্য উৎকণ্ঠিত, তাঁর আর্জিতে খোদাকে স্মরণের পরিচয়— "কে আছ শহীদ, কে আছ গাজী, কে আছ খোদার নফর—অত্যাচার অবসানের" জন্য কার দয়াতে সিরাজের প্রতি শাঠ্য, মানুষের প্রতি অত্যাচার বন্ধ হবে। প্রাপের প্রায়শ্চিও করতে সকলে আহ্বান করেছেন। ২/১এ মীজাফরের পত্নী কাসিমের স্ত্রীর মুখে ভর্ৎসনা শুনেছে নর্তকী বলে- সেই ক্রোধে মনিবেগম ইংরেজের সামনে এসেছে চক্রান্ত জাল তৈরী করতে মুসলমানীর আব্রু বিসর্জন দিয়ে। কিন্তু মীরজাফর তার বেইমানীর জন্য অনুতপ্ত। সে জানিয়েছে সে একা দায়ী নয়; তার সঙ্গে রয়েছে হিন্দু আমলারাও। ইংরেজ কৌশলে মীজাফরকে পুনরায় নবাব করার কথা ঘোষণা করেছে। মীরকাশিমকে যুদ্ধে পরাস্ত করেই তা করবে। যুদ্ধে দেশপ্রেমিক মুসলমান তকী খাঁ মারা গেছে, বেইমানির জন্য নবাব পক্ষ পরাজিত হয়েছে। নামাজ খাঁ ও আরাব খাঁ যথার্থ মুসলমানের মতই 'ইমানে'র নামে শপথ নিয়েছে বেইমানী না করার। নফাজের ভাষায় "এদেশ শুধু আপনার নয় আমারও।" আরাব খাঁ- "তরবারি স্পর্শ করে শপথ করছি ইমান রাখব।" মীরকাশিম বেগম ফতেমা তার বাবা মীরজাফরকে বলেছে, দেশদ্রোহীর অপরাধে তার সাজা দাবী করেছে। মনিবেগমের পুত্র নাজাউদৌল্লা

১৩। রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় - 'বাংলা নাট্য নিয়ন্ত্রণের ইতিহাস' ১৯৭৬।

ছদ্মবেশে এসে দিদি ফতেমাকে জানিয়েছে— "আমি আমার পিতৃপরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করি।"

সে সাধারণ দেশপ্রেমিক সৈনিকের সন্তান হলেও শাস্তি পেত। ব্যক্তি স্বার্থের জন্য দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে নবাব হবার ইচ্ছে তার নেই। সে মাথা উঁচু করে স্বাধীনভাবে বাঁচতে, নয়ত দেশের জন্য মরতে চায়। কারণ নাজামের সংলাপেই স্পষ্ট—"বুঝেছি বহিন! .... প্রজার স্বার্থ .... জাতির স্বার্থ কিছু নয়— সব ঐ বাংলার মসনদ। .... কিন্তু স্বাধীন বাংলার বাচ্চা আমি। বিদেশী বণিকের পদলেহন করে, অমন সিংহাসনে আমি বসতে চাই না। অমন মসনদে আমি পদাঘাত করি। স্বাধীনতার একটা পতকা আমায় দাও বহিন .... আমায় বাঁচতে দাও।" যথার্থ স্বাধীন চেতা এই দেশপ্রেমিকের কথা আড়াল থেকে শুনে মীরকাশিম তাকে বন্দী করে উদয়নালাতে মুক্ত করে দেবার নির্দেশ দিয়েছে। কারণ সে এই যুদ্ধে মারা গেলেও— নাজামউদ্দৌলা বেঁচে থাকলে এদেশ আবার জাগবে। একদিকে নাফাজ ইংরেজ দুর্গ দখল করেছে, ইংরেজ নবাবের সঙ্গে পেরে উঠছেনা, অন্যদিকে মনিবেগম দুর্গে প্রবেশের পথ বলে দিতে তার চর পিদ্রুস কে নিয়োগ করেছে। পিদ্রুস গুরু সিন খাঁ ও সকলকে মদ খাইয়ে মাতাল করেছে, শেষাবধি নবাব পক্ষ পরাজিত হয়েছে, বেইমানই জয়ী হয়েছে। ৫/১এ জুম্মা মসজিদে ফতেমা ও নফাজ খাঁ পাগল কাশিম আলিকে খুঁজছে, নবাবকে কয়েক বছর পরেও ইংরেজ খুঁজে পায়নি। সুজাউদৌলার চর আতাউল্লা খাঁকে জানিয়েছে নামাজের পর নবাবকে ধরিয়ে দেবে। কিন্তু আসলে ধরার ব্যবস্থা হবে না- কারণ বাদশা নরাধম নন। নবাব "বাদশার স্বজাতি-স্বধর্মী। বিদেশী বিধর্মীর হাতে" ধরিয়ে দেবে না। শেষে জুম্মাবারে নামাজের সময় ফতেমা নাফাজ মীরকাশিমকে পেয়েছে। কিন্তু পাগল নবাব এখনও স্ত্রীকে মীরজাফরের কন্যা বলেই ভুল বোঝেন, শত্রু ভাবেন; ফতেমা কেঁদে ভাসান কিন্তু এখনও সিরাজের, পলাশীর যন্ত্রনার জন্য কাঁদে— ডাকদেয় "পলাশীর প্রায়াশ্চিত্ত কর— আকাশে বাতাসে ধ্বনি তোল "ভারত ছাড়ো-ভারত ছাড়ো"। এসময় আতাউল্লা এসে কাশিমকে বাঁধতে গেলে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়ে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব মারা যায়— নাটকের যবনিকা নামে।

'মীরকাশিম' নাটকে মুসলমান সমাজ আলোচ্য বড় নয়, বড় দেশাত্মবোধ, স্বাধীনতা— তাঁর প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র নবাব মীরকাশীম, নাজাম, ফতেমা, তকী খাঁ, আরাব খাঁ প্রমুখ মুসলমান। ইতিহাস সর্বত্র রক্ষিত না হলেও মুসলমান শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছে। অন্য নাটিকা গুলোতেও তার মুসলমান চরিত্র গুলো সুন্দর। বিশেষতঃ 'উদ্ধার' নাটিকায় পরাণ সেখ এবং হিন্দুগৃহে ক্ষণস্বপ্নের মুসলমান রহিম স্মরণীয় দুই চরিত্র— স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সুন্দর। 'বসুন্দরা'-র বেলিক মুসলমান হীন চরিত্র, তবে বিদ্বেষ

বশত: নয় যুগ মানসিকতার বাস্তব এক চরিত্র—মুসলমান না হিন্দু তা বড় কথা নয়। সব মিলিয়ে স্বাধীনতা মনস্ক মন্মথ রায়ের মুসলমান চরিত্র গুলো সুন্দর-সম্মানীয়। তবে মুসলমান যথাযথ হয়েছে সর্বদা একথা বলা যায় না।

৫। বিজন ভট্টাচার্যের নাটকে মুসলমান ঃ

ভারতীয় গণ নাট্য সংঘ পশ্চিমবঙ্গ শাখার বদান্যে যুগপোযোগী বাস্তব নানা ঘটনাচিত্রের প্রথম প্রকাশ ঘটেছে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকে। কিন্তু তাঁর প্রথম নাটক 'আগুন'এ মুসলমান নেই, 'জবানবন্দী', 'নবান্ন' ও 'জীয়নকন্যাতে' মুসলমান আছে।

ক) 'জবানবন্দী' (১৯৪৩) ঃ মুসলমান চরিত্র একমাত্র রমজান। এছাড়া নাটক শুরুর পরিবেশ সৃষ্টিতে মুসলমান সমাজ চিত্র এসেছে— "...... ... থেকে থেকে অস্পষ্ট একটা আজানের সুর দূরাগত বাঁশীর সুরের মতই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।" এ সুর ইসলাম ধর্ম অনুসারে নির্দিষ্ট প্রহরে আল্লার উপাসনা অর্থাৎ নামাজের পূর্বে তাবস্বরে ধ্বনিত হয়, এটাই 'আজান'। সাধারণ চাষী পরাণেব মতই প্রতিবেশী রমজান দুর্ভিক্ষ পীড়িত হয়ে যারা এসেছে খিঁচুড়ির আশায়। বাঁচার তাগিদে পদা, রমজান, রাইচরণ একাকার। পবাণেব মৃত্যুতে রমজানও ভেঙে পড়ে। এখানে মুসলমানের সমস্যা শ্রেণীগত-সমাজ-ধর্মগত নয়। উল্লেখ্য, গণনাট্যসংঘের অন্যতম সংগঠক যুক্তিবাদী ও স্পষ্টবাদী প্রাবন্ধিক, গ্রন্থকার নাট্যকর্মী সুধী প্রধান সাক্ষাৎকারে ও 'নবান্ন প্রযোজনা ও প্রভাব' গ্রন্থে জানিয়েছেন— বিজন 'জবানবন্দী' না লিখলে 'নবান্ন' লেখা হত না।

খ) 'নবান্ন' (১৯৪৪) ঃ 'জালস্বত্ব' গল্প, 'আগুন', 'জবানবন্দী'-র পর পূর্বের অনেক অসংলগ্নতা দূর করে গণনাট্য সংঘের প্রেরণায় লেখেন 'নবান্ন'। একটা কৃষক পরিবার দুর্ভিক্ষ মন্বন্তরের মধ্যে পড়ে কলকাতার লঙ্গরখানার ভরসায় এসে কিভাবে বিপন্ন হল তার বর্ণনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ১৯৪৩-৪৪ এর বাস্তব কলকাতা ও যুগজীবনের দৃশ্যমালা। নাটিক্য তাৎপর্যে নিখুঁত না হয়েও সম্পাদনা ও অভিনয়ে, সমকালীন কমিউনিস্ট পার্টির পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ মদতে নাট্যজগতে নতুন সাড়া ফেলে 'নবান্ন'। 'গণনাটক না হয়েও পুরোদস্তুর গণনাটক হবার অনুকুল আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে'।[১৩ক] নবান্ন প্রচলিত নাট্যচর্চা থেকে 'প্রযোজনা ও অভিনয়ে স্বতন্ত্র অভিনব, যুগপোযোগী এবং নান্দনিক বিচারে সার্থক'।[১৪]

'নবান্নে' মুসলমান আছে। যদিও পরবর্তী কালে ২/১ টি মুসলমান চরিত্র লুপ্ত হয়েছে। সেযুগে কমিউনিস্ট পার্টির স্লোগান ছিল হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যগঠন।

১৩ক। হিরণ স্যান্যালের প্রবন্ধ — পরিচয় ১৩৫১।

১৪। প্রাগুক্ত পাদটীকা — ৬।

মুসলমান চরিত্রের মোট সংখ্যা পাঁচজন (প্রমা স্কংকরণ ও পাণ্ডুলিপি সহ)। বরকত, ফকীর, গোলামনবী, ফেকুমিঞা ও রহমৎউল্লা। গ্রামে ফিরে বরকত সভা আহ্বান করলে বাপের দেনা নিয়ে "জন্ম-জন্মান্তরের" বোঝা হালকা করতে চায় — পথ খোঁজে নতুন উপায়ের। রহিম, রবকত, গোলামের আলোচনায় জীবন সমস্যার কথা আসে, কৃষকেরাও তাতে যোগদেয়। গাতায় ফসল ঘরে তোলার শপথ সমর্থন করেও ফকীর সম্ভাবনায় সন্দেহ প্রকাশ করে। কারণ মহাজন পাইকারদের আশংকা। ধর্মীয় মানত ও মৌলবীর তিরষ্কার চিন্তায় আতঙ্কিত হয়। শত 'সমস্যা' সত্ত্বেও "পীরের দরগায় খাসি! সেটা তো দিতেই হবে"। অন্যথায় "মওলানা যে আমারে তাহলে একেবারে সেরে ফেলে ধেবে খন"। বরকত সাহস দেয়— " বললেই হল আর কি মত্তলানা। সুবিধে অসুবিধে নেই মানুষের!" দেবার হলে পরে দেবে। "খোদাতালার চোখ" তোমার সে ঐ মত্তলানার কটা ছোখের মত ছোটো না"— ইত্যাদিতে মুসলমানের খোদায় বিশ্বাস আছে, কিন্তু মৌলবীর শাসানি বা গোঁড়ামীতে ধিক্কার। বরকতের মেয়ের সঙ্গে ঠাট্টা তামাশায় "ওর সঙ্গে নিকে হয়েছে" জানায়। নিরঞ্জন বরকৎকে 'চাচা' সম্মোধন করে। নবান্ন উৎসবের প্রাক্কালে ফকীরদের গানে হিন্দু-মুসলমানের 'দোস্তানী' পাতানোর কথা, উৎসবে মোরগের লড়াইয়ে ফেঁকু মিঞার বাজি জেতা ইত্যাদিতে মুসলমান চিত্র। গরুর লড়াইয়ে রহমৎউল্লা গরু জিতলে সকলে আনন্দ প্রকাশ করে। বাবুরালি ফিরে এলে হিন্দু-মুসলমান সকলেই তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

'জীয়নকন্যা' নাটকে সাপের ওঝা বদর আলি সুন্দর বাস্তব মুসলমান চরিত্র। কিছু পরে চরিত্রটি 'গোত্রান্তর' নাটকের মুসলমান চরিত্রের মতই পাল্টে গেছে 'গোত্রান্তর'- এ হিন্দু উদ্বাস্তু মেয়ের সঙ্গে মুসলমান সমাজকর্মী তরুণের বিয়ে দিয়ে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সহজ সমাধান দেখান হয়েছে।

৬। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের নাটকে মুসলমান ঃ

বাস্তববাদী প্রাবন্ধিক নট-নাট্যকার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য জাপ বিরোধী নাটকের চাহিদা মেটাতে **"হোমিওপ্যাথি"**(১৯৪৩) নাটকটি লেখেন।[১৫] স্বল্পদৈর্ঘ্যের এই নাটকের নাট্যকারের উদার হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি ধ্বনিত হয়েছে। এই সুরে কথা যুগিয়েছে মুসলমান - হিন্দু সমাজ। জাপানী বোমার আক্রমণের আতঙ্ক কিভাবে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়কে সাম্প্রদায়িকতা ভুলে সংহতি ঐক্যের বেড়াজালে শুধু গ্রথিতই করেনি, বিদ্রোহের হাতিয়ার তুলে নিয়েছে— তারই ইঙ্গিত নাটকে বর্তমান।

১৫। ১৯৪২ এর ১৩ই মে 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় 'জাপবিরোধি নাটক চাই' বিজ্ঞাপন ও পরে ভারতীয়গণ নাট্য সংঘের প্রচেষ্টায় 'হোমিওপ্যাথি' রচিত হয়। ১৯৪৪ এর ৩রা জানু: ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের ২য় বার্ষিক সম্মেলনে জবানবন্দী ও হোমিওপ্যাথি একই সঙ্গে স্টারে অভিনীত হয়। সুধীপ্রধানের পূর্বলিখিত গ্রন্থ।

পূর্ববঙ্গের পূর্বাঞ্চলে কলেরার মড়ক লেগেছে। ঔষধের বাক্স সহ জগাইকে নিয়ে হোমিও প্যাথি ডাক্তার নিবারণ "মিঞা পাড়ায়" রুগী দেখতে যাচ্ছেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ স্মৃতিরত্ন তার স্ত্রীকে দেখানোর জন্য আগে ডাক্তারকে নিয়ে যেতে চায়। কারণ স্ত্রীর মৃত্যু নয় - "মিঞাপাড়ার ঘুরে ছুঁয়ে নেপে" বামুনপাড়ায় যাওয়া ঠিক না। কিন্তু বিবেকবান ডাক্তার মিঞাপাড়ায় "ওলা ওটা" রোগীদের আগেই দেখবেন। কেননা "নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ঘরে" এখন 'পুরিয়া'ই যথেষ্ট। জগাই জানিয়েছে হিন্দু মুসলিমের চিরাচরিত বিরোধ মাথাচাড়া দিচ্ছে। ওলা ওটা সারাতে 'নমাজ' ও কীর্ত্তনের প্রস্তুতিকে কেন্দ্র করে; ডাক্তার এই রোগের 'পুরিয়া' খুঁজে পাচ্ছেনা। না চেঁচালে হরি শুনতে পাননা "মুসলমানদের খোদা মনের কথা টের পান, চেঁচালে রাগ করেন। মসজিদের কাছে চিৎকার অসহ্য। মুসমানের নামাজ নীরবেই হয়। ইসলামে চেঁচিয়ে শুধু 'আজান' দেওয়া হয়। হিন্দুরা চাই মসজিদের পাশের রাজপথ সবার, তাই কীর্ত্তন যেতেই পারে। এই নিয়ে বিরোধ। জগাইএর প্রশ্ন— "হরি। আল্লা এক না আলাদা?" ডাক্তার— "এক কিনা জানিনা। আমরা হিন্দু-মুসলমানেরা যে এক নয়রে, দুই।" এখানেই সমস্যা। নইলে সকলে মিলে আল্লা ও হরির কাছে জোরদার অভিযোগ করলে মড়কের বিরুদ্ধে সবার মঙ্গল। জগাই 'মসজিদ' 'মন্দির' সর্বত্র যায়। হরি আল্লা এক হলে মুসকিল হবে তার। ডাক্তারের পরামর্শ হিন্দু মুসলিম কেউ শোনেনি। শেষে লাঠি, দা নিয়ে গ্রামবাসীরা যখন মন্দির মসজিদ তছনছ করতে উদ্যত, তখন জাপানী এরোপ্লেনের শব্দে সকলে বিভেদ ভুলে, প্রতিবেশীকে রক্ষা করতে ব্যস্ত হয়। বোমার ভয়ে হিন্দু মসজিদে, মুসলমান মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছে। "খাঁটি মুসলমানকে খাঁটি হিন্দুরা দুঃসময়ে মন্দিরে টেনে নিয়ে" গিয়েছে। "মসজিদেও সেই কাণ্ড"। সাইরেন বাজতেই দাঙ্গা থেমে গেছে। "টিকিতে আর টুপীতে" হয়েছে কোলাকুলি, "মোল্লাজীরাই বাবাজীদের ভেতরে" নিয়ে গেছেন অবশেষে— বাবাজী মোল্লাজী শপথ নিয়েছে হাতে হাত রেখে — "কেত্তন গেলে নমাজ পড়বো, কেত্তন অন্যপথে ঘুরে যাবে। নিবারণ বুঝেছে দাঙ্গার পুরিয়া 'বোমা'-এটাই তার হোমিওপ্যাথি।

৭। তুলসী লাহিড়ীর নাটকে মুসলমান সমাজের পরিচয় :

গীতিকার, দক্ষ অভিনেতা চল্লিশের দশকের বাঙালী জীবনের বিপর্যয়ের সাক্ষ্য বহনকারী নাট্যকার তুলসী লাহিড়ী। ২য় বিশ্বযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পঞ্চাশের মন্বন্তর, শেষে দেশভাগ-জনিত দাঙ্গা প্রভৃতির ফলে সমাজের দুরবস্থার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর নাটকে। তা বলে তিনি অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার বা হাহাকার করেন নি, হতাশার কথা শোনাননি। কোথায় সততার আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে; আর তা রক্ষার্থে কে বা কারা সংগ্রাম করছে, সেদিকে আলোকপাত করেছেন। সেখানে সর্বধর্মের উর্দ্ধে জীবন্ত হয়ে উঠেছে মানবতা। তাঁর ১৫টি একাঙ্কের তিনটি বর্তমানে আলোচ্য।

ক) 'দুঃখীর ইমান' (১৯৪৬) : দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে আঁকা গ্রামের চিত্র। ধনতান্ত্রিক সভ্যতার লোভ ধ্বংস করে হৃদয়হীন শোষণের আসান ঘটিয়ে হৃদয়ধার্মী মানুষের আশার প্রদীপ জ্বলে উঠেছে দুটি চরিত্রকে আশ্রয় করে। হিন্দু ধর্ম্মদাস ও মুসলমান জামালের দুই নিপীড়িত দুঃখীর ইমানদারী মানসিকতায়। সহোদরের চক্রান্তে জেল খেটে আশা ধর্ম্মদাস সৎভাবে বাঁচতে চাই। স্ত্রী বিলাতীর সঙ্গে সম্পর্ক প্রকাশে মুসলমান নবাব -বেগম এসেছে। "হাট থেকে একটা ফুকদানার মালা এনে দিস্ তাতে .... ফয়জাবাদের নবাব তার ৮৬ নং বেগমকে কোহিনূর মনি এনে দিলেও সেই বেগমের কি?" বিলাতীর স্পষ্ট উক্তি—"যার অত বেগম তার বেগমের আবার সুখ কি?" নিয়ম মত থানায় হাজিরা দিতে গিয়ে ধর্ম্মদাস নিরপরাধ জামালের পাশে দাঁড়ায়। চাল পেতে উদগ্রীব বছির ফুলজানের ক্ষুধার কথা ভেবে জামাল বেআইনি লাইনে দাঁড়ায়। পুলিশ আটক করলে ধর্মদাস তাকে কথা দেয় সে যেন স্ত্রী পুত্রের জন্য না ভাবে। বছিরকে কোলে নিয়ে বলে —"তোমারে ভাবিতে হল না মিঞা," হামার যদি খাওয়া জোটে তা হইলে তোমার ছাওয়াল খাইবে।" বৃদ্ধ জামাল বলে — "আল্লা তোমার রহম (ভাল) করিবে" বললে ঈশ্বরের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে অবজ্ঞায়। রাতে রঘুনাথ চৈতনের গুদাম থেকে একবস্তা চাল চুরি করে রেখে আসে ধর্ম্মদাস। দারোগা হাতকড়া পরায় জামালকে চাল চুরির অপরাধে। ইতিমধ্যে বছিরদ্দি টেপুঁর (জামালের শিশু কন্যা) মৃত্যু সংবাদ আনে। জামাল জানায় সে চাল চুবি করেনি, "একজন দিছে হুজুর"। শত অত্যাচারেও জামাল তার নাম করেনা। শেষে "জামাল (দৃঢ় কণ্ঠে) হুজুর আমি মুসলমান ইমান ছাড়িবার নই"— বলে ইমানদারীর অহংকার দেখায় জামাল। ধর্ম্মদাস একার ইমানদারীতে ক্ষুব্ধ হয়ে হিন্দুর ইমানের প্রমাণ রাখতে সব অপরাধ স্বীকার করে। নির্দোষ জামালকে ছেড়েদিতে অনুরোধ জানায়। এদের 'ইমান' দেখে সমাজের শয়তান মানুষের চরিত্র পাল্টে যায় বিবেকের দংশনে। জামাল ধর্ম্মদাস মুক্ত হয় — একজন অন্যজনকে জড়িয়ে ধরে বাড়ীর পথে পা বাড়ায়।

খ) 'ছেড়াঁ তার' (১৯৫০) : তুলসী লাহিড়ীর শ্রেষ্ঠ কীর্তি "ছেঁড়া তার"বিশেষত বর্তমান ক্ষেত্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নাটক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় দুর্ভিক্ষ ও ভয়াবহ মন্বন্তরের পটভূমিতে আঁকা একটি গ্রাম নাটকের 'মূল নায়ক'। সাধারণ কৃষক জীবনের বিপর্যস্ত মর্মন্তুদ চিত্র নাটকে প্রতিফলিত। 'দুঃখীর ইমান' অপেক্ষা "ছেঁড়াতার"-এ গভীর জীবন সমস্যার বাস্তব বাঙ্ময় রূপ চিত্রের প্রতিনিধিত্বে রহিম-ফুলজানের জীবনের অর্থ-সামাজিক ও আত্মিক অপচয়ের শোচনীয় পবিণাম তিনটি অঙ্কের নয়টি দৃশ্যে বিবৃত হয়েছে। আর এ কাহিনীর সাহায্যে নাট্যকার মুসলমান সমাজচিত্রের মধ্যে ঐশ্লামিক অনুশাসনের গভীরে পর্যবেক্ষণ চালিয়েছেন। যার তুলনা

অনেক অনেক নাট্যকারের রচনাতেই নেই।

এককালে 'ফ্রি স্টুডেন্টশিপ' পাওয়া 'ফাস্ট' বয় রহিম এসরাজ বাদক। বর্তমানে মহাজনী পেষণে জমি হারিয়ে, স্কুল ছেড়ে লাঙল ধরেছে। গ্রামের মেয়ে ফুলজানকে বিয়ে করে বছিরের বাপ রহিম কায়িক শ্রমে দিন কাটায়। কলকাতায় বাল্যবন্ধু মহিমের বাসায় এসে বাল্যকালকে ফিরে পায় দুজনে। তাদের কথাতে মুসলমান সমাজের বাস্তব চিত্র স্পষ্ট। পুষ্পপ্রেমী রহিমের খেদোক্তি "গেরামে ত কতয় জমি। কিন্তু মানুষ ফুলগাছ লাগায় না। হেঁদু বাড়ী, ঠাকুর পূজা বলিয়া দুটা একটা থাকে, কিন্তু হামার মুছলমানের জুম্মা ঘরে পাতাবাহার ছাড়া আর কিছুই নাই।" সে "আহম্মদ টাহম্মদ" হয়নি, কারণ — "সময় পাই নাই, ... টাকা পাইসা হইলে, খাটুনী কমিয়া অবসর হইলে, ঐসব মান বাড়াবার ফায়দা করা। খাইটতে আমার দিন গেল।" শেষে বন্ধুর দেওয়া দিলরুবা ও ছেলে-বৌ এর জামা জুতো নিয়ে গ্রামে ফেরে রহিম।

যুদ্ধের প্রকোপে গ্রাম জীবনে যুদ্ধের চাঁদার চাপ বেড়েছে। আদায়কারী জোতদার হাকিমদ্দির বিরুদ্ধে গ্রামবাসী ক্ষুব্ধ — নেতৃত্বে রহিম। এসময় হাকিমের গরু রহিম খোঁয়াড়ে পাঠালে শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি হাকিমদ্দি রহিমকে প্রতিশোধ নিতে চোর সাজাতে চায়, ব্যর্থও হয়। হাকিমদ্দির চাকর কুকরার কাজের গাফিলতিতে "ফজরের নমাজ" এর; "ফুলবিবি..........বড়বিবি" ইত্যাদিতে মুসলমানের একাধিক পত্নী রাখার কথা। রহিমের ব্যঙ্গ ভরা শ্লোকে মুসলমান হাকিমদ্দির পরিচয় — "রোজা নামাজ সবই আছে মনটা খালি ফায়দাতে" । হাকিমদ্দি রহিম বিরোধে "হাজীর" আগমণে মুসলমান সমাজ। মুসলমানের পাঁচটি 'ফরজ' বা অবশ্য কর্তব্যের শেষটি হজ্ব, যাঁরা হজ্ব করে ফিরে আসেন তারাই 'হাজী' নামে অভিহিত হন। জাম্বুবানের গানেও শ্রেণী বৈষম্য ও হিন্দু - মুসলমানের সমাজচিত্র— "নিজের মুরাদ ফুরাইছে তাই আশায় করি পূজা / দরগায় কেউ সিন্নি চড়াই কেউ বা রাখি রোজা।/ মসজিদে মন্দিরে ভাইরে নিত্য কুটি মাথা / কালি হরি খোদা কিন্তু কয়না কথা/ দাড়ীওয়ালা মৌলবী আর ঠাকুর টিকিধারী / ব্যবসা করি প্যাটটা চালায়......" ইত্যাদি। সমাজের উঁচুতলার লোকেরা 'আল্লা' কে ফাঁকী দিয়ে প্রেসিডেন্ট হয়, 'কুকাম' করেও পার পেয়ে যায়। গরীবেরা শুধু অত্যাচার সহ্য করে 'গোরে' অর্থাৎ কবরে শুয়ে থাকে। — এ চিত্র শুধু মুসলমান নয়, শ্রেণীবিভক্ত মানব সমাজের চিরন্তন চিত্র। 'কিয়ামতের দিন' অর্থাৎ পরলোকে বিচারের দিন অন্যায়কারীর বিচার হয় না। "দয়ার সাগর রসুল" শাস্তি দিতে পারেন না। গরীবেরা "অন্নের জ্বালায় হাজার কামে রোজা নামাজ খেলাপ" করে। এসবে রহিমের ভয় নেই। তার দৃপ্ত সংলাপ—" মিছা ভাবিত হইস্ না। হামারা ভয়ে মরি। আর, তাতে ঐ শয়তানগুলা আস্কারা পায়। কারবালা ময়দানে

জান দিয়া হামার হুসেন দ্যাখেয়া গেইছে যে বেইমানের যতই হিম্মৎ হউক মুসলমান আগে শির ঝুকাইবে না''(১/২)। রহিমকে চোর বলে দারোগা ধরতে এলে সাহসী রহিম ''খোদার মেহেরবাণী'' কেই ''মুস্কিল আসান'' ভাবে ধার্মিক মুসলমানের মতই। কেননা সে হাজীর নিকটে জেনেছে ''ইমান ঠিক থাকিলে'' কোন ক্ষতি হয় না। আবার গ্রামে খাদ্যের হাহাকার দেখা দিলে রহিম সকলকে সংঘবদ্ধ করে; স্ত্রী ফুলজান ও পুত্র বছিরকে স্ত্রীর ফুফা বা পিশেমশাই এর বাড়ী রেখে আসে। নতুন প্রেসিডেন্ট ও হাকিমদ্দি রিলিফ বন্টনের দায়িত্ব পায়। ''সেলাম আলেকুম'' এবং ''আলেকুম সেলাম'' জানিয়ে পরষ্পর শোষণের অঙ্ক কষে। ফাঁকা বাড়ীতে রহিম হিন্দু প্রতিবেশী শ্রীমন্তের দেওয়া শুকনো চিড়ে খেয়ে পেটের জ্বালা কমায়। কিন্তু এসময় বিতাড়িত ফুলজান বছিরকে নিয়ে অভুক্ত অবস্থায় ফিরে আসে। রহিম তাদের শুকনো মুখ দেখে হাহাকার করে ওঠে। অবশেষে হাকিমদ্দির লঙর খানায় পাঠায় তাদের। কিন্তু চৌকীদারী ট্যাকস্ দেয় বলে তারা শূণ্য হাতে ফিরে আসে। হাকিমদ্দির এই প্রতিশোধে ক্রুদ্ধ, জ্ঞান শূন্য হয়ে দিশেহারা রহিম হাকিমদ্দি কে জব্দ করতে ও স্ত্রী পুত্রের মুখে খাবার তুলে দিতে স্ত্রীকে ''তালাক নামা'' লিখে দেয়। ফুলজানের খাবার মেলে। ''অ্যায় যেমন কায়দা করি মাইরবার চায়, মুই ও বুদ্ধি করি বাচাইমো।'' ভবিষৎ চিন্তা না করে এ পথ সে বেছে নেয়। যদিও এভাবে 'তালাক নামা' লিখে দিলেই তা ইসলাম সিদ্ধ হয় না, তবে নাট্যকার নাট্যগতি রাখতে এইভাবে চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে এসেছেন। মুসলমান সমাজে যথার্থ 'তালাক' পদ্ধতি উত্তরবঙ্গে বাস কালেই তুলসী লাহিড়ী জেনেছিলেন, এ অনুমান অসংগত নয়।[১৬] শেষে স্ত্রীকে দু'মাসের জন্য রেখে কলকাতার উদ্দেশ্যে বছিরকে নিয়ে যাত্রার উদ্যোগ করে। ফুলজান এখন তার ''জরু (স্ত্রী) নয় লঙর খানায় খেয়ে সে বাঁচুক, দু'মাস পরে বছিরকে নিয়ে তার হাতে তুলে দেবে। প্রতিকুল শক্তির প্রবল নিষ্পেষণে দুটি হৃদয় মুহূর্তে হাহাকারে পূর্ণ হয়ে ওঠে; সেই ট্রাজেডির অপরিমেয় বেদনার প্রকাশ ফুলজানের একটা কথাতে — ''ঘর আর মোর ত লয়।'' তবুও 'খোদা' তাকে পরীক্ষা করছে এই বিশ্বাসে অটল থাকে রহিম।

রহিম কলকাতায় বন্ধু মহিমের কাছে পুত্র নিয়ে বাস করে, মহিমের অফিসে কাজ করেও মানসিক শান্তি নেই। তার জান-হৃদয় কলিজা ফুলজান শত্রু হাকিমদ্দির বাড়ীতে ''বাঁদী হয়ে আছে।'' ''জিয়া মোর নষ্টয় হয় গেইছে'', ছেলে মায়ের জন্য কাঁদে কিন্তু 'হদীজের' নিষেধ; মুসলমান হয়ে তা অমান্য করতে পারবে না। তবুও দেশে যাবে। নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত সে নিজেই করবে। ধর্মের এই অনুশাসন কে তুচ্ছ করে ফুলজানকে এনে তাদের মিলন ঘটাতে চেয়ে মহিম ব্যর্থ হয়েছে, মুসলমান

১৬। 'তুলসীবাবু উত্তরবঙ্গে বাস কালে রঙপুর জেলার নলডাঙা গ্রামে হিন্দু মুসলমান চাষীদের মধ্যে গভীরভাবে মিশেছিলেন, মুসলমানের জীবন, ধর্মাধর্ম পুস্তক পাঠ ও বাস্তব জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি নিজেই আমাকে একথা বলেন।'— সাক্ষাৎকারে - দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় - ১২.৪ ৮৮।

হাদীসের প্রতি নিষ্ঠাবান রহিমের চিন্তার কাছে। মহিমের যুক্তি হাদীস রচনার পর অনেক কাল কেটে গেছে, যুগের পরিবর্তন হয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিস্থিতি ও সামাজিক দায়ে পড়ে রহিম যে কাজ করেছে, তার প্রতিকারে তালাক প্রাপ্তা (যা ইসলাম অনুসারে ঘটেনি) স্ত্রীকে গ্রহণ করলে 'আল্লা' অখুশী হবেন না। কিন্তু রহিম তার বিশ্বাসে অটল। অবশেষে রহিম গ্রামে ফিরে হিন্দু মুসলমান প্রতিবেশীর কল্যাণে ফসল ঘরে তুলেছে। কিন্তু পুত্র বছির মায়ের অবর্তমানে মৃত্যু পথযাত্রী। মাকে ফিরে পাওয়া ধর্মের বাধায় সহজ নয়। কারণ "মোর সাথে আব তার নিকা হবার নয়। .... হদীজে এইমত ল্যাখা আছে। আর কেউ যদি তাকে নিকা করি তালাক দ্যায়, তার তিনমাস দশদিন বাদে .... হামি তাকে নিয়া নিকা কইরবার পারি।" মহিমের কাছে বলা এই নিকাহর ব্যাখ্যা। পরে গ্রামে শ্রীমন্তরা কানা ফকীরের সঙ্গে ফুলজানের নিকে ও তালাক দিয়ে হাদীসের নিয়মরক্ষা করে ফুলজানকে রহিমের গৃহে ফিরিয়ে আনতে চায়। বলা বাহুল্য, এই চুক্তিজাত নিকাহ্, তালাক অনৈশ্লামিক। কিন্তু এ পথেও বাধা হয়ে দাঁড়ায় ভণ্ড ধার্মিক হাকিমদ্দি। ফকীরের সঙ্গে চুক্তির নিকাহ বন্ধ হয়। কেঁদে ওঠে মায়ের জন্য অসুস্থ বছির — রহিম ফুলজানকে আনতে ছোটে। ধর্মপ্রাণ, রহিমের কাছে এসময় ধর্মের শুষ্ক মূল্য অপেক্ষা অনেক বড় সন্তানের প্রাণ। হাকিমদ্দি 'হদীজ' খেলাপ হবার কথা মনে করিয়ে দিলেও ফুলজানকে জোর করে টানতে টানতে নিয়ে আসে রহিম।

তখন অপাপবিদ্ধা ফুলজান ছেলের জন্য ব্যাকুল- ধর্মের নিষেধের দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত। কিন্তু জয়ী হয় মাতৃ হৃদয়। সে মুহূর্তে রহিমের হাহাকার— "মুই তোকে খালি দুঃখয় দিছি।" সে তাই ঠিক করে স্ত্রী পুত্রকে রেখে দূরে চলে যাবে — তাহলে হদীজ খেলাপ হবে না। কিন্তু ধর্মের বিধানে ফুলজান রহিমের বাড়ী থাকতে পারেনা। একথা শুনে ছেঁড়া ধনুকের মত উত্তেজিত রহিমের জিজ্ঞাসা সমাজের কাছে— "নিকার নামে বেইজ্জৎ হইলে হদীজ খেলাপ হয় না। ছাওটাকে বাঁদীর বাচ্চা বানাইলে হদীজ খেলাপ হয় না। যে মানুষটা একটি মুখের কথা থাকি বাঁচে তার জিউটা দুই পায়ে থেতলাইলে হদীজ খেলাপ হয় না — না?"(৩/৩)। হাকিমদ্দিকে বলে "তোমার হদীজ ধরি তুমি বেহেস্তে্ যান মুই খেলাপ করি জাহান্নামে যামো।" কিন্তু ফুলজান ধর্মের ভয়েই স্বামীর সঙ্গে কথা বলে না। রহিম ভুলের জন্য স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইলে "(ফুলজানের বুকের ভিতরে মুচড়ে উঠতে লাগল। কথা কয়ে পাছে হদীজ খেলাপ হয় সেই ভয়ে দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে রইল)"। রহিম কথা বললে "গুণাহ্ হয়! তোর হৃদয় "কাবার তসিরখানা গড়েয়া যে পাথর বাঁচছিল, তাই দিয়া তোর দিল গড়াইছে"। ফুলজান এতে একবার তাকিয়েছে মাত্র নীরবে। শেষে রহিম ঠিক করে তাদের নিয়ে দেশ ছাড়বে। ফুলজান 'গুণাহ' হবার কথা বললে রহিমের উক্তি

— "আচ্ছা, গুণাহগারের আখেরী কথাটা শুনি রাখ। এইটাই তোর ঘর। তোর ছাওয়াল নিয়ে তুই এইঠেই থাকবু। .... খেলাফৎ যা দেওয়া লাগে মুই দেমো — হা আল্লা", বলেই হাহুতাশ করতে করতে বন্ধুর দেওয়া দিলরুবার কান মচড়াতে গিয়ে উত্তেজনার বলে তার ছিঁড়ে ফেলে, এরপর শোনা যায় তার আর্ত হাহাকার— "আল্লা মোর যন্তর বাজিল না। ছুটে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে। গ্রামবাসী শয়তান হাকিমদ্দিকে পিটিয়ে জব্দ করে, ফকীরের সঙ্গে পূর্ব পরিকল্পনা মত ফুলজানের নিকা ও তালাকের ব্যবস্থা করে। কিন্তু শ্রীমন্ত আবিষ্কার করে রহিম বদ্ধ ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে স্ত্রী পুত্রকে বাঁচানোর জন্য। জনরোষের মুখে পড়ে হাকিমদ্দি। ফুলজান বুক ফাটা আর্তনাদ করে আছড়ে পড়ে রহিমের মৃতদেহের উপর, 'কফনে'র করুণ সুর বেজে ওঠে। শ্রীমন্ত ঘোষণা করে আজ রহিম ফুলজানকে বৌ কায়েম করেছে, পুত্র বাঁচিয়েছে "খোদা উয়াকে দয়া কইচ্ছে। অ্যাঁয়—জুড়াইছে—"। শুনে "(ফুলজান ধীরে ধীরে উঠে...... বিহ্বল দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বল্‌ল) জুড়াইছে? জুড়াইছে? আল্লা! অ্যয় কি জুড়াইছে?" এর উত্তর কেউ না দিলেও, নাট্যকার বন্ধনীতে লিখেছেন— "এর উত্তর কিভাবে, কি ভাষায় কেমন করে সর্বশক্তিমান শোনাবেন — জগৎ আজ তাই জানবার জন্য উৎকণ্ঠায় উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।"

রহিমের অর্থনৈতিক, পারিবারিক, আত্মিক বিপর্যয়ের বিষাদময় পরিণতি এনে নাট্যকার— বিষয়-ধর্মের মধ্যে কায়েমী স্বার্থের চক্রান্ত ও মানুষের আত্মিক অপচয়ের শোচনীয়তা এবং মনুষ্যত্বের অপরাজেয় মহিমাকে ভাস্বর করেছেন, নাটকের শেষে 'মান' ও 'হুস' রাখতেই রহিমের আত্মহত্যা। অন্যদিকে ফুলজান এক অপাপবিদ্ধা, সারল্যের বৃন্তে প্রস্ফুটিতা নারী। ধর্মের সংস্কার সে সরল প্রাণে অতিক্রম করতে পারেনি, তার রক্তাক্ত হৃদয় শুধু নিরুপায় আর্তনাদ করেছে। ছেলেকে নিয়ে স্বস্তি পেয়েও সংস্কারচ্ছন্ন হ'য়ে রহিমের ডাকে সাড়া দিতে পারে নি। তবুও সে প্রশ্ন তোলে তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে রহিম সে পথ বেছে নিয়েছে— তাতে কি সত্যই সে শান্তি পেয়েছে?

অন্যদিকে ধুরন্ধর, কপট, মিথ্যাচারী হাকিমদ্দি ধর্মের ভান করেও ধর্মপ্রাণ, তারই কৌশলে রহিম- ফুলজানের জীবনে চরম, নিদারুণ পরিণতি নেমে এসেছে। স্মরণীয় হাদীস মতে একবার উচ্চারণে বা একবার 'তালাক' লিখে দিলেই তা হয় না। তিনমাস সময় দরকার। কিন্তু নিষ্পাপ জীবন যন্ত্রনার এ চিত্রে নাট্যকার সমাজ বিধানের চোখে তর্জনী তুলেছেন। গোটা সমাজ কে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। 'হদীজ' নিয়ে রহিম যে প্রশ্ন তুলেছে তা শুধু মুসলমান সমাজের কাছেই নয়— ধর্ম বা সামাজিক বিধানে সর্বদাই এই রূপ বলি হচ্ছে। রহিম তো সত্যিই ফুলজানকে তালাক দিতে চায় নি। তালাক দিয়েও দুজনেই পরস্পর হৃদয় তন্ত্রীতে

ছিল বাঁধা। পরিস্থিতির পাঁকে পড়ে মুহূর্তের ভুলে ধর্মের শাসানির বলি হয়েছে সে। রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' কবিতার পঙ্‌ক্তি এ প্রসঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে মনে পড়ে—
"শুধুই শুনেছ ঠাকুর মুখের বারতা, / শোননি কি জননীর অন্তরের ব্যথা?" তাই বলতে হয়, 'ছেঁড়া তার' নাটকে সমকালীন সমাজের যে সামাজিক বাস্তবচিত্র এসেছে, শুধু নাটক কেন, বাংলা সাহিত্যে সে চিত্র বিরল। রহিম ও ফুলজান শুধু মুসলিম দম্পতিই নয়, দুটি চিরন্তন নরনারী; আর তাদের আনন্দ বিষাদও মানবিকতায পূর্ণ।
গ) 'বাংলার মাটি' ঃ বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গের জীবনসমস্যার নানা দিক এখানে স্পষ্ট। নাট্যকার তাঁর অভিজ্ঞতাপুষ্ট সমাজজীবনের চিত্রকে হিন্দু-মুসলমান সমাজের আলোচনায় ফুটিয়ে তুলেছেন — যদিও বাঙালীত্বই বড় হয়ে উঠেছে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। নাট্যকারের বাহন আদর্শবাদী আবুসাহেব। সমকালীন সমস্যা অবলম্বনে জীবন জিজ্ঞাসা ও শাশ্বত মূল্যবোধ নাটকটিকে উজ্জীবিত করেছে। দেশভাগের পর আতঙ্কিত হিন্দু-মুসলমানের কাহিনীতে আবুমিঞা প্রায় দার্শনিক রূপে উপস্থাপিত। এছাড়া সোলেম মিঞা, গরীবুল্লা প্রমুখ মুসলমানদের কেন্দ্র করে তাদের সমাজ পরিচয় যথেষ্টই রয়েছে। পরে নাটকটির বিস্তারিত আলোচনার রসদ রয়েছে (এটি ১৯৫০ এর পরে রচিত)। উল্লেখ্য ধর্মাধর্ম অপেক্ষা এখানে হিন্দু মুসলমানের ঐক্য চিত্র গুরুত্ব পেয়েছে।

তুলসী লাহিড়ী যুগান্তর শিল্পী, জীবনবাদী নাট্যকার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলার সর্বগ্রাসী তাণ্ডবলীলার মধ্যে নানা ভয়াবহতা ছাড়াও, দেশ বিভাগ জনিত সমস্যা যে শোচনীয় বিপর্যয় আনে তা দেখিয়েছেন নাটকে। মুসলমান সমাজও ঐশ্লামিক অনুশাসনের গভীরে প্রবেশ করেছেন এই হিন্দু নাট্যকার। রহিম ফুলজানের জীবন বিপর্যয় ধর্ম ও সামাজিকতার যূপকাষ্ঠে বলি হয়েছে। তাতে 'হাদীসের'র বিধান সামাজিক আচরণে ঘাতকরূপে উপস্থিত। 'দুঃখীর ইমানে'ও ইমান বড় হয়েছে জামালের, ধর্ম্মদাসেরও। নাট্যকারের হাতে মুসলমান সমাজ- ইসলামের অনুশাসন গভীরভাবে উপস্থিতই শুধু হয়নি, হিন্দু মুসলমান সমাজকেন্দ্রিক জীবন সমস্যার জলন্ত রূপকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'বাংলার মাটি'র ভূমিকাতে নাট্যকারের সেই মানসিকতাও প্রকাশিত।[১৭]

৮। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকে মুসলমান ঃ

প্রথিতযশা দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান পর্বের স্মরণীয় নাট্যকার। নতুন ধারায় নাট্য রচনার কালে নাট্য সাহিত্যে সমাজ বিজ্ঞান সম্মত রিয়ালিস্টিক ও জীবননিষ্ঠ

১৭। বাংলাভাগের পর থেকে যা দেখেছি শুনেছি ভেবেছি তাই দিয়ে নাটক সাজিয়েছি .... সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে আমার চিন্তায় যতটুকু পেয়েছি তারও একটু ইঙ্গিত .... তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।"— ভূমিকা 'বাংলার মাটি'— তুলসী লাহিড়ী।

যে নাট্যরীতি গড়ে ওঠে তার প্রথম প্রয়াস দিগিন্দ্রচন্দ্রের লেখনীতেই দেখা যায়। ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর নাটক লেখা শুরু হলেও পরিণত বয়সের রচনা 'অন্তরাল' (রচনাকাল ১৯৩৯-৪১)[১৮] সেই সাক্ষ্য দেয়। ঢাকা জেলার আদাবাড়ী গ্রামে জন্মে সারাজীবন (১৯০৮ - ৫ই জুলাই থেকে ১৯৯০ - ১২ই এপ্রিল) সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কাটান। স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় যোগদান কারাবাস, পরবর্তীকালে সুবিখ্যাত বাংলা ইংরেজী দৈনিক সাময়িক পত্র পত্রিকাতে সাংবাদিকতা, সম্পাদনা, মননশীল- তাত্ত্বিক রাজনৈতিক প্রবন্ধাদি রচনা সহ নানা গ্রন্থাদির রচয়িতা রূপে আত্মপ্রকাশ ঘটান। জীবনে বিভিন্ন আক্রমণের বাধা শুধু নয় তাঁর নাটক গুলিও বারংবার দেশী বিদেশী শাসকের হাতে আক্রান্ত হয়েছে। প্রতি পদক্ষেপের 'ঝুড়িঝুড়ি' বাধাকে নস্যাৎ করে দিগিন্দ্রচন্দ্র পূর্ণাঙ্গ, একাঙ্ক, শিশুনাট্য মিলিয়ে ৭৫টির বেশী নাটক রচনা করেন। দেরীতে হলেও দেশী-বিদেশী অনেক পুরস্কারে সন্মানিত হ'ন। যদিও তিনি মনে করতেন "মানুষের ভালবাসার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার" কোন পুরস্কারের আশায় আমি কিছু লিখিনি।"[১৯] গোর্কির 'মা' উপন্যাসের নাট্যরূপ, নীলদর্পণের পুণর্নবীকরণ, বিদগ্ধ মহলে সমাদৃত, "নাট্য চিন্তা : শিল্প জিজ্ঞাসা"[২০] গ্রন্থাদি ছাড়াও অসংখ্য প্রবন্ধাদি পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থে ছড়িয়ে রয়েছে। এছাড়াও দিগিন্দ্রচন্দ্র ছিলেন কবিমনের অধিকারী, একসময় কবিতা লিখেছেন, পববতীকালে তাঁর নাটকের সংলাপে তার পরিচয় মেলে। সুধীপ্রধানের সহযোগিতায় ১৯৪৬-এ গণনাট্য সংঘে যোগ দেন। প্রথমে নাট্যশাখার সম্পাদক পরে অনেকদিন (১৯৫৮-৬৪) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি রূপে কাজ করেন। সর্বোপরি দিগিন্দ্রচন্দ্র নাট্যকার, অভিনেতা, নাট্য পরিচালক, নাট্য আন্দোলনের সংগঠক ও নাট্য সমালোচক। বার্ধক্যে উপনীত হয়েও তাঁর সচেতন মানসিকতার বলিষ্ঠ চিন্তা, লেখনী থেমে ছিলনা শেষদিন পর্যন্ত; তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনী সম্পূর্ণ হ'লে, বিরাট হৃদয়ের সংগ্রামী এই মানুষটিকে আরো জানা সহজ হত। তবে যা পেয়েছি তাই চিরন্তন। আমরা তাঁর মতানুসারে ও আমাদের বিচার অনুসারে তিনটি নাটকই আলোচনায় গ্রহণ করেছি। 'তরঙ্গ', 'বাস্তুভিটা', 'মশাল'। নাটকত্রয়ে বাঙালী জীবনের বিপর্যয়ের সাক্ষ্য, দেশভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-র মধ্য দিয়ে মুসলমান সমাজ পরিচয় প্রভৃতি যুগমানসের বাস্তব চিত্র রয়েছে। নিপুন শিল্পীর মত তাঁর চিত্রগুলি অঙ্কিত হয়েছে। যুক্তির দ্বারা সংযত কাহিনী, চরিত্র, সংলাপে তা ফুটে উঠেছে।

ক) 'তরঙ্গ' (১৯৪৬) : 'তরঙ্গ' বাংলা সাহিত্যের বাতায়নে গভীর অর্ন্তদৃষ্টির নিরিখে বাস্তব চিত্রায়ণের স্পষ্ট এক উড়ন্ত পর্দা। সমকালীন রাজনীতির প্রকাশে,

---

১৮। নাট্যকারের বাসভবনে স্বয়ং দিগিন্দ্রচন্দ্র বলেছেন।

১৯। কলকাতা দুরদর্শনের সাক্ষাৎকারে নাট্যকার।

২০। মৃত্যুর প্রাক্কালে প্রকাশিত দিগিন্দ্রচন্দ্রের অতিসংক্ষিপ্ত পরিচয়' — প্রকাশক তাঁর পরিবার।

হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবরকম অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। গোপাল-মহিউদ্দিন একাকার হয়ে গেছে। নাট্যকার ছোট ছোট চিত্রকল্পে সংলাপের গভীরতায় সম্প্রদায়কে ছাড়িয়ে জাতীয়তা, আর্ন্তজাতিক বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ সর্বোপরি মনুষ্যত্বের উন্মেষ ঘটিয়েছেন। এ চিত্র বাংলা নাটকে উল্লেখযোগ্য। ১৯২১-৪৬ এর বিদ্রোহ পর্যন্ত ইতিহাস নাটকে এসেছে। গান্ধীজীর অহিংসপথ একমাত্র পথ নয়, আর অর্থনীতিই স্বাধীনতার আন্দোলনের রূপ নেয়; সেটাতেই শ্রেণী শোষণ ও সংগ্রাম । নন পলিটিক্যাল মানুষ কিভাবে সংগ্রামে আসছে তার প্রকাশ নাটকে ঘটেছে, ভালবাসা 'সম্প্রদায়' মানে না — এটা বোঝতেই মঞ্জরী মহীউদ্দিন। পরাধীন ভারতবাসী স্বাধীনতা কামনায় উদ্বুদ্ধ, উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ। অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি- জমিদার, পুলিশ, ইউনিয়ন বোর্ডের শোষণ— চরম অত্যাচারের প্রতিরোধে আগুয়ান হিন্দু-মুসলমান। এরই মাঝে মঞ্জরীকে নিয়ে সাম্প্রদায়িকতার উস্কানী। দক্ষিণ পন্থার সঙ্গে বাম পন্থার আদর্শগত দ্বন্দ্ব। শেষে কমিউনিস্ট আন্দোলনের পতাকা তলে সাম্প্রদায়িকতা কে দলে পিষে সকলের মিলিত প্রয়াসে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বানে নাটকের সমাপ্তি। এই কাহিনীর মধ্যে মুসলমান সমাজের পরিচয় রয়েছে বিভিন্ন ভাবে। 'তরঙ্গ' চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে একশ্রেণীর সুকৌশলী সাম্প্রদাতিকতার ধ্বজাধারীদের হীন কূটীল মানসিকতাকে। নাট্যকার টুকরো টুকরো ঘটনায় ছোট ছোট চিত্রকল্পে বিশালতা এনেছেন, সংলাপের শব্দযোজনার সূক্ষ্মতায় আঞ্চলিক ভাষার মোড়কে নাটক ঐক্যকেই খুঁজেছে। ভেদাভেদের উর্দ্ধে 'মনুষ্যত্ব' জাতীয়তা — আর্ন্তজাতিক বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধের আকর হয়েছে।

চারটি অঙ্কের ১৬টি দৃশ্যে বিধৃত 'তরঙ্গ' তে মুসলমান চরিত্র-গ্রামবাসী ছাড়াও জোতদার রজ্জব ব্যাপারী, গ্রামের কৃষক মাইনুদ্দিন, শেরালী, মহীউদ্দিন জাতীয়তাবাদী মুসলমান যুবক, দফাদার চেরাকআলী প্রমুখ। রজ্জব ব্যাপারী হিন্দু তালুকদার বিপিন ঘোষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রশাসনকে সঙ্গে নিয়ে শোষণে লিপ্ত। কিন্তু তবুও তার মধ্যে মুসলমানের প্রতি স্বাভাবিক দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করা যায়। নবজাগ্রত স্বাধীনতা স্পৃহা পূর্ববঙ্গের সুদূর পল্লীতে যে নতুন শক্তি জাগিয়েছিল তাতে "নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু মুসলমান সংগ্রামের বৈদ্যুতিক শক্তি শিরায় শিরায় অনুভব করেছিল। এদের সংগ্রাম দানা বেঁধে উঠেছে তালুকদার, ইউনিয়নের জোর করে 'তোলা' আদায়কে কেন্দ্র করে। এই অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে যখন গ্রামবাসী ঐক্যবদ্ধ হতে চাই তখন শোষক শ্রেণী বিট্রিশের কূটকৌশলের ন্যাষ হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ সৃষ্টি করতে সূচনা করে সাম্প্রদায়িকতার। শশীবাবুর অহিংস নেতৃত্বে প্রথমে সাধারণ সমবেত, পরে তার পুত্র অমরের নেতৃত্বে তারা সংগ্রামে লিপ্ত। এরই মাঝে মিস্ত্রী গোপাল মহীউদ্দিনের মত

উদার কর্তব্য পরায়ণ যুবককে নিয়ে চিন্তা করে "মহীর মতন পোলা কমই দেখা যায়। ও যদি মুসলমান না অইয়া ইন্দু অইত ...." তাহলে হয়ত একমাত্র মেয়ে মঞ্জুর সঙ্গে বিয়ে দিত। মঞ্জুও মহীউদ্দিনের প্রতি আকৃষ্ট ছিল তার প্রমাণ মেলে আহত অবস্থায় গগন চৌকিদারকে দেখে "মহীদা"! উচ্চারণে। আবার গোপালের ছেলে নন্দা 'সৈন্ন'র গুলিতে মারা গেলে মহীউদ্দিন হাঁউমাউ করে কেঁদেছে যেন নিজের ভাই মৃত; এটাই আন্তরিক মানবিকতা। ভালবাসা যেমন, তেমনি আবেগও সম্প্রদায় মানেনা। গোপাল মহীকে সম্মান করে 'কুটুম' 'গোয়াতি' বলে নয় সময় অসময়ের সে বন্ধু, "বালমন্দ সব কাজেই তার পরামর্শ লই।" রজ্জব ব্যাপারীর বাড়ী হিন্দু-মুসলমান তোলা বন্ধ নিয়ে মিটিংএ বসে। এসময় বড়ভুঞা বিপিনের অত্যাচারী, রজ্জবের 'তমিজের গোস্ত' আদায়, 'আসের ডিম', 'লাউ' ইত্যাদি নিয়ে যাওয়াতে শেরালী, ফেলুর যন্ত্রনা যেমন স্পষ্ট, তেমনি রজ্জব বিপিনের শোষণ প্রকাশিত হয়। তাদের আন্দোলন রজ্জব কৌশলে স্তিমিত করতে চাইলে শশী এসে পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষের "বক্তাবলী চরের মিঞারা আর সাঁইপার চরের নমঃশুদ্ররা একত্র হয়ে" তোলা না দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জানিয়ে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করে। সাধারণ কৃষক মাইনুদ্দিন গোপালকে জানায় "তোমার পোলা নন্দারে বড়ভুঞা দইরা মারছে, তাতেও কি আমাগ কম লাগছে...... তোমার ছাওয়ালে আর আমার ছাওয়ালে কিছু তফাৎ আছে নাকি? ঐ মাইর আমাগ সকলের গতরে পড়ে নাই!" ইত্যাদি শুধু নয়; মাইনুদ্দিন শপথ করে—"জান কবুল ছোট ভুঞা। দরকার অয় বুকের খুন দিমু তবু জবানি নড়ব না। (নন্দাকে কাছে টেনে) আমার পোলা করিম আর নন্দার কোন তফাৎ নাই ছোট ভুঞা। এই আমি নন্দারে ছুইয়া খোদা তাল্লার নামে হলফ করতেছি, আমি যদি আমার জবানি না রাখি তবে য্যান্ জাহান্নামে আমার ঠাই অয়।" এখানে শুধু পুত্র জ্ঞান নয়; মুসলমানের খোদার নামে শপথ ও জাহান্নাম বা নরকের কথা ঘোষিত।

এদিকে অন্য মুসলমান রজ্জব ব্যাপারী সুযোগ সন্ধানী। আবার আপন সম্প্রদায়ের প্রতি দুর্বল। কিন্তু সে শয়তান শশীবাবুর সংলাপেই তার প্রকাশ — চাষীদের প্রতি শুধু অত্যাচারই নয়, "লাসটাকে গুম করে ফেল্লে" টাকা দিয়ে মিথ্যা সাক্ষীর সাহায্যে সে সাধু হয়েছে। বিপিনের কাছে রজ্জব তোলা বন্ধ আন্দোলনে গোপাল মিস্ত্রী উৎসাহ প্রকাশ করে আর "আমাদের গফফর মিঞার ছেলে — মহীউদ্দিন"(১/৩) এর মধ্যে বোধহয় আছে বলে জানাই। আবার দাঙ্গা হাঙ্গামার ভয়ও সে করে। মহীকে আন্দোলন থেকে সরিয়ে আনতে রজ্জব মুসলমানের সত্যবাদীতার কথা বলে, কেননা তারা সাধারণ লোকের আন্দোলন বন্ধ করতে মঞ্জু মহীকে ঘিরে দুর্নাম রটায় রজ্জবেরা, চেষ্টা করে মিথ্যে মামলা বাধিয়ে আন্দোলনকে

স্তব্ধ করতে। এক্ষেত্রে দারোগার কাছে রজ্জব "(মহীর কাছে এগিয়ে) মহী, ... সাচ্ছা কথা কও না। তোমারে মাইরা আগাম' বেবাক মুছুলমান সমাজেরই অপমান করছে। এইটা তোমার একলার ব্যাপার না, এর সঙ্গে আমাগ' সকলের মান জড়ান আছে"। কিন্তু কেউ মারেনি — জানালে রজ্জবেরা সৎ মহীউদ্দীনের কাছে পরাভূত হয়। চৌকিদার চেরাক আলী গরীব মুসলমান হয়েও পাঁকে রজ্জবদের পক্ষেই কাজ করে। কিন্তু কিছুতেই গণ আন্দোলন থেমে থাকে না। সকলে তোলাবন্ধ করতে শুরু করে, নারী পুরুষ নির্বিশেষে সশস্ত্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুলিশের লাঠিতে মাইনুদ্দীনের হাত ফুলে গেলেও দৃঢ়চেতা মুসলমান মাইনুদ্দীন বলে "শ্যাখের আড্ডি শক্ত আছে। অষুদ লাগব না .... এক আত ভাঙছে, আরেক আত ত রয়েছে। ২/৩-এ সার্কেল অফিসারের কথাতে উভয় সমাজ তথা সমকালের বাস্তব চিত্র রয়েছে বিপিন ও রজ্জবের দরকষাকষিতে — "রজ্জব ব্যাপারী বিপিনবাবুর মুখে খানিকটা বদনার পানি ঢেলে দিলেন আর বিপিনবাবু রেগে গিয়ে .... কমন্ডুলু থেকে এক গন্ডুষ জল ছুড়ে মারলেন।" "কিন্তু বঙ্গচক্রবর্তী জানিয়েছে "জাত বেজাত সব এক হয়ে গেল।" আজ আর কিছুই হবে না। মহীর সংলাপে রজ্জবের কাজকে কেন্দ্র করে মুসলমানের সমাজ অনুশাসন— "ব্যাপারী সাব লোকেরে ক্যাবলই কুবুদ্ধি দিতেছে। বলে, এই আন্দেলন ইন্দুগ, মুছলমানেরা এতে যোগ দিলে গুণা অইব। আমার নামে রটাইতেছে, আমি নাকি ইন্দুগ টাকা খাইয়া দালালি করতেছি" ইত্যাদি। কিন্তু দাঙ্গা, ধর্মশাষাণী সত্ত্বেও মাইনুদ্দীনরা প্রতিজ্ঞা করে "মরি মরুম। তবে' এ শয়তানের আড্ডা আমরা পোড়াইয়া দিমু।" তাই তারা জাতি- ধর্মের উর্দ্ধে উঠে আন্দালনে নেমেছে। প্রশাসন সৈন্য নামালে সকলে রুখে দাঁড়ায়। রজ্জব বিপিন স্বার্থ রক্ষার্থে হাতে হাত মেলায় অন্য দিকে গোপাল, অমর, নন্দর সঙ্গে ফেলু, মাইনুদ্দীন, মহীউদ্দীন এক হয়ে যায়। গুলীতে নন্দ প্রাণ হারালেও গোপাল ভেঙে পড়ে না, গুলী যাওয়া গোপাল মাইনুদ্দীনের কোলে মাথা রেখে 'ভোরের আলো'- র কল্পনা করে। ওপারে কৈবত্ত পাড়ায় মাইয়া মর্দ দাও কাচি খন্তা নিয়ে সৈন্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে শুনে মাইনুদ্দীন ওপারে ছুটে যায় — চারিদিকে গোলমালের শব্দ শুনে গোপালও বলে "তাই অইব, অমর, অয়ত্ত আমাগই জিত অইছে ..... মাইউদ্দীন, আমারে ঐপারে নইয়া চল। যেইখানে তমিজ, নিতাই, ...আমার নন্দা পরাণ দিছে, সেইখানে— সেইখানে যাইতে চাই।" অত্যাচারিত হিন্দু মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে "পূর্বগগনে ভোরের আলো দেখা দেয়" — নতুন সমাজের আগমণ বার্তায় নাটক শেষ হয়।

খ) 'বাস্তুভিটা' (১৯৪৭) : 'তরঙ্গ' পড়ে কবি - সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার 'বঙ্গদর্শনের জন্য একটি নাটক লিখতে নাট্যকারকে অনুরোধ করলে উৎসাহিত

দিগিন্দ্রচন্দ্র ১৯৪৭ এর ১৫ই আগস্ট রাত বারোটাই মানিকতলার মোড়ে হিন্দু মুসলমানের জড়াজড়ি দেখেন। '৪৬ এর দাঙ্গা আসলে কৃত্রিম, রাজনৈতিক খেলা, নীচুতলার মানুষ এর মধ্যে নেই, মুসলমানে ধর্মবোধ বেশী বলে মেজোরিটি তাকে সাপোর্ট করেছিল। গোপাল হালদার ফ্লাটে নাট্যকারকে মত দেন "আপনার এই সত্য অপেক্ষা আর বড় কিছু নেই।" আসলে এই বিভেদ মিথ্যা, এই সত্য প্রকাশ করতেই 'বাস্তুভিটা' রচিত হয়। নাটকের শুরুতে শেষ 'তরঙ্গের' মতই মূল চরিত্র ও পরিবারকে নিয়েই। পূর্ববঙ্গের গ্রামের পণ্ডিত মহেন্দ্র ও তার পরিবারকে ঘিরে নাটক। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য বাস্তুভিটার ভূমিকায় লিখেছেন — হিন্দু মুসলমানের সমস্যা ভারতের দুই রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান সমস্যা। কিন্তু হাজার বছর ধরে হিন্দু মুসলমান শান্ত ভাবে প্রতিবেশী রূপে বাস করেছে, আজ তা আমরা ভুলতে বসেছি। 'অথচ সে কথা না ভোলার পথেই রহিয়াছে সহজ সমাধানের পথ। 'বাস্তুভিটা' একটি ক্ষুদ্র নাটক সেই কথাই স্মরণ করাইতে চায়। আলোক বর্তিকা ক্ষুদ্র, কিন্তু অনেকখানি অন্ধকার দূর করতে সমর্থ'।

পূর্ববঙ্গের মুসলমান জনসাধারণ লীগ নেতৃত্বের চাপে যন্ত্রবৎ, কিন্তু মানুষ তাকে মেনে নেবে না। সেখানে উদার আমীন মুন্সী ফকিলদ্দির জয় হয়েছে, সংযুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচনে জিতেছে। "লীগ সরকার ভীত হয়ে 'বাস্তুভিটা' বাজেয়াপ্ত করেছিলেন, কিন্তু আমীন মুন্সী ফকিলদ্দিদের মেরে ফেলতে পারেননি। .... মহেন্দ্র মাষ্টার ও আমীন মুন্সীর মিলন অমর অক্ষয় হোক," — এই কামনা নাট্যকারের, সকলের। পূর্বপাকিস্থানে হিন্দুরা অত্যাচারিত হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে কলকাতায় মুসলমান নির্যাতিত। ইয়াসিন মিঞার মত কয়েকজন তার প্রতিশোধে পাকিস্থানের হিন্দুদের উপর অত্যাচার করে, ঘর লুঠ করে। কিন্তু ফকিলদ্দির মক্তবের আমীন মুন্সী এর বিরুদ্ধে, লীগ নেতা সোনা মোল্লা স্বার্থচিন্তায় থেকেও শেষে মানবতা বোধেই তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। অত্যাচারিত, অপমানিত মহেন্দ্র বাস্তুভিটা ছেড়ে চলে আসতে গেলে সকলে জোর করে বাধা দিয়ে সকলে তাকেই সেখানেই রেখে দেয়। জয় হয় মানবতার।

'বাস্তুভিটা' সাতটি দৃশ্যে রচিত। নাটকে মুসলমান কুশীলব সোনা মোল্লা অবস্থাপন্ন জাতের কৃষক, আমীন মুন্সী মক্তবের শিক্ষক, ইয়াসিন গ্রাম্য কুচক্রী লোক, ফকিলদ্দি, কেরামত, লতিফ গ্রাম্য চাষী ও আবাল মাঝি। এছাড়া একাধিক মুসলমান চরিত্রের কথা নাটকে স্থান পেয়েছে। দেশ ভাগ আরম্ভ হয়েছে। মহেন্দ্রর স্ত্রী মানদা ব্যস্ত, চিন্তিত, এদেশে থাকা যাবেনা ভাবছে। মোল্লা বাড়ীর ছেলেদুটো তার মেয়ে কমলার প্রতি কু-ইঙ্গিত করে মেয়েদের ওরা কোনদিনই সম্মান দেয়নি বলে দুশ্চিন্তা। কিন্তু মহেন্দ্র জানে "পাকিস্থান হোক, গোরস্থান হোক" এখানে এই বাস্তুভিটাতেই

থাকবে, যাবার জায়গা নেই। আমীন মুন্সীর চিন্তায় "পাকিস্থান না ফাঁকিস্থান"। আমীনের সঙ্গে মহেন্দর ভাব দেখে শহুরে যুবক শচীনের কাছে মুসলমান মাত্রই — "সাপকে বিশ্বাস করতে আছে মাষ্টার কাকা, তবু এজাতকে বিশ্বাস করতে নেই"। মুসলমানের অত্যাচার দেখাতেই দ্বিতীয় দৃশ্যের সৃষ্টি। সোন্না মোল্লার মেজো ছেলে খালেক মাষ্টারের গাছে জোর করে আম পাড়ার দৌরাত্ম্যে ক্রুদ্ধ মহেন্দ্র সোনা মোল্লার কাছে বিচারের জন্য যায়। স্বাভাবিক ভাবে ছেলেকে সমর্থন করেও মহেন্দ্র কে বলেছে বাস্তব কথা "তুমি দুটো চড় মেরে দিলেনা কেন?" মেয়ের দিকে তাকাবার অভিযোগ করলে মানুষের স্বাভাবিক সৌন্দর্য বোধেই মোল্লা বলেছে "বয়েসের সময় সুন্দরী মেয়ে দেখলে তুমি আমিও" ওরকম তাকিয়েছি। এতে ক্রুদ্ধ মহেন্দ্র সোনা মোল্লা কে ভুল বুঝে বিফল হয়ে ফিরে আসে। কিন্তু এই সোনা মোল্লাই ইয়াসিনের সাম্প্রদায়িক দৌরাত্ম্যে বন্দুক নিয়ে পথে নামে, মহেন্দ্রকে ভালবাসার শাসানিতে দেশে থেকে যেতে বাধ্য করে, রতনের জন্য আকালের মধ্যেও ধান নিয়ে আসে। পাকিস্তান হলেও সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেয় না। চায় না হিন্দুরা চলে যাক। আসলে 'সোসিও সাইকোলজিক্যাল' দৃষ্টিভঙ্গীর পবিচয় মেলে এখানে।

মহেন্দ্র দেশ ছাড়তে না চাইলে মানদার রাগের কথায় "পাঁচ ওক্ত নমাজ পড়ো আর গোস্ত খেয়ো .... যেদিন জোর করে কলমা পড়াবে সেদিন বুঝবে।" ইত্যাদিতে মুসলমান সমাজ পরিচয় প্রকাশিত। ২য় দৃশ্যে সোনা মোল্লার বাড়ীতে কেরামত না চাইলে কফিলদ্দি হিন্দুদের সঙ্গেই থাকতে চাই। 'হাদিস' 'নমাজ' এর কথা আসে। ক্রুদ্ধ মহেন্দ্রর কথায় মেয়ের দিকে দৃষ্টি দেবার প্রশ্নে সোনা মোল্লার "ঘরে দু'দুটো বিবি থাকতে" আবার 'সাঙ্গা' করার কথায় মুসলমানের একাধিক পত্নীর প্রসঙ্গ। সমস্যার মধ্যেও কফিলদ্দির খোদার উপর ভরসা "খোদার রহম না থাকলে কি আমরা বাঁচতাম। গাছে ফল ধরে, আসমান থেইককা পানি পড়ে, খ্যাতে ফসল ফলে—এই যে রাইত দিন অয়-সবই তো খোদার মর্জিতে" ইত্যাদি। তৃতীয় দৃশ্যে শচীন মহেন্দ্রর কথায় মধ্যে মুসলমান জাত বিশ্বাসঘাতক মোগলেরা সিংহাসনের জন্য বাপকে খুন করেছে ইত্যাদি ইতিহাস কে শচীন টানলে, মহেন্দ্র বলে "ইতিহাস তেমন পড়া নেই বাবা। কিন্তু এতকাল যাদের সঙ্গে বাস করে এসেচি ......কই তারা তো খুব খারাপ লোক ছিল না, তা হলে কি আর পাশাপাশি থাকা যেত"। আবার চতুর্থ দৃশ্যে সোনা মোল্লার সঙ্গে শচীনের কথায় ছোটবেলার দুঃখ প্রকাশে সমাজ বাস্তবতা — শচীনের বাবা সোনা মোল্লার পিতৃবন্ধু। শিকারপুর মাইনর স্কুলে পড়ার সময় শচীনের ঠার্কুদা একবার ছেলেকে তিরষ্কার করেছিল "মুছলমানের সঙ্গে এতভাব থাকে বাইরে গিয়ে গলাগলি করো। বাড়িতে এনে চেয়ারে বসানো কেন! দুদিন বাদে যে মাথায় চড়বে"। কচি বয়েসের এই ব্যথা জীবনে কিছুতেই ভুলতে পারেনি ইয়াসিন।

ইসলামের জন্য হিন্দু বিদ্বেষে মদত দেয়, কলকাতায় জামাই মরেছে দাঙ্গায় এখানে হিন্দু মেরে তার প্রতিশোধ নিতে চাই। কিন্তু সোনা মোল্লা রুখে দাঁড়ায় সবাইকে নিয়ে। তবুও গঞ্জ লুঠ হয়। আব্বাস মাঝি মহেন্দ্র মাষ্টারদের স্টেশনে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করছে। শচীন সাবাড় করার ভয় করলে মুসলমানের 'ইমান' কে বিশ্বাস করতে বলে। শেষ কফিলদ্দি, সোনা মোল্লা, লতিফ, অসুস্থ আমীন মুন্সী এসে মহেন্দ্রর সামনে দাঁড়ায় — বাধ্য করে ভালবাসার দাবীতে তাঁদের বাস্তুভিটাতেই থেকে যেতে।

গ) 'মশাল' (১৯৫০) : বিভক্ত বাংলায় ১৯৫০ সালে বাটা, জগদ্দল চত্বরে সাম্প্রদাতিক দাঙ্গা শুরু হয়। তখনই বেদনা ভারাক্রান্ত চিত্তে 'মশাল রচিত হয়। যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় কেউ কারোরি সঙ্গে-বিরুদ্ধে মিশতে পারছেনা, তখন শ্রমিক শ্রেণীই তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। কেননা শ্রমিকরা বুঝেছে " সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এতই নির্মম যে, পায়ে লুটিয়ে পড়েও অব্যাহতি নেই। .... সাম্প্রদায়িকতার মদিরা পানে যে লোক ক্ষিপ্ত হয়, দয়া মায়া মনুষ্যত্ব বলে কিছু থাকেনা; হিংস্রতা তাকে আদিম যুগের এক বর্বর পশু করে তোলে। .... যুদ্ধও বুঝি ততখানি পারে না"।[২১] এই ভয়াবহতার মাঝে দাঁড়িয়ে বিপন্ন মানবতাকে বাঁচাতে যাঁরা দৃঢ় সংকল্প হয়ে সংগ্রাম করেছিল 'মশাল' এ তার চিত্র রয়েছে। 'মশাল' এ হিন্দু মুসলমানকে আলাদা করে দেখান হয়নি। দুই সম্প্রদায়ের লোককেই সমান মূল্য দেয়া হয়েছে সামাজিক দিকে, জীবন বোধে ও কর্মক্ষেত্রে। এখানে সাম্প্রদায়িক সমস্যার প্রেক্ষিতে শ্রমিক আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মধ্যদিয়ে মানবতার পূজারীদের জয়যাত্রা তে নাটকের শুরু ও অবসান। নাটকে মুসলমান চরিত্র দুটি শ্রমিক নেতা মতির সহকর্মী জালাল ও তার পুত্র জয়নাল।

চটকলের মালিকরা ম্যানেজার, দালাল গুণ্ডাদের নিয়ে পাকিস্থানে পাট সরবরাহ করবে না, এই রাগে মুসলমান তাড়িয়ে পাকিস্থান কে জব্দ করতে চাই। সেই সঙ্গে হিন্দু মুসলমান শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে তাঁদের সংগ্রাম কে হীনবল করতে কৌশলী চিন্তায় মালিক পক্ষ ব্যস্ত। কিন্তু শ্রমিক সংগঠন হিন্দু-মুসলমান হিন্দুস্থানী মিলে সকলে এই অবিচার অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বদ্ধপরিকর। নানা-বাধা বিপদ-অত্যাচারের মধ্য দিয়ে বন্দী শ্রমিক হিন্দুস্থানী শোভনলালের প্রাণের বিনিময়ে শ্রমিক ও শ্রমিক নেতারা ভেদাভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হবার শপথ নিয়েছে শোভনলালের মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে — শুরু করেছে "রক্ত শোষা দুষমনদের বিরুদ্ধে" শেষ লড়াই করতে। এই কাহিনীতে জালাল, জয়নাল ও মতির বিধবা বোন ললিতা এবং মালিকের গুণ্ডার কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক চিত্র ও মুসলমান সমাজ এসেছে।

২১। মূল নাটকের 'নিবেদন' অংশ।

কলকাতার অদূরের এক শিল্পাঞ্চলে হিন্দু মুসলমানের পাশাপাশি বাস। শ্রমিক নেতা মতি বোন ললিতার জন্য চিন্তিত। পাকিস্থানের দাঙ্গায় স্বামী, পুত্র হারিয়ে ললিতা আজ প্রায় বোবা, এদিকে মিলের কর্তাদের কারসাজিতে কাজী পাড়ায় দাঙ্গা বাধার উপক্রম। মালিক পক্ষের কারসাজি মতিরা বুঝতে পেরে তারা ঐক্যবদ্ধ হতে চাইছে। এরা শান্তি চাই, দাঙ্গা নয়। এরা স্বীকার করে পাকিস্থানের দাঙ্গায় অনেক মুসলমান হিন্দুকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু মালিকের চর হীরালাল মনে করে প্রতিটি মুসলমান পাকিস্থানের চর—তাদের সাবাড় করতে হবে। হিন্দু মুসলমানের মিলন অসম্ভব। এসময় জালাল পুত্র জয়নালকে বাঁচাতে ললিতার কাছে রেখে যায়। দাঙ্গা শুরু হয়েছে। এক শ্রেণীর হিন্দুরা মুসলমান শিশু সহ মারছে কাটছে, মেয়েদের উপর অত্যাচার করছে। মতিরা মুসলমানদের বাঁচাতে দিরাপদ আশ্রয় খোঁজে। জালাল মনেকরে "পাকিস্থানের লোকের কাছে তার জন্মভূমি বেহেসত্ (স্বর্গ) ...কিন্তু এই গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে আমার সাত পুরুষের বাস। .... আমার মতো .... অনেক মজদুরই চায় না পশ্চিমবাংলা ছেড়ে পাকিস্থানে গিয়ে ভিখিরি হতে।" গুণ্ডা রামকান্ত "শালা নেড়েদের" সহ্য করতে পারে না। মতির বাড়ী জালালের ছেলে রেখে আসা আরো অসহ্য। ঠিক হয় জয়নাল কে শেষ করতে হবে। কিন্তু মতি, ললিতা জয়নালকে নিরাপদ স্থানে রাখতে যাবার পথে গুণ্ডাদের হাতে পড়ে, জয়নালকে তারা আগুনের মাঝে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মতি আত্মযন্ত্রণায় হত্যোদ্যম হয়ে পড়ে। ললিতার আর্তচিৎকারে "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার জয়নালকে, আমার দুলুকে, আমার জয়নালকে দুলুকে .... এনে দাও ...." ইত্যাদিতে জয়নাল ও দুলু মাতৃকণ্ঠে একাকার হয়ে যায়। জালাল সব জেনে বজ্রাহত হয়েও রুখে দাঁড়ায়। দক্ষিণ পন্থী নেতা লালমোহন ও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে শান্তিমিছিল বের করে। গুণ্ডার গুলীতে মারা যায় শোভনলাল। মতিও সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আন্দোলনে যোগ দেয়। জালাল বলে ওঠে —"শোভনলাল আমাদের মুশকিল আসানের চিরাগ, আঁধার রাতের ঈদের চাঁদ .... শোভনলাল আমাদের পথ রোসনাই করুক — শান্তির মিছিল জ্বালুক মানুষের দিলে, নতুন আশার আলো — আর অন্ধকারে মুখ লুকোক সেই দুষমনের দল যারা দালাল, শোভনলাল .... আমার জয়নালকে বাঁচতে দেয়নি। .... চলো, চলো মতি, শোভনলালকে নিয়ে চলো" (৭ম দৃশ্য) ইত্যাদিতে মুসলমানের ঈদের চাঁদ হয়েছে হিন্দুস্থানী শহীদ শোভনলাল। দু'লাল, শোভনলাল, জয়নাল মিশে গিয়েছে। তবুও নাটকের ৩য়, ৪র্থ দৃশ্যে হিন্দু মুসলমান সমাজের বাছবিচার বাদ পড়েনি। জয়নাল ছুঁয়ে দিয়েছে বলে ললিতার খাওয়া হয়নি। "মা আসবার আগেই জয়নালকে এখান থেকে "সরাবার কথা ভাবে মতি। হিন্দু ঘরের বিধবা বলে জয়নালের জন্য খুব করেও ললিতা সর্বদা

স্বস্তিতে নেই বলে মনে করে মতি। কিন্তু ললিতা 'পিসী' ডাক শুনতে চায়, 'ফুফু' নয়; গুণ্ডাদের হাত থেকে প্রাণের বিনিময়ে জয়নালকে বাঁচাতে ব্যর্থ চেষ্টা করে, শেষে তাকে হারিয়ে হাহাকারই হয় তার একমাত্র সম্বল। রামকান্ত সহ্য করতে পারেনা মতিকে কারণ'' শালা হিন্দু হয়ে মুসলমানের বাচ্চাকে ঘরে রেখেছে। ''গরুখোরদের জন্য'' মায়া হয় না ইত্যাদি। 'মশাল' এ হিন্দু মুসলমান জীবন যেন একসঙ্গে জড়িয়ে। যেমন জালাল মতির উপর অটল বিশ্বাস রেখেছে, তেমনি ললিতা ও ভেদাভেদ ভুলে এক চিরন্তনা মাতৃসত্তায় উত্তীর্ণা। সেরূপ স্পষ্ট হয়েছে মাতৃহীনা শিশু জয়নালকে কেন্দ্র করে। শুধু হিন্দু মুসলমানের উজ্জ্বল রূপই নয়, প্রাদেশিক উগ্রতার বিরুদ্ধে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিন্দুস্থানী শ্রমিক শোভনলাল চরিত্র, যে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে নিজের জীবন দিয়েছে। কোন ধর্ম বা সম্প্রদায় নয়—'মশাল' এ সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে মানবতাকে। নাটক তিনটির জনপ্রিয়তা সর্বজন বিদিত।

৯। সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরীর নাটকে মুসলমান সমাজ ঃ

নাট্যকার সত্যেন্দ্রনাথ চৌধুরী নদীয়ার পল্লী গ্রামের শিক্ষাব্রতী দেশকর্মী। বিভাগোত্তর বাংলার পল্লীসমাজ নিয়ে **"মাষ্টারের মেয়ে"** সামাজিক নাটিকাটি রচনা করেন (১৯৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দে)।[২২] নাটকে একটি শিক্ষিত যুবক গ্রামে গিয়ে যথার্থ বিদ্যালয় শিক্ষা দেবার ফাঁকে নিরন্ন মানুষদের যন্ত্রনার জীবনে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। ক্রমশ: সমস্ত বাধা বিপত্তি কাটিয়ে সাধারণ গ্রামবাসীদের জেগে ওঠার মধ্য দিয়ে সমস্যা সমাধানের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নাটকে রয়েছে। জীবন যুদ্ধে জয় পরাজয় বড় নয় 'সংগ্রাম শীলতাই মানুষের ধর্ম' তাই সত্যেন্দ্রনাথকে ভালবাসি শ্রদ্ধা করি।[২৩] নাট্যকারের 'নিবেদন' সূত্রে জানা যায় ১৯৪২ সালও তার পরবর্তী ঘটনা নাটকে স্থান পেয়েছে। গ্রামের 'দেবতার অবতার' দের মধ্যেও 'দানব' রয়েছে, তারাই সবজান্তা। তাদের ভুল ভেঙে দিয়েছে দেবদাস মাষ্টার। আর গরীব মাষ্টারের মেয়ে 'মাধবী'র কথা বেশী না বলেও তার পরিচয়ে নাটকের নামকরণ করা হয়েছে। মরে থাকা মেয়েরা যেন মাধবীর সংগ্রামশীলা রূপ দেখে কিছু ভরসা পাই। এ নাটকের দ্বন্দ্ব শ্রেণীগত সামাজিক মানুষের —সাম্প্রদায়িক নয়। কিন্তু নাট্যকার সমকালীন যুগে পল্লীগ্রামে বসে মুসলমানকে এনেছেন, তার বাস্তব সমাজ অবস্থিতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন রহমানের মধ্য দিয়ে। মোল্লা পুরোহিতকে এনে ধর্ম ব্যবসাকে কটাক্ষপাত করতেও পিছুপা হননি। ধর্মের বাঁধন যে শিথিল হয়ে আসছে, সমাজে পাপ কুটিলতা দানা বাঁধছে, সর্বত্র তারও ইঙ্গিত রয়েছে।

'মাষ্টারের মেয়ে' ত্রি অংক বিশিষ্ট, ৮টি দৃশ্যে বিধৃত। দুটি অপ্রধান মুসলমান চরিত্র রয়েছে। অভয়পুর গ্রামের পথে প্রায় রাত দশটায় রহমানকে সঙ্গে

২২। সাক্ষাৎকারে নাট্যকার - করিমপুর বাসভবনে - ১৭.৩.১৯৮৮।
২৩। মূল নাটকের পরিচয় অংশে - 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক ফনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

নিয়ে নতুন মাষ্টার দেবদাস পথ চলছিল। হাড়ভাঙা খাটুনির পর কেউ জেগে নেই। তাদের "কি কষ্ট বাবু" বলে অবস্থার ব্যাখ্যা কবে সাধারণ চাষী রহমান। এসময়েই রহমানের খালি পায়ে কাঁটা ফোটে, যন্ত্রনায় কাতরে ওঠে। দেবদাস তা বের করে দিতে চাই। শুনে স্বাভাবিক সমাজ অভিজ্ঞতা পুষ্ট রহমান বলে ওঠে— "কি যে বলেন বাবু! আমি মোছলমান, আমাব পায়ে হাত দিলে আপনার জাত যাবে?" একথার উত্তবে শিক্ষিত দেবদাস যথার্থ কথা ব্যক্ত করে তার সংলাপে— "তোমাদের পায়ের তলে মাড়াই করা ফসল খেলে যদি জাত না যায় তাহলে তোমাব পায়ের থেকে সেপ্টিপিন দিয়ে একটা কাঁটা বের করে দিলে আমার জাত যাবে না।" ইত্যাদি। শেষে রহমান সঙ্কুচিত হলেও টর্চ জেলে কাঁটা বের করে। এখানেই হিন্দু-মুসলমানের সমাজের ব্যবধান স্পষ্ট রূপ পেয়েছে, কিন্তু দেবদাসের মানবতার মধ্য দিয়ে নাট্যকার যথার্থ মানুষের চিত্র এঁকেছেন। দেবদাস গ্রামে এসে গ্রামের তথাকথিত জোতদারদের অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে নিরন্ন গ্রামবাসীকে সচেতন করে তোলে, নারী শিক্ষার ব্যবস্থা করতে সচেষ্ট হয়। এতে গদাধর শ্রীবাস আতঙ্কিত । এমতক্ষেত্রে সমকালীন ধর্মীয় আচারাদির বাস্তব চিত্রণে ভরদ্বাজ ঠাকুরও মৌলভীকে এনেছেন নাট্যকার। ভরদ্বাজের ব্যবসা চলছেনা বলে কাপড়ের হকারী ধরেছে। মৌলভীও ছাগল গরু কেনা বেচার কাজ শুরু করেছে। ভরদ্বাজের মুখে মৌলভীকে "আপনি বেশ আছেন। মুসলমান জাতটাই ভালো। মৌলভীকে মাথায় করে রাখে।" তা শুনে মৌলভীর সংলাপে তার সমাজেব কথা "আর মাথায় করে রাখা, কলেজে পড়া ছোকরারা যে হারে ব্লেড দিয়ে দাড়ি কাটতে আরম্ভ করেছে, তাতে আর কবছর পর বাংলাদেশে কেউ মুসলমান থাকবে বলেই তো মনে হচ্ছে না, "তাই" ছাগল ভেড়া কেনা বেচা" করছে। বস্তুত: আজ দাড়ি দেখে হিন্দু মুসলমানকে চেনা যায়না। দুজনে দুই সমাজেব হয়েও শেষে ঠিক করে ধর্মব্যবসা নয়, একে অপরের ব্যবসায় সাহায্য করবে। নাটকে মৌলভী-ভরদ্বাজের নাটকীয়তার খাতিরে না হলেও, খলনায়ক শ্রীবাসের চরিত্র স্পষ্ট করতে এরা এসেছে। শ্রীবাস পুলিসের ভয় দেখিয়ে ভরদ্বাজের কাপড়ের 'পুটুলী' হস্তগত করেছে। নাটকের রহমান ও মৌলভী মুসলমান চরিত্র দুটি এসে বাংলার পল্লীতে তাদের অবস্থিতি ও তারও পরিস্থিতির শিকার সেকথাই ধরা পড়েছে। এদের উপস্থিতি সমকালীন সমাজ বাস্তবতাকেই তুলে ধরেছে। নাট্যকারও সামাজিক চিত্রণে তাদের এনেছেন — এই জন্যই যে সংসারের জ্বালায় হিন্দু না বাংলার মুসলমানও জর্জরিত। এ নাটকে হিন্দুমুসলমান সকলেই সমমর্যাদায় অঙ্কিত হয়েছে তাদের চরিত্র অনুসারে।

আলোচ্য অধ্যায়ে নয়জন নাট্যকারের ২০টি নাটকে মুসলমান সমাজের আলোচনায় দেখা যায়— এই নাটক গুলো যুগানুসারে ঐক্যকেই প্রাধান্য দিয়েছে। এক্ষেত্রে দুটো ধারা আবর্তিত। অপরেশচন্দ্র, সুধীন্দ্রনাথ পুরাতন ধারাতেই পেশাদারী অভিনয়ের জন্য নাটক লিখেছেন। গতানুগতিকতা সত্ত্বেও মুসলমান চরিত্রেরা

সুন্দরভাবে অঙ্কিত। অন্যাদের রচনাগুলো গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়াও শ্রেণী চরিত্ররূপে এযুগের মতই বস্তু-তান্ত্রিকতাকে স্পর্শ করেছেন। এই মুসলমান চরিত্ররা ঐক্যে শুধু সংকল্পবদ্ধ নয়, মহান নাট্যকারদের উদারনৈতিক মানসিকতা স্পষ্ট। সমাজ রাজনীতির ভয়ংকর বিষবাষ্পেও নাট্যকারগণ মানবতা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়েও নাটক লিখেছেন। মন্মথ রায় মীরকরশিম যেমন উদার, তেমনি বিজন ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্রচন্দ্র প্রমুখদের রচনাতে মিলনের মধ্যেও মুসলমান মহান রূপে স্থান পেয়েছে সামাজিক ঐতিহাসিক চরিত্র হয়েও। তুলসী লাহিড়ী মুসলমানের গভীরে প্রবেশ করে সমাজ বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন, উদার মধুর মানসিকতায়। বলাবাহুল্য এভাবেই পশ্চিমবঙ্গে আজও মুসলমান চরিত্র— সমাজ আরও বিস্তৃতভাবে বিষয়াশ্রয়ে নাট্যরচনার ধারায় বহমান। হিন্দু মুসলমানের ভেদবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন না হলেও বাংলা নাট্য অঙ্গনে ঐক্যের - উদারতার প্রলেপ আশাব্যঞ্জক।

তবে যুগ প্রভাবে নাট্যাকারগণ মুসলমান চরিত্র গুলোকে মহান করেছেন সত্য। সর্বত্র সত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ হয়েছে, একথা বলা যাবেনা। তেমনি সকলে মুসলমান সমাজের রূপকে তুলে ধরতে সর্বদা পারঙ্গম হননি। অনেক সময় যুগমানসের চাপে সত্যকে বিকৃত করে ফেলেছেন। রাজনৈতিক দিক দিয়ে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য অবশ্যই দেশের পক্ষে কাম্য। কিন্তু তা বলে সত্যকে অস্বীকার করা ঠিক নয়। সব সমাজেই ভালো- মন্দ দুরকম চরিত্রই থাকে। অনেক মুসলমান চরিত্রই মহৎ, কিন্তু সকলেই নয়। যুগপ্রয়োজন সিদ্ধিতে নাট্যকারদের ইচ্ছা অনিচ্ছায় মহান মুসলমান চরিত্র সৃষ্টির সঙ্গে সর্বত্র সত্যের প্রতি সমতা রাখা হয়নি — একথা স্বীকার করতেই হয়। হয়ত বা নাট্যকাররা সেভাবে মুসলমান — সমাজ ধর্মকে সবাই জানতে সচেষ্ট হবার সময় পাননি (হিন্দু নাট্যকারগণ), ভাবেনও নি।

আধুনিক বাংলা নাটকে পূর্ব- পশ্চিম- উত্তর- দক্ষিণ সমগ্র বঙ্গের সাধারণ মানুষ চরিত্রে-ভাষাই-ধর্মে স্থান পেয়েছে, পাছে সমস্ত শ্রেণীর প্রাণের ভাষা বাংলা ও বাংলা সাহিত্যকে পুষ্ট করেছে, বিস্তৃত করেছে। রাজনৈতিক কারণে বঙ্গদেশ বা রাজনীতির নামে নিরপেক্ষতা বিঘ্নিত হলেও প্রাণের দিক থেকে বাঙালীকে খণ্ডিত করা যায়নি, যাবেনা। দুই বাংলার ভাষা- সংস্কৃতি, আজও প্রায় এক। নাট্যকরদের মনে রয়েছে—সেই বাংলার মিলিত জীবন আত্মা, মিলিত সংস্কৃতির চিত্র। বাংলার যথার্থ সমাজচিত্র বাংলা নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে বলেই বেদনা সত্ত্বেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যচিত্র দৃষ্ট হয়।[২৪] হিন্দু নাট্যকারদের লেখনীতেও মুসলমান সমাজচিত্র স্থান পাই। নানা টানা পোড়েন সত্ত্বেও এই ধারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে চলেছে আজও। জলধর চট্টোপাধ্যায়, শশীভূষণ দাশগুপ্ত, সলিল সেন, ঋত্বিক ঘটক, উৎপল দত্ত (মুসলমান নাট্যকারদের কথা ষষ্ঠ অধ্যায়ে) প্রমুখরা বিভিন্নভাবে এই ধারার অনুগামী।

২৪। নাট্যচিন্তা ঃ শিল্প জিজ্ঞাসা — দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

মুসলমান নাট্যকারদের (১৮৫২-১৯৫০) নাটক পরিচয়

রাজনৈতিক কারণে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হয়েছে। সামাজিক রাজনৈতিক কারণে বাংলা সাহিত্যে বিশেষতঃ নাটকে মুসলমানের অনগ্রসরতা অজ্ঞাত নয়। তাঁদের রচনা, অভিনয়, বঙ্গমঞ্চের বিস্তার ঘটেছে ধীরে ধীরে। সংখ্যাই কম হ'লেও একাধিক নাট্যকারেব নাটকে মুসলমান সমাজে পবিচয় ও দেখা গেছে-যাচ্ছে। সর্বোপবি তাঁদের রচনার বহমানতা পরবর্তী বাংলা নাটক- সাহিত্যে স্থায়ী স্থান লাভের যোগ্য হয়ে উঠেছে। বাংলা থিয়েটারের সঙ্গে বাঙালী মুসলমানের সম্পর্ক খুবই কম। ''বাংলা নাটক মুসলমানরা বেশী লেখেননি, নাটকলেখা কঠিন কাজ। সবার ক্যাপাসিটি থাকে না। অবজেকটিভ্ স্টাডি অফ্ সোস্যাইটি শেক্সপীয়ারে কিছু, গিরিশচন্দ্র, ডি. এল. রায়ে কিছু আছে, কিন্তু তেমন লেখা ডেভলপ করেনি। তা না হলে তাঁরা এক একটা মুসলমান ক্যারেকটার নিয়ে লিখতে পারতেন কিন্তু লেখেননি''।[১] ডঃ রেজাউল করীমের বক্তব্য যেমন সত্য, তেমনি সাম্প্রতিক কালের নট- নাট্যকার মনোজ মিত্রের কথাই— 'পুলিশের হুকুম মসজিদ মাদ্রাসা কি লোকালয়ের কাছে পিঠে থিয়েটার করা চলবেনা, আজান বা নামাজের ধ্বনি উঠলেই বন্ধ করে রাখতে হবে অভিনয়.......... ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশের একটি জেলা শহরে নাট্যানুষ্ঠানের সবকারী অনুমতি পত্রে এমনই ছিল সব কড়াকড়ি নির্দেশ। সেই ১৮৭৬- এ ইংরেজ প্রবর্তিত নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনটি সরাসরি খারিজেব ব্যাপারে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মদাতা স্বয়ং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর ছিলেন দ্বিধান্বিত।[২] অথচ বাঙলাদেশ ও বাঙালী মুসলমান সমগ্র বাঙলার গুরুত্বপূর্ণ এক অংশ, বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা এবং পৃথিবীতে একটা জাতি মেরুদন্ডের উপর ভর রেখে মস্তক সোজা করে দাঁড়াচ্ছে — যার পরিচয় বাঙালী। দুই বাংলার মানুষের ভাষা সাহিত্য-সংস্কৃতি মূলতঃ এক।[৩] কিন্তু বাঙালী মুসলমানরা কোরাণের ভাষা আরবী, হজরত মহম্মদের ভাষা আরবী বলে ইসলাম প্রচারিত অন্যান্য দেশের মতই বাঙলার মুসলমান বাংলা ভাষাকে মুখ্য - মাতৃ ভাষা রূপে গ্রহণ করতে অনেক দেরী করেছেন। অথচ অভিভক্ত বঙ্গে শহর হিসেবে কলকাতার পর ঢাকার স্থান। ঢাকাতেও থিয়েটারের চর্চা হয়েছে। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 'দৈনিক আজাদ'- এ প্রথম 'ঢাকার নাট্যশালার আদি ইতিহাস' প্রবন্ধটি শিশির কুমার বসাকের লেখনীতে বের হয়। সত্যেন সেনের 'শহরের ইতিকথা' গ্রন্থে জানাযায় - 'কলকাতার কিছু আগেই ঢাকাই রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়েছে'। দশর্ণীর বিনিময়ে মোটামুটি

১। লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে — ড. রেজাউল করীম - ২২.১০.১৯৮৮, বহরমপুর বাসভবনে।
২। মনোজ মিত্র 'মানচিত্র ভাগ হয়েছে, মনের চিত্র নয়' - ১৯.২.১৯৮৯, 'আনন্দ বাজার পত্রিকা'।
৩। আহমদ ছফা 'বাঙালী মুসলমানের মন' - ঢাকা, ১৯৮১।

নিয়মিত নাট্যচর্চা শুরু হয়। ইংরেজ ইঞ্জিনীয়র কর্ণেল ডেভিডসন ১৮৪০ - এর দিকে রোজ নামচায় লিখেছেন - দিনে- রাতে ঢাকাতে বেহালার শব্দ শোনা যায়। 'হোলির সময় ঢাকায় গান নিয়ে প্রতিযোগিতা চলত।[৪] ১৯ শতকের ঢাকার প্রধান বিনোদন ঘোড়দৌড়। বারবণিতা গৃহ হলেও ষাটের দশকে ঢাকাতে থিয়েটার চর্চা শুরু হয়। পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে থিয়েটারই হয়ে ওঠে পুরো শহরের অধিবাসীর প্রধান মাধ্যম।[৫]

পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা শহরের বাংলা ভাষা ও থিয়েটারে মুসলমান পুরোপুরি এসেছে অনেক পরে। দু- একজন মুসলমান এলে অধিকাংশ হিন্দু তাদেরকে পুলিশের স্পাই মনে করতেন। মিনার্ভার অন্যতম মালিক ও মঞ্চাধ্যক্ষ মুসলমান হলেও, সেখানে ছিল হিন্দু ভাবেরই প্রাধান্য। শিক্ষাগত পার্থক্য ও ঐশ্লামিক পৌত্তলিকতা বিরোধী মানসিকতার জন্য মুসলমান থিয়েটারে আসেনি অনেকদিন অভিনয় করতে। তবে মিস্ত্রী, পটুয়া, মেকআপম্যান, দু- চার জন থাকত। অবশ্যই ''নন্ কমিউন্যাল শিশির ভাদুড়ীর মেকআপম্যান ছিলেন ইঁদু মিএগ; শ্যামবাজারে মুসলমান মারা হচ্ছিল যখন, সে সময় ইঁদুকে ছাড়তে হল বলে শিশিরবাবু কেঁদে ফেলেছিলেন''।[৬] নজরুল জসীমুদ্দিনের ন্যায় দু'চারজন ছাড়া কেউ থিয়েটার দেখত না। পরে এ দৃষ্টিভঙ্গি বদলেছে। পার্শী থিয়েটার, সিনেমার সঙ্গে অনেক কৃতি মুসলমানের নাম জড়িত। বাংলায় আগা হাসা কাশ্মীরির ন্যায় কোন থিয়েটার কর্মী জন্মায়নি। কাশ্মীরির পায়ের তলায় বসতে কোন হিন্দু সঙ্কোচ করেননি — কলাবিদ্যার জাত নেই।[৭] বিভিন্ন তারতম্য সত্ত্বেও মুসলমান ধর্মীয় - সামাজিকতার ভ্রান্ত বাড়াবাড়ি কাটিয়ে নাটকে এসেছে — নাট্যরচনা ও অভিনয় করেছে। অগ্রগতির ধারা আজও অব্যাহত।

১. নাট্যকার মীরমশাররফ হোসেন ঃ

অখন্ড বাংলায় জীবনধর্মী আদর্শে গ্রাম্য সংস্কার রাজনৈতিক চেতনাকে ঘিরে আলোচ্য পর্বের এবং মুসলমান সমাজের প্রথম নাট্যকার মীর মশাররফ্ হোসেন। মধুসূদন - দীনবন্ধুর পরেই বাংলা নাট্যাঙ্গনে তাঁর আবির্ভাব। দুটি গীতিনাট্য ও প্রহসন একাধিক লিখেছিলেন, বর্তমানে সেগুলো দুষ্প্রাপ্য। তাঁর সমকালে মুন্সী নামদার, গোলাম হোসেন, আজিমুদ্দিন প্রমুখেরা গদ্য-পদ্যে ক্ষুদ্র দুর্বল প্রহসন জাতীয় নাট্য রচনা করেছিলেন — এমন সন্ধান পাওয়া যায় মাত্র। বাঙালী মুসলমানের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের প্রত্যক্ষফল মশাররফের 'রত্নাবতী' (১৮৬৯) উপন্যাসের পর — প্রথম নাটক 'বসন্তকুমারী' (১৮৭৩) এবং দ্বিতীয় 'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩) নাটক।

৪। 'সাপ্তহিক বিচিত্রা' — ঈদ সহখ্যা ১৯৭৬, পৃ: ১৪৪।
৫। মুনতাসীর মামুন — 'উনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার', ঢাকা - ১৯৭৯।
৬। সুধীপ্রধান - সল্টলেকের বাসভবনে লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছেন ১৮.৫.৯০।
৭। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সম্পাদিত গ্রন্থ 'থিয়েটার প্রসঙ্গে', কলি - ১৯৮৭।

তাঁর এ পর্যায়ের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য অসাম্প্রদায়িক মনোভাব।[১]

ক) **'বসন্তকুমারী'** ঃ বাংলার গণ জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত নয়। 'রত্নাবতী'র মতই 'বসন্তকুমারী' হিন্দু সংস্কৃতির আলেখ্য, আঙ্গিকে সংস্কৃত রীতি গৃহীত। তিন অঙ্কের নাটকের 'প্রস্তাবনায় নট-নটীর সংলাপে নাট্যালয়ে মুসলমানের প্রতি সমকালীন ভাবনা স্পষ্ট। নট 'বসন্তকুমারী' অভিনয়ের কথা ঘোষণা করলে নটী রচয়িতার খোঁজ করে— "নট। কুষ্টিয়া নিবাসী মীর মশাররফ্ হোসেন রচিত। নটী ছি ছি!! এমন সভায় মুসলমানের লিখিত নাটকের নাম কোল্লেন; নট। কেন? মুসলমান বলে কি একেবারে অপদস্ত হলো?

নটী। তা নয়, এই সভায় কি সেই নাটকের অভিনয় ভাল হয়? একে মুসলমান, তাতে আবার উত্তুরে বাঙ্গাল।" শেষে অভিনয় শুরু হয়েছে, বিধৃত হয় হিন্দু জীবন সমাজ, শুধু তৃতীয় দৃশ্যে যুবরাজ নরেন্দ্রর গরীব প্রজাকে জল খেতে দেবার প্রসঙ্গে "ছোঁয়া ছুঁয়ির" কথা এসেছে, এছাড়া মুসলমান সমাজ নাটকে নেই।

খ) **"জমীদার দর্পণ"** ঃ সমাজ ও জীবন সম্পর্কিত প্রথম নাট্যরচনা এটি। জমীদার নন্দন মশাররফ 'নীলদর্পণে'র প্রভাবে জমিদার হাওয়ান আলির প্রজা আবুমোল্লা ও তার স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার ও বিচারের ঘটনায় মুসলমান সমাজচিত্র এঁকেছেন 'জমীদার দর্পণ' নাটকে। মশাররফ সৃষ্ট চরিত্র গুলো প্রায় সকলেই মুসলমান— হাওয়ান আলি জমিদার, সিরাজ আলি জমীদারের জ্যেষ্ঠভ্রাতা, আবুমোল্লা অধীনস্ত প্রজা, জামাল প্রভৃতি চাকরগণ, জিতুমোল্লার-সাক্ষী, আরজান ব্যাপারী, চাষা, আবুমোল্লার স্ত্রী নুরন্নেহার, আবুর ভগ্নী আমিরণ প্রভৃতি। বৃটিশ সরকার জমীদার শ্রেণী সৃষ্টি করে প্রজা পালনের দায়িত্ব দিলে, তারা তা পালন করছে না। চরিত্র হীন হয়ে পড়েছে, ক্ষমতার অপব্যবহার করছে। কৃষকের প্রতি অত্যাচার চলছে, বিচারের নামে হচ্ছে প্রহসন— তাদের অসহায় চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। (যদিও 'নীলদর্পণে'র মত প্রজাদের এই প্রহারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও অধিকার প্রতিষ্ঠা করার প্রকৃত রূপ নাটকে নেই।) 'প্রস্তাবনা' অংশে সূত্রধারের ও নটের মুখে জানানো হয়েছে "সর্ব নর ধনপ্রাণ মন রক্ষাকারীর' দল ক্ষমতা পেয়ে জানোয়ার হয়েছে"। "এরা আবার দুই দল" "হিন্দু আর মুসলমান"। দু শ্রেণীতে এই জানোয়াররা আছে, তাও প্রকাশিত।

নাটকে জমীদার' শ্রেণী অপেক্ষা ব্যক্তি-চরিত্রকেই দেখানোর চেষ্টা রয়েছে। জমীদার হায়ওয়ান আলীর হঠাৎ নজর পড়ে আবুমোল্লার স্ত্রী নুরন্নেহার প্রতি। উপায় বের করতে ছুতো করে আবুকে ধরে এনে নানাভাবে তাকে উত্তপ্ত করে ৫০ টাকা জরিমানা ধার্য করে। টাকা না দেওয়াতে কয়েদ করা হ'ল। কৃষ্ণমণি বৈষ্ণবী

১। মহম্মদ মনিরুজ্জমান - 'আধুনিক বাংলোকাব্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক' - ১৯৮৪

* 'জমীদার' মূল নাটকের বানান গৃহীত হয়েছে।

নুরন্নেহার কাছে গিয়ে হায়ওয়ানের বাসনার কথা জানায়। রাজরাণীর মত জমীদার রাখবে বলে প্রলোভন দেখায়। নুর ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলে জমীদার লোক পাঠিয়ে ধরে আনে গর্ভবতী নুরন্নেহাকে। পাশবিক অত্যাচারে নুরের মৃত্যু হ'লো। আদালতে মামলা করা হ'লো। থানা-পুলিশ-আদালত শোষকেরা নানা সূত্রে আবদ্ধ। মামলা প্রহসনে পরিণত হ'ল। জিতে জমীদার আবুর বাড়ীঘর মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল— প্রতিবাদ হ'ল না। সাধারণ বিচারে এটাই সে যুগের অবস্থা- বাস্তব চিত্র হিসাবে নাট্যকার সোজাসুজি উপস্থাপিত করেছেন। আধুনিক যুগের কথ্য ভাষায় মুসলমান চরিত্র প্রাধান্যে ফরাসী, আরবী শব্দের আধিক্য রয়েছে। নাটকটির বিভিন্ন অংশেই মুসলমান সমাজ ধর্ম গত যথার্থ পরিচয়ও রয়েছে। তিন অঙ্কের নাটকের ১ম গর্ভাঙ্কে মোশায়েব ও জমীদার যখন আবুকে ধরে আনার 'ফন্দি' আঁটছে তখন নামাজ পড়ার প্রাক্কালের আজান ধ্বনি উচ্চৈঃস্বরে ভেসে এসেছে— "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আসহাদো আন্‌লা এলাহা এল্‌লেল্লা। আসহাদো আল্লা, মহামদ্দোর রসুলল্লা আসহাদ আল্লা মহামদ্দোর রসুলল্লা। হাইয়ে আাস্‌সলা, হাইয়ে আলাল ফলা, হাইয়ে আলাল ফলা। আল্লাহো আকবর। আল্লাহো আকবর। লা এলাহো এনলেল্লা।"— অর্থাৎ আল্লাই সর্বশ্রেষ্ঠ, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যাতীত কেউ উপাস্য নেই, সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় মোহাম্মদ আল্লার প্রেরিত রসুল। নামাজে উপস্থিত হও। মঙ্গল লাভের জন্য নামাজে উপস্থিত হও। আল্লাই সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই। মুসলমানের প্রতিজ্ঞা প্রথম 'কলমা' বা শপথ, অবশ্য কর্তব্য বা ফরজ। আবুকে ধরে আনতে জামাল "কোম'র খোলাই" এর টাকা নেয় ঘুষ হিসেবে। আবু যেমন "জোর করে পশ্চিম দিকে ফিরিয়া" আল্লাহর কাছে আবেদন জানায়, কোন অন্যায় নেই তবুও এই অত্যাচার, মারধর— আল্লা যথারীতি নীরব। আবু জমীদারের গৃহে এসেছে টাকা দিতে না পারাতে মাথায় ইঁট চাপিয়ে সারাদিন দাঁড় করিয়ে রেখেছে। সমকালীন জমীদারের চিরন্তন ছবি। নুরন্নেহা ও আমীরণের কথাতে স্পষ্ট টাকা না দিলে আবুকে মেরে ফেলবে। "নালীশ" করেও ফল হবে না। কৃষ্ণমণি এসে জমীদারের বাসনা জানাই— "অনেক কনে বউ পর্যন্ত .... পাড়া পড়শী জাত্‌ কুটুম, পেজ্জর্যির ঘর কাউকেও ছাড়েনি। যার উপর নজর পড়েছে তারির মাথা খেয়েছে, তোমাকে খাবে"। ২/২ এ প্রথম মোসায়েবের সংলাপে মুসলমানের প্রতি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, "মুসলমানের আবার আচার ব্যাভার? ধর্ম্ম কিছুই নাই— ব'লতে কি; তারা কোরাণ কেতাব কিছুই মানেনা, ... কেবল বড়াই করে বাড়ীর ভেতরে মেয়েদের সামনে অপরের নিন্দা কর্ত্তে মজবুদ। .... কলিকালে .... রমজানের চাঁদে রোজা রেখে মস্ত মস্ত কাঁচা পাকা দাড়ি ওয়ালা সাত্রবরা তস্‌বি টিপ্‌তে হলফ পড়ে হাকিমের সামনে মিছে কথা বলতে বাধে না"রমজান— রোজার

মাস, তসবী আরবী শব্দ, মুসলমানেব জপমালা একান্তই মুসলমান সমাজের। এরপর নুরন্নেহা এসেছে, জমীদারের হাতে পায়ে পড়ে, আল্লাহ্ খোদাকে ডেকেও কোন ফল হয়নি। পাশবিক অত্যাচারে জর্জরিত নেহের গর্ভের সন্তান সহ মারা গেছে। জমীদারের দাদা সিরাজ আলি এসে চাকর মোসাহেবদের দোষী করলে "দোহাই আল্লার, কোরাণের কিরে" দিয়ে সব দোষ জমীদারের ঘাড়ে চাপিয়েছে, শেষে সিবাজের পরামর্শে আবুর বাড়ির খেজুর বাগানে মৃতদেহ ফেলে রেখে আসা ঠিক হয়েছে। এরপর বিচারের নামে প্রহসনের আদালতে জিতুমোল্লা এসেছে হায়ওযানের পক্ষে সাক্ষী দিতে। তার পোশাকে, কথাতে মুসলমানি পরিচয়— "ঢিলে পাজামা, সাদা চাপকান পরা, মাথায় পাগড়ী, গলায় তসবি, হাতে যষ্টি", তার কাজ "কোরাণ পড়ে মুরিদ (শিষ্য) কে শোনাই, ... সাদির কলমা পড়াই। মানিক পীরের সিন্নি ফয়তা (আর্বী-ফতিহা-মৃতের আত্মার কল্যাণে দান সহ প্রার্থনা) দেই" ইত্যাদি। ঘটনার দিন রাতে "সারারাত্রি আল্লা আল্লা করে উচ্চৈঃস্বরে" কাঁদাকাটি "রোনাপ্‌টিনা" করেছে, "মক্কাতে চারবার হজ্বে গেছে। তার বিচারে বড় দাতা," কাজেই জমীদার মারতে পারেনা আবুর বিবিকে— হিন্দু হরিদাসও বৈষ্ণব সেজে মিথ্যে সাক্ষী দিতে আসামী খালাস পেয়েছে মামলা ডিসমিস হয়েছে। এ চিত্র মুসলিম সমাজের হলেও আসলে প্রজার চিরন্তন ছাবি।

২. কাজী নজরুল ইসলামের নাটকে মুসলমান সমাজ :

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজীর অসহযোগ প্রস্তাব গ্রহণের পর ভারতবাসী গণ বিক্ষোভের সামিল হ'লে "লাঙল" পত্রিকায় 'সাম্যবাদী'তে নজরুল লেখেন—

"নাইক এখানে কালা ও ধলার আলাদা গোরস্থান,
নাইক এখানে ধর্মের ভেদ, সহস্রর কোলাহল;
পাদরী পুরুত-মোল্লা-ভিক্ষু এক গ্লাসে খায় জল।"

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উচ্ছসিত ভাষায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলন। বংলা সাহিত্যে যাত্রাদলের কবিয়াল রূপে আর্বির্ভূত হ'ন। বাল্যেই লেখন 'চাষার সঙ' নামক গতীবহুল এক প্রতীকী নাটিকা; এখানে ইসলামের ভাবাদর্শ ও অনুষ্ঠানের ভিত্তির পথসন্ধান করেন তিনি, স্থান পাই নামাজ-রোজা-হজ্জ্ব-জাকাত ইত্যাদি। তাঁর অগণিত গানে-কবিতায়-প্রবন্ধে নানা ভাবে স্থান পেয়েছে মুসলমান সমাজ। কয়েকটি নাটিকাতেও মুসলমান সমাজ পরিচয় রয়েছে।

১) 'ঝিলিমিলি' : নাটিকাটি ১৩৩৪ সালের আষাঢ় 'নওয়াজ' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের "ডাকঘর" নাটকের অমল-সুধা এখানে হাবিব ফিরোজাতে পরিণত। মির্জাসাহেব ও হালিমার একমাত্র কন্যা ষোড়শী ফিরোজা পূব জানলার পাশের বাড়ীর হাবিবকে ভালবাসে। পিতার বিরোধ এই ভালবাসায় চরম

মুহূর্ত ঘনিয়ে তোলে, রোগ শয্যায় মৃত্যু পথ যাত্রিনী কন্যার সঙ্গে হাবিবের বিয়ে কিছুতেই দেবেন না মির্জা সাহেব। অবশেষে প্রকৃতির স্তন্যে লালিতা ফিরোজা পৃথিবীকে চির বিদায় জানিয়ে হাবিবেব ঝিলিমিলি খুলতে পূব জানলা দিয়ে অভিসারে যায় — মৃত্যুপথে, ফিরোজা "অস্তচাঁদের" তরীতে পাড়ি দিলে পৃথিবীর প্রেমোন্মাদ তরুণ হাবিবেব মধ্যে দেখা যায় ঝড়ের উদ্দামতা। নাটিকার শুরুতে মৃত্যু পথ যাত্রিণী পিতার নির্দেশ অমান্য করে পূবজানলা খুলে দিতে বাধ্য করে মা হালিমাকে। বৃষ্টিস্নাত রাতে হাবিব আসে। কিন্তু পিতার বাধাতে দরজা খোলা না পেয়ে মরণের পরে তাদের মিলন হবে জেনে ফিরে যায়। এদিকে মির্জা গান শুনতে পারেন না, স্বামী - স্ত্রীতে 'শরিয়ত" নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। "বাঁশী আর এসরাজ! স্থিরচিত্তে একটু কোরআন তেলাওত্" করতে পারেন না, "নামাজ" পড়ার জো নেই — তাই মির্জা সাহেব ক্ষুব্ধ। শিক্ষিতা স্ত্রী সমর্থন করেন না। মির্জা স্কুলে পড়া মেয়ে বিয়ে করে 'আফশোষ' কবে। হালিমা জানাই ভাবা অসম্ভব যে— "কোন গ্রাজুয়েট গোঁড়ামী" তে মোল্লাকেও হার মনোয়। "গান" ইসলামে নিষিদ্ধ নয়, তবে কথা ও সুরে হজরত মহম্মদ পরবর্তী আলেমরা কিছু পার্থক্য করেছেন মাত্র। তাঁদের মতে যে 'কথা' উত্তেজনা সৃষ্টিকারী তা হারাম নিষিদ্ধ। কিন্তু শরিয়তের নির্দেশে সব গানই নিষিদ্ধ নয়। পরবর্ত্তী দৃশ্যে স্বপ্নপুরীতে ফিরোজা হাবিব "বেহেসত্" অর্থাৎ স্বার্থ এসেছে চিরন্তন প্রিয়তমা-প্রিয়তম রূপে। জীবনের পরপারে তাদের মিলন হয়েছে। "ঝিলিমিলি" নাটিকাটিতে প্রকাশিত, সমকালীন মুসলমান সমাজে প্রেম-গান-শরিয়ত এবং তার গোঁড়ামী নিয়ে যে দ্বন্দ্ব চলত, তার ছবি। ইসলামী বিধিকে এনে তাকে প্রকাশ করা হায়েছে। নাটিকায় 'ইসলামী শব্দ' কিছু রয়েছে, যা মুসলমান সমাজ কে চিনিয়ে দেয়। আব্বা, দলহিজ (বাহির বাটি), কোরআন, শরিয়ত বেহেসস্ত প্রভৃতি। নাটিকাটির অভিনয় সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

খ) 'শিল্পী' : সাপ্তাহিক 'সওগাত' পত্রিকায় (১৩৩৫) প্রথম প্রকাশিত হয় রূপকাশ্রিত নাটিকাটি। রোগ শয্যায় শায়িত লায়লি বিয়ে করেছিল চিত্রকর শিরাজকে। শিরাজ ভেবেছিল তাকে নিয়ে অমর লোক চিন্তায় নিজেকে ডুবিয়ে দেবে; কিন্তু লায়লি নারীত্ব বধূত্ব মাতৃত্বের কামনায় বাস্তবে থাকতে চাই। মানুষ হিসাবে শিরাজকে চাই।কিন্তু শিরাজ মানুষ অপেক্ষা অনেক বেশী শিল্পী। এই দ্বন্দ্বে অপর নারী চিত্রা এসেছে। ধরার "চাঁদ লায়লি" কে ছেড়ে "আকাশের চাঁদ" চিত্রাকে শিরাজ গ্রহণ করেছে। স্বামীকে চিরবিদায় জানিয়েছে লায়লি। কিন্তু চিত্রা তার রূপে বাঁধা পড়তে চাইলে শিরাজের ভুল ভাঙে। কারণ তার কাছে "ফুলের সুবাস ই.......... যথেষ্ট, তাকে গলায় জড়িয়ে ফাঁসি" পরার সাধ নেই। এ জেনে আহত বিহঙ্গী চিত্রা বিদায় নিয়েছে। শোকজর্জর শিরাজ তুলিটি তাকে উপহার দিয়ে "চিরবেদনার পথে" পাড়ি

দিয়েছে। — এখানে সমাজ সেভাবে আসেনি, মুসলমান তিনটি নারী পুরুষ চিরন্তন মানুষের কামনা-বাসনার প্রতিনিধি হয়ে দেখা দিয়েছে।

গ) 'পুতুলের বিয়ে' : নাটিকাটিতে মুসলমান চরিত্র বেগম। হিন্দুর সঙ্গে মিলে মিশে উভয়ের বিবাহ প্রসঙ্গে এসেছে, হিন্দু কমলি বলে "হিন্দু মুসলমান সব সমান। অন্য ধর্মের কাউকে ঘৃণা করলে ভগবান অসন্তুষ্ট হন। ওদের আল্লা ও যা, আমাদের ভগবান ও তা।" এখানেই তার মুখে বাবার শেখান গান— "মোরা এক বৃন্তে দুটি ফুল হিন্দু মুসলমান।" পুতুলের বিয়ের উৎসবে তালিম হোসেনের রেকর্ড বেজেছে, বিয়ের পর তারা আশীর্বাদ চেয়েছে "আল্লা" 'ভগবানে'র কাছে। এখানে হিন্দু মুসলমান মিলিত ঐক্যের বাসনা প্রকাশিত।

ঘ) 'ঈদ' : ১৩৬৫ সালের ৭ই বৈশাখ 'ইত্তেকাফ' পত্রিকায় প্রকাশিত ১২ পাতার নাটিকা। এখানে ঈদ-রোজা-নামাজের প্রয়োজনীয়তা, ইসলামী অনুশাসন, দরগায় সিন্নি দেওয়া প্রভৃতি প্রসঙ্গে মুসলমান সমাজ চিত্র স্পষ্ট হয়েছে, এমনকি মাহ্‌তাব, শম্‌শের প্রভৃতি চরিত্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে ঈদের সামাজিক-ধর্মীয় মূল্যের কথা স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে।

ঙ) 'শ্রীমন্ত' : নাটিকাটি চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সদাগরের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। ও এখানে শ্রীমন্তের নৌকার দুজন মাঝি মুসলমান। সমকালীন সমাজের কায়িক শ্রমজীবী মুসলমানের প্রতিনিধি এরা। তাদের কথাবার্তায় সমাজ ধর্ম এসেছে। শ্রীমন্তের বাড়ি থেকে রওনা দেবার সময় তার মায়ের কান্নাকে ১ম মাঝির মনে হয়েছে "চকের পাণিতে দরিয়ার পাণি যেন দ্বিগুণ হইয়া গেল গিয়া মামু?" শুনে দ্বিতীয় মাঝির নিজ পুত্র শোক মনে পড়েছে 'পোলা পানটারে যখন কবর দিতে লইয়া যায় তখন উয়ার মা এই রকম কইরাই কাঁদছিল রে," আবার সমুদ্রে ঝড় উঠলে মাঝিরা "পীর দয়ালের " স্মরণ করেছে। পাণি, কবর, পীর, মামু প্রভৃতিতে মুসলমান সমাজ পরিচিতি।

নাট্যকার নজরুল মুসলমানের গৃহে জন্মে ছিলেন সত্য। কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তাঁর রচনায় হিন্দুমানসের প্রভাব বেশি,[১০] তিনি মুসলিম সমালোচক দ্বারা সমালোচিত হয়েছেন, বাংলার জাতীয় কবি বলেও প্রশংসিত হয়েছেন।[১১] তাই নজরুলের নাট্যচরিত্রেরা সমকালের আঙিনায় দাঁড়িয়ে বাস্তবতার পরিচয় রেখেছে, স্থানে স্থানে তা চিরন্তনত্ব পেয়েছে। বাস্তব সচেতন বলেই নজরুল 'শ্রীমন্তে'র মাঝিদের এনে যুগপোযোগী সমাজ বাস্তবতা

১০। 'নজরুলের হিন্দু অনুসারী মন ১৯ শতকের মত ২০ শতকেও ব্যাপ্তি পেয়েছে'। বাঙালী মুসলমানের মন-আহমদ ছফা।

১১। রশীদ আল ফারুকী - 'বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান'।

দেখিয়েছেন। উদার বলেই নাটকে, গানে, বক্তৃতায় ধর্মীয় গোঁড়ামীকে স্থান দেননি। বাংলায় প্রচলিত অবরোধ প্রথা, মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ধিক্কারেও সোচ্চার হয়েছেন।[১২] নজরুলের নাটক মনোমোহন ও নাট্যনিকেতনে অভিনীত হয়েছিল, কিন্তু আলোচ্য নাটিকা গুলোর সঠিক অভিনয় সংবাদ জানা যায় না।

৩। 'নাট্যকার খাজা' ঃ

"বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"য় খাজা নাম দিয়ে বচয়িতা **"বাবরের ব্রত গ্রহণ"** নামকটি লেখেন, বার পৃষ্ঠার দৈর্ঘ্য। শাহান শা কবিরের আস্তানায় কারবালার রাজপুত বাবর পিতৃহত্যাকারী, পিতৃব্য ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চাই। কবীর শাহান শা তাকে যথার্থ ইসলাম ধর্ম অনুসারে কর্মপন্থা অনুসরণের নির্দেশ দেন। বাবর তা মেনে নিয়ে মোগল বংশের স্থায়ী ভবিষ্যৎ গড়ে দেন। এই কাহিনীটুকুতে অলৌকিকতার প্রাধান্য সত্ত্বেও নাটিকাটিতে ইসলাম সমাজ, ঐশ্লামিক অনুশাসনের কথা ব্যক্ত হয়েছে। শাহানশার বক্তব্য " এস্‌লামে ভাগ্যবলে কোন জিনিষ নাই।.......... তলোয়ারের সাহায্যেই........... উন্নতির পথ পরিস্কার করতে হবে।" বাবরকে নির্দেশ দেন "কিন্তু তার আগে, তুমি মোসলমান, প্রকৃত মোসলমান যোদ্ধার দীক্ষা গ্রহণ কর — তখন......... দুনিয়ার সব বাধা বিঘ্ন মাথা নত করবে।" পিতৃব্য কেন, কাউকে হত্যা করে শুভ কাজ অসম্ভব। শাহানশার কথায় ইসলামের নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে, যা মুসলমান মাত্রই পালনীয়— "এসলামের সনাতন আদেশ,....... বিজিত শত্রুকে বধ করতে পারবে না; যুদ্ধ বন্দীর প্রতি সদ্ব্যবহার করতে হবে। এসলামের আজন্ম প্রতিপক্ষ, জানের দুশমন্ আবুহোসেনকে হজরত মোহম্মদ তাঁর উপর শাস্তি হোক কি, মহাক্ষমার আহ্বানে অভিনন্দিত করেছিলেন, মনে রেখো।" বাবর 'নাটকে' মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু মুসলমান যোদ্ধারা, যারা ইসলামের পতাকা উড়িয়েছেন — তারা কতটা মেনেছেন? ইসলামই নির্দেশ দেয়— "বিজিত দেশের খেজুর খোরমা পেস্তা বাদাম প্রভৃতি ফলবান বৃক্ষ ও শস্যাদি নষ্ট করতে পারবে না। .... শত্রুর দেশের যুদ্ধ বিধ্বস্ত জনগণ শিশু ও বৃদ্ধের প্রতি কোনরূপ অত্যাচার, নারীজাতির প্রতি কোনরূপ অসন্মান প্রদর্শন করতে" পারবে না। শুধু লুণ্ঠন উদ্দেশ্যে কোন নগর বা দেশ আক্রমণ করতে পারবে না। ....বিধর্মী ঘোর শত্রুর সঙ্গে ব্যবহারেও মনে রাখতে হবে, মোসলমানের কথার কখনো অন্যথা হয় না।......... দুনিয়ার তুচ্ছ সিংহাসনের জন্য ভাইয়ে ভাইয়ের বুকে ছুরি বসিও না।" বলাবাহুল্য

১২। 'আমাদের পথে মোল্লারা যদি হন বিন্ধ্যা চল,............ অবরোধ প্রথা হইতেছে হিমাচল, আমাদের দুয়ারের সামনে এই ছেঁড়া চট যে কবে উঠবে খোদা জানেন'।.............. নারীদের খাঁচার পাখি করে না রেখে ওড়াতে শেখাতে হবে। সিরাজ গঞ্জের নাট্যভবনে বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলন সভাপতির ভাষণে বলেছেন নজরুল। ৫ -৬ নভেম্বর ১৯৩২।

বাবর মেনেছিলেন নাটকে, কিন্তু মোগল বংশের কেউই ইসলামের এ নির্দেশ কে মানেন নি। এমনকি ইসলামের উপাসক, প্রচারক — ঔরঙজেব ও নন। যদিও " সকল বাদশার যিনি বাদশা সে আল্লার রাজ্যে জাতি ধর্ম নাই।" বাবর ফকীরের নির্দেশ মত আদেশ মেনেছে, পালন করার শপথও গ্রহণ করেছে। মানসিকতা বোঝাতে যা বলেছে বাবর — তাতেও ইসলাম— 'ইনসা আল্লাহ্; আশীর্বাদ করবেন হজরৎ, মানুষের যা সাধ্য বাবরের পক্ষে তা অসাধ্য হবে না; আর এস্লাম যা বিধান করেছেন তা পালন করবার শক্তি নিয়ম আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে দিয়েছেন।" নাট্যকার 'এ' সংলাপ দিয়েও স্পষ্ট করতে পারেননি বাস্তবকে, তবে ইসলামের অবমাননা নাট্যকার যা দেখেছেন — তা না করেও যে চলা যায় উল্লিখিত সংলাপ তারই ইঙ্গিত। শাহানশা এরপরও বলেছেন — "তোমার বংশের কেউ এস্লামের অমর্যাদা করবে, ভাইয়ে ভাইয়ের অঙ্গে অস্ত্র হানবে, সেইদিন ভ্রাতৃ রক্ত কলঙ্কিত হস্ত হতে পবিত্র রাজদন্ড খসে পড়বে, লক্ষ সৈন্য সে পতনের গতিরোধ করতে পারবে না।" নাটিকায় শাহান শার সংলাপে যেন ইসলামের রাজনৈতিক বিধান প্রচারিত হয়েছে — আর এখানেই ইসলামীয় ধর্ম সংস্কৃতি নাটকের উচ্চাসনে বসেছে। উল্লেখ্য নাটকটি রচনাকালে (১৯২০/২১) বঙ্গদেশের প্রতিবেশী হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাইয়ের দ্বন্দ্ব মিলনের বাস্তব ঘটনাকে নাট্যকার উদার মানসিকতায় স্থান দিতে পারেন নি। প্রতিবেশী ভাইয়ের কথা উল্লেখ করেন নি কোথাও। ষোড়শ শতকেই রয়ে গেছেন। যদিও শেষ দিকের ভবিষ্যৎ বাণী — মোগলের পতন,ইসলাম অবমাননার ফল — মুসলমানের রাজত্ব হারানো ইত্যাদিকে পরোক্ষে ইঙ্গিত করে। নাট্যকার যথার্থ ইসলাম ধর্মের 'দান' রূপে তাঁর বক্তব্যকে প্রকাশ করেছেন মাত্র; দেশ- কাল - সমাজ নয় — বিংশ শতকেও অষ্টাদশ শতকের মানসিকতা প্রকাশ করে ইসলামের অনুশাসন প্রচারেই থেমে গেছেন; তবে যথার্থ ইসলাম নীতি প্রচার মুসলমান সমাজের শিক্ষার বিষয় — এজন্যই তিনি ধন্যবাদার্হ।

৪। **ইব্রাহিম খান ঃ** পাকিস্থান সৃষ্টির পর নবচৈতন্যে উৎসাহে যে সব শক্তিমান নাট্যকার আবির্ভূত হ'ন, ইব্রাহিম খান তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। তাঁর নাটকে সমাজ সমস্যার ঔৎসুক্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁর "কাফেলা" নাটকে দরিদ্র, মূর্খ সাধারণ গ্রামবাসীর দুঃখ বেদনাকে প্রকাশের চেষ্টা দেখা যায়। রক্ষণশীল মোল্লাদের কুসংস্কার জাত অজ্ঞতাকেও বিশুদ্ধ চিত্তে বিদ্বেষপূর্ণ ব্যঙ্গে প্রচারিত করেছেন নাট্যকার।[১৩] সামাজিক ঘটনার আলোকে রচিত 'কাফেলা' তে গ্রামের কয়েকজন তরুণ একটা মেয়েদের স্কুল স্থাপনের চেষ্টা করলে রক্ষণশীল মুন্সী সেই সৎ ভাবনাতে

১৩। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য - বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে - ২য়খন্ড- ৩য় সং ১৯৭১।

বাধা সৃষ্টি করে। মুন্সীর প্রথমা স্ত্রী স্বামীর বিরোধিতা করে, যুবকদের সঙ্গে যোগ দেয়। মুন্সী বাধ্য হয় পরাজয় স্বীকার করতে। অবশেষে মুন্সীর নিজের বাড়ীতেই বালিকাদের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। পাকিস্থান সৃষ্টির পর মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজে যে নতুন 'ভাবের' উন্মাদনা জাগায় তার সার্থক প্রতিফলন 'কাফেলা' নাটকেও বাঘামিয়া, মুন্সী ও তার প্রথমা স্ত্রী — চরিত্র এয়ের মধ্যে স্বাভাবিক ও জীবন্ত রূপ পেয়েছে। নাটকটি 'অতি নাট্যিক' রূপ পেয়ে ব্যঙ্গ চিত্রে পর্যবসিত হয়েছে। নাট্যকারের ''কামাল পাশা'' ও ''আনোয়ার পাশা'' নাটক দুটিও উভয় বঙ্গে বিপুলভাবে অভিনীত হয়েছিল। কিন্তু একশ্রেণীর আলেমরা বললেন, ওরা কাফের হয়ে গেছে। বিশিষ্ট আলেম মৌলানা মহঃ আক্রম খাঁ সুর সমস্যা, পর্দা সমস্যার কোরাণ - হাদীস থেকে সমাধান করে ছিলেন তিনি, বলেন 'কামাল পাশা নাটক হলে সমাজে উন্নত ভাব আসবে।[১৪]

৫। ওবায়েদ-উল হক ঃ মুসলমান সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবেশ দেরীতে হলেও সভ্যতার পরিবর্তনের পাশাপাশি গোড়াঁ রক্ষণশীলতা, মডার্ণ সোসাইটির মননে অতি উচ্চবোধের যে সমস্যা ও দূরত্বকে প্রকট করছিল তা ধরা পড়েছে **''যুগসন্ধি''** নাটকে । নাট্যকার হক সাহেব সুকৌশলে ভিন্ন মানসিকতার সামঞ্জস্য এনেছেন 'যুগসন্ধি' তে। স্বভাবতই গোড়া ও নব্যশিক্ষিত মুসলমান সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে নাটকে। নাটকটি ''মাসিক মোহাম্মদী তে দৃশ্য বা অঙ্ক বিভাজন না করে ('পটপরিবর্তন' মাঝে মধ্যে আছে) ছ'টি সংখ্যায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। রিটায়ার্ড ইঞ্জিনীয়র মিঃ আহছান, পুত্র ডাঃ মোহছেন ও অত্যাধুনিকা কন্যা লুসী সহ অন্যান্য মোট ২৫টি চরিত্রই মুসলমান। ইঞ্জিনীয়র পরিবারকে ঘিরেই নাটকের বিস্তার-পরিণতি। পরিবারের সকলে 'বয়' নির্ভর। একত্রে হুকুম চালাতে সিদ্ধ। লুসী হ্যাপী কোম্পানী ক্লাবের প্রতিষ্ঠাত্রী হয়ে। বাড়ীতে পাঁচ সদস্য মিঃ রেহমান। এব্রাহাম, শুকুর, সাবিল ও মেহবুব কে নিয়ে আলোচনা মুখর। মোহসেনের বন্ধু রিসার্চ স্কলার মাশুক উচ্চশিক্ষিত যথার্থ মানবতাবাদী। ক্লাব ও সদস্যাদের সঙ্গে মনের - মতের মিল হয়না, দৃষ্টিভঙ্গী ভিন্ন। কিন্তু লুসী তাকে সভ্য করতে চাই। ক্লাবের উদ্দেশ্য জানাতে চাইলে লুসী বলে— ''মেয়েদের বিশেষ করে মুসলিম মেয়েদের জীবনের সকল আড়ষ্টতা, নীচ সংকীর্ণতা কাটিয়ে তাদেরকে সহজ এবং উদার মনোভাবাপন্ন করে গড়ে তোলা। ....আমারও পর্দ্দার আবরণ ছিঁড়ে, অন্দরের পাঁচিল ভেঙ্গে বেরোব বাইরে, চলব পুরুষদের সঙ্গে দৃপ্তভাবে। ....এর মধবর্ত্তিতায় মেয়ে- পুরুষে সহজভাবে মেলা মেশার ট্রেনিং হবে।'' এতে সমাজের আদৌ মঙ্গল হবে না জানাই মাশুক। অন্যদিকে সদস্যরা অন্য নারীকে সদস্য কবতে চাই না; সবাই লুসীর টানে আসে, তাকে জয় করতে। এব্রাহাম স্পষ্টই বলে ''প্রথমে লুসীকে বিয়ে করা তারপরে

১৪। সৈয়দ আব্দুর রহমান ফেরদৌসী — লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছেন ২৩.১০.১৯৮৮।

তার অর্থ হাতে নেওয়া।" অন্য মেয়ে এলে "আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হবেনা।" অপরদিকে ডা: মোহছেনের লুসীর সঙ্গে ও শ্রেণী সমাজের শ্রমিক মালিক ক্ষমতার আলোচনা কালে পাশের বাড়ীতে লক্ষ্য গেছে। সে বাড়ীতে এক রক্ষণশীল পরিবার এসেছে — মেয়েদের বোরখা পরিয়ে তারা ক্ষান্ত হয়নি "চারিদিকে আবার পর্দ্দার দেওয়াল"। লুসীর মন্তব্য "মায়ের পেটে যেমন ছিল অন্ধকারে, এখনও তেমনি অন্ধকারেই আছে। মরেও অন্ধকারে যাবে।"

রক্ষণশীল পরিবারের কর্তা গ্রামের গোঁড়া মুসলমান খলিলুল্লাহ শহরে এসে কন্যার "ব্যারাম" সত্ত্বেও নির্দেশ দেয় জালনা বন্ধ রাখতে। বান্দা ছলিমুল্লাহ সমর্থন করে মেয়ের প্রাণ গেলেও " পর্দ্দার বর খেলাফ করা যায় না। একটু কষ্ট হলেও পর্দ্দা ত ঠিক রাখা চাই।" তাই 'বাঁশের চিক' এনে বাইরের আলো বন্ধ করতে হবে। কলুটোলায় আম্বর মিঞা চিক আনতে গিয়ে গ্রামাফোনে "আমাগোর জমীরুদ্দীনের গলা" ভেবে তাকে খুঁজে বোকা বনে, "আজব শহর কলকাতা" সম্পর্কে গ্রামের মানুষের কাছে নতুন অজ্ঞতাকে প্রকাশ করেছেন নাট্যকার। পরের পটে শুকুর লুসীকে বলে "আপনি মুসলিম সমাজে" বিপ্লব এনেছেন। তাই সকলে মাশুকের বাড়ী গিয়ে তাকে সভ্য করার ব্যর্থ প্রয়াসে ক্ষুব্ধ হয়। ক্লাবে লোক নেওয়াকে কেন্দ্র করে লুসীর আনন্দ প্রকাশে বয়ের কাছে সমালোচিত। তবুও লুসীর আধুনিকতার মাত্রা, সিনেমা দেখা বেড়েই চলে। হঠাৎ পরিচিত মি: সামিমের সঙ্গে নাচতে দ্বিধা হয় না। লুসী সামিম কে পেতে চাইলে সে জানায় "লুসীকে বান্ধবী করা যায়, স্ত্রী নয়"। লুসীর বিবেকে এতদিন পর "বোধ" জন্মায়। নিজের ভুলবুঝে মাশুকের কাছে ছুটে যায়, তাকে বাহিরে চাকুরীতে যেতে না দিয়ে ধরে রাখতে চাই, এখানেও লুসী ব্যর্থ হয়।

এদিকে খলিলুল্লাহর বাড়ীতে কবিরাজী চিকিৎসা ও ভাষাতে মুসলমানী গোঁড়ামীর চিত্র — হেকিম এসেছে মানুষের টানা গাড়ীতে, ছলিম তা সহ্য করতে পারেনি, কিন্তু খলিল মনে করে এটা অন্যায় নয়, কেননা "পীর ছাহেবরা পাল্কীতে করে দেশ ছায়ের করেন।" কিন্তু ছলিম জানাই— "হজরত ওমর ফারুকও যতখানি পথ উটে চড়ে যেতেন ততখানি পথ বাহক চড়িয়ে নিজে টেনে নিতেন।" হেকিম "নাড়ী দেখতে" চাইলে "পর্দ্দার বর খেলাফ করা যাবে না" বলে ইসারা বুঝে ঔষধ দিয়েছে। নাট্যকার সবজান্তা হেকিমদের দেখিয়েছেন, তারা কিছুই জানেনা, মোহসেনের সঙ্গে কথাতে তা বোঝা গেছে। মোহসেন খলিলের বাড়ী এসেছে ঔষধ দিতে, কিন্তু "ওদের দাওয়াইতে অনেক সময় মদ মেশানো থাকে" বলে চিন্তাগ্রস্ত খলিলকে বাধা দিয়েছে বান্দা ছলিম। মেয়ের কাতরানির শব্দ শুনে ওকে চুপ করতে বলেছে, কারণ "বেগানা পুরুষ ওর গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে"। ছলিমরা অপারগ হলে খলিল নিশ্চিন্তে বলে — "তবে তার মুখে কাপড় গুঁজে দাও।" বাধ্য

হয়ে মোহসেন রোগি মরলে 'পুলিশ', 'মামলা'র ভয় দেখায়। কেননা "আল্লাহ ত আমাদের আক্‌ল্‌ দিয়েছেন, এলেম দিয়েছেন.........দায়ী হতেই হবে"। শেষে চিকিৎসার অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু রোগীর কাছে যাওয়া যাবে না, কারণ, "পর্দ্দা থাকবে না, আব্রু থাকবে না"। খলিল বলে — "এ মেয়ের জন্যে যদি আমাকে শরা শরিয়তের বর খেলাফ কাজ কত্তে হয়, তবে তার মরে যাওয়াই ভালো"। ঠিক হয় ছলিম "ষ্টেথিস্‌কোপ বুকে পিঠে লাগাবে" ডাক্তার বাইরে থেকে পরীক্ষা করবে। নাড়ী দেখতে মেয়ে ডাক্তার এলে, সে খলিলের কাছে "বে পর্দ্দা" শুধু নয়— "যে মেয়েকে চল্লিশ জন বেগানা পুরুষ দেখে সে মেয়ে পুরুষের সামিল হয়ে যায়"। তাই মোহসেন 'পর্দ্দানসীন মেয়ে ডাক্তার" পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে। বোরখা পরিহিতা মেয়ে ডাক্তার এসে কাগজে লিখে খলিলকে জানাই। বেগানা পুরুষকে রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে। শূন্য ঘরে আয়েষার "পাল্‌স্‌" দেখে বদ্ধ জানলা খুলতে গেলে আয়েষা "গানের আওয়াজ" শোনা যায় বলে বারণ করে; কিন্তু ডাক্তার "খোদার·দেওয়া আলো" ঘরে আসতে জানলা খোলে। কানে আকুল দিয়ে খোদার দেওয়া কান দুটো কালা করা যায় .... চোখের উপর পর্দ্দা এঁটে একটা পুরুষের হাত ধরে অন্ধের মতো" চলার জন্য ভৎর্সনা করে। ক্রমে আলোবাতাস রোগিনীকে সুস্থ করে তোলে; উভয় পরস্পরকে ভালবেসে ফেলে। আয়েষার বিয়ে হয়নি কারণ "শরা শরিয়ত ঠিক মত মেনে চলে এসব লোকের অভাব।" ডাক্তার বলে দেখুন না যে মক্কায় শরিয়তের জন্ম সেখানেও মেয়েরা বাইরে চলা ফেরা করে — অবশ্য প্রয়োজনীয় পর্দ্দা ও আব্রু রক্ষা করেই। কিন্তু আপনারা যে পর্দ্দা করেন সেটা আপনাদেরই সৃষ্টি। এ একটা জ্যান্ত মানুষকে কফিন পরিয়ে রাখার মতো। "আয়েসা ডাক্তারের যুক্তিতে ক্রমশঃ আধুনিকা হয়ে ওঠে; কুসংস্কার ভাঙতে চাই; পুরুষকে দেখে লজ্জা পাবে না জানায় — তখন ডাক্তার বোরখা খুললে দেখা যায় তিনি —ডাঃ মোহসেন। পরষ্পর চিরমিলনের প্রতিশ্রুতি রেখে বোরখা পরে ডাক্তার বেরিয়ে যায়। মোহসেনের ছদ্মবেশে আসা যাওয়া চলতে থাকে। একদিন আয়েষা সব প্রকাশ করে। মোহসেন বলে "একটা প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে আমি এ বেয়াদপি করেছি। নেজামুদ্দিন লোকের প্রাণ হরণ করেও যদি আউলিয়া হ'তে পারেন, আমি একটা জান রোখার উদ্দেশ্যে এ সামান্য অপরাধের জন্যে অন্তত: মাফ পেতে পারি নাকি?" তাছাড়া মেয়ের আব্রুর ক্ষতি হয়নি। "মানুষের বিচারই যদি শেষ হত, খাঁটি হত, তবে কেয়ামতের পর হাসরের দিনে বিচার হবার ত কথা নয়"। বলেই মোহসেন আয়েষাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়। খলিল আর্তনাদ করে স্ত্রীকে বলে "আয়েষা বাংলা বই পড়ত" বলেই অঘটন। একদা বাঙালী মুসলমান বাংলা ভাষাকে নিজের বলে গ্রহণ করেনি, তারই ইঙ্গিত। স্বামী নয় স্ত্রী, বিয়েতে সমর্থন দিয়েছে। পরন্তু পর্দার

আড়াল থেকে হবু জামাইকে দেখার কথাও বলেছে অকপটে। খলিলুল্লাহ বাধ্য হয়েছে বিয়েতে মত দিতে। মোহসেনের পিতা আহছেন — "আমি খুসী হলুম যে তোমরা আধুনিক শিক্ষা পেয়েও তোমাদের জীবনে এযুগের আর সে যুগের যে সন্ধি আজ দেখ্‌তে পেলুম তাতে আমার বুড়ো মনে আনন্দের সীমা নেই।" আয়েষার পিতৃকুলের ইচ্ছে মত "মওলবী নিয়ে গিয়ে" জাঁকজমক না করে বিয়ের সমাধা হবার কথা ঘোষিত।

ওদিকে শিক্ষিতা আধুনিকা লুসী অনেক রাতেও বাড়ী না ফেরাতে মাশুককে নিয়ে মোহসেন খুঁজতে বেরোয়। দুদিন পর রমজানের স্ত্রীকে দেখতে গিয়ে এব্রাহাম ও রেহমানের কাছে জ্ঞানহীন লুসীকে পাই মাশুক। তাদের ধরতে গিয়ে আহত হয় মাশুক এবং হাসপাতালে যায়। মোহসেন লুসীকে উদ্ধার করে। লুসীর ভুল ভাঙে, আহত মাশুককে দেখতে গিয়ে ক্ষমা চায় এবং ঘোষণা করে অর্থ দিয়ে, নিজে খেটে তার গবেষণায় সাহায্য করবে। মাশুকের সম্মতি নিয়ে লুসী ক্লাব ছাড়ে। তাদের বিয়ের পর, মাশুক ল্যাবরেটরীতে ব্যস্ত। তখন মোহসেন গর্বে বলে — "আমি বোরখা পরেই না ওর বোরখার বাঁধন খুলেছি। সমস্ত নারীজাতির আমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ।" ওদিকে খলিল জানলা বন্ধ করতে গেলে স্ত্রী বাড়ি থেকে চলে যেতে চাই। অবশেষে খলিল বদলে গিয়ে জামাই এনে ধুমধামের ব্যবস্থা করে। — এভাবেই আধুনিকতার সঙ্গে গোঁড়ামীর ভুল ভেঙে 'যুগসন্ধি' ঘটেছে। নাট্যকার নাটকে মুসলমান সমাজ ও ধর্মের ব্যাখ্যার মধ্যদিয়ে আধুনিক সমাজকে স্পষ্ট করেছেন। গোঁড়া সমাজ কতটা অমানবিক, রক্ষণশীল হতে পারে, আবার আধুনিকতা মাত্রাছাড়া হলে স্বাধীনতার নামে কিরূপ স্বেচ্ছাচারিতা জন্ম নেয়, তাও দেখানো হয়েছে। শেষাবধি সমাজ ধর্মের বাঁধনে থেকেই যথার্থ মনুষ্যত্ব সৃষ্টি ও সমাজকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন নাট্যকার। অন্তত সেই ইঙ্গিতেই নাটকে যবনিকা নেমে এসেছে।

৬। আবুল ফজল : কথা সাহিত্যিক আবুল ফজল পূর্বপাকিস্থান সৃষ্টির পর স্বল্পায়তনের কয়েকটি নাটক লেখেন।

ক) 'কবির বিড়ম্বনা' নাটিকাটির দৈর্ঘ্য নয় পৃষ্ঠা মাত্র। এ নাটকে আরবী ভাষার প্রচলন ও সমকালীন সমাজের সংস্কারের প্রকাশ। খলিল নামের কবি কবিতা লিখতে গিয়ে ডাক্তার, উকিল, মোক্তারের কবিতা নেবার আব্দারে বিরক্ত। ছেলে পাগল হয়েছে ভেবে কবির মা ওঝা ডাকে। ওঝার পোশাকে মুসলমানের পরিচয় — "(লম্বা দাড়ী, লম্বা কোর্ত্তা, হাতে লাঠি ও একটি কেতাব, মাথায় টুপী পরণে লুঙ্গি)"। মায়ের আব্দার "মিঞাজি আমার মনিকে বাঁচাও। ওঝার সিদ্ধান্ত "পরীর আদর", তাই কবির যুক্তিকে অগ্রাহ্য করে আমের ডাল পেটা করার বিড়ম্বনাতে সমকালীন বঙ্গে

সংস্কার ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাস প্রকাশিত। ওঝা পীর পয়গম্বর মহম্মদের ভাষা "আরবীতে মন্ত্রপড়ে রোগ সারাতে বদ্ধপরিকর।

খ) 'ভাই ভাই' নাটিকাতে নাট্যকার ইসলামের সৌভ্রাতৃত্বের আহ্বানকে স্পষ্ট করেছেন — ভাই ভাই মুখে, কাজে নয়। যারা মুখে উদারতা দেখায়, কাজে তা নিজেরাই পালন করে না। সৈয়দ হামির আলির বক্তব্যও ঘটনাতে ইসলামী অনুশাসন আলোচিত। হুকাতে ধুমপান করতে করতে হামীদ সমবেত শ্রোতাদের ইসলামের উপদেশ শোনাচ্ছে — "ভাই সব, আল্লাহ তালা বলেছেন ঃ ইন্নামাল্ মুখে মুনা এখওয়াতুন; অর্থাৎ সব মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই, রোমের বাদশাহ্ থেকে পথের ফকির পর্য্যন্ত সব এক বরাবর। এটি আমার, ওটি তোমার বলে মুসলমানে মুসলমানে ফরক্ করা বিলকুল হারাম। "মাহিনার কথা স্মরণে সাম্যবাদী, ধর্মপ্রেমের কথা ওঠে। কিন্তু "আজ সেই বিশ্বজয়ী উদার মহাপ্রাণা মুসলমানের বংশধর আমরা কোথায় পড়ে আছি", ইত্যাদি স্তানে সৈয়দ জানায় "খাটি মুসলমান হ'তে হ'লে কোরাণের হুকুম মানতে হবে।" সকলে সাচ্ছা মুসলমানের শপথ নেয়। "সকলে খোদার দরগায় মুনাজাত করি; আমীন, এয়া রবকুল আলামীন, এয়া আল্লা, তুমি মুসলমানকে দীনদুনিয়ার মালিক কর।" এবং নিজেকে ধনী প্রেসিডেন্ট করার আবেদন জানায়। এসময় শ্রোতারা ইসলামের সাম্যবাদী শপথে উদ্বুদ্ধ হয়ে — সৈয়দের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে কেউ তার টুপী নমাজ পড়তে, কোট, জামা, চটি, গায়ের গেঞ্জি খুলে নিয়ে "ইসলামের ভ্রাতৃত্বের জয়" দিতে দিতে বিদায় নেয়। চাষীরা সৈয়দের ১০ বিঘে জমি চাই, কেউ থাকতে চাই, কেউ মামলা তুলে নিতে বলে, কেউ বলে সুদ দেব না। সৈয়দ চীৎকার করলে তারা সমস্বরে বলে "আপনার প্রচারিত ইসলামী উদারতায় আপনাকে গুণাহ্ করতে দেবনা।" সৈয়দের খাসী কেটে কোর্মা পোলাও এর ব্যবস্থা হয়। সৈয়দ চীৎকারে জানায় সে মুসলমান নয়, হতে চাই না, পুলিশ ডাকে, পুলিশ এলে সৈয়দ মুক্ত হয়।

গ) 'বোরখা' তেও মহি, মলি, মতি তিনবন্ধুর প্রথম জন মুসলমান। বেকারত্ব ঘোঁচাতে এস. ডি. ওর, বাসায় এসে স্ত্রীকে সম্মান দেয়নি বলে ধমকে যায়। মেয়েদের সম্মান রাখতে তারা বোরখা পরা শুরু করে, এই আত্মত্যাগে চোর বলে ধরা পড়ে ও বিচারে এস. ডি. ও. তাদের চাকরী সহ মুক্তি দেয়। শেষে তাদের স্ত্রীরা 'বোরখা' পুড়িয়ে 'বোরখা পরা বৌ" হবার দুর্নাম থেকে উদ্ধার হয়।

ঘ) 'প্রগতি' তে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিত যুবাদের সঙ্গে গোঁড়া মুসলমানের মানসিক দ্বন্দ্ব, এতে উচ্চাশিক্ষিতই বড়, ধর্মান্ধতা পর্যুদস্ত। মেসে বসে জাফর, জলিল, ওয়াহেদ প্রসুনরা সৎ উদ্দেশ্যে উন্নত প্রগতির শপথ নেয়। মেয়েরা সে দলে আসেনা। কিন্তু জাফর কলেজ গার্ল তাহেরাকে চিঠি লিখে তাদের বাড়ীতে এলে মেয়ের বাবার সঙ্গে

প্রগতি ও রক্ষণশীলতার বিরোধ বাধে। জাফর তাহেরা পরস্পরকে হৃদয়ে গ্রহণ করে; কিন্তু তাহেরার বাবা জাহেদ সাহেব বিবাহ প্রস্তাবে রাজী হ'ন না। বাড়ীতে কদিন বাদে বিয়ের মজলিস বসে অন্যের সঙ্গে বিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে — "আচকান জোব্বা" পরে মৌলভী "মেয়ের এজিন" (সম্পত্তি) নিতে গিয়ে আর ফেরেন না। মুসলমানী বিবাহ রীতিতে পাত্র পাত্রীর মত নিতে হয়। এসময় জাফর বিবাহ সভায় উপস্থিত হয়ে প্রতিবাদ করে বলে — 'ইসলামের বিধান হল সাবালিকা মেয়ের সম্পত্তি নিয়েই বিয়ে দিতে হবে।" কিন্তু এই মুসল্মানরা তা মানছেন না, প্রগতি সংঘ এ সহ্য করবে না। বড় হায়দার ইলাম বিরক্ত হলে, জাফর মেয়ের চিঠি পড়ে শোনায় — "শুক্রবার বলি দেবার ব্যবস্থা হয়েছে, বাঁচান"। "শরিয়তের হুকুম" মত ছাড়া বিয়ে নয়। এ বিয়ে ভাঙল। জাফরের সঙ্গে পর্দার আড়াল থেকে সম্মতিতে তাহেরার বিয়ে শুরু হ'ল। তখন "কোরাণের..........আয়াৎ পাঠ করে..........দেন মোহরে........ পরষ্পরকে স্বামী স্ত্রী রূপে" স্বীকৃতি জানিয়ে মৌলভী সংক্ষিপ্ত মোনাজাত করে।" তাদের সুখী জীবন কামনা করলেন। বর-বৌ নিয়ে সকলে হৈ চৈ করে চলে গেল— যবনিকা নামল।

৭। বন্দে আলী মিঞা ঃ

ক) 'কামাল আতাতুর্ক' ছোট ছোট দৃশ্যে বিভক্ত হয়ে ধারাবাহিক ভাবে 'মাসিক মোহাম্মদী' তে নাটিকাটি বেরোয়, কিন্তু মাত্র ১টি সংখ্যা (১৩৪৬ ফাল্গুন) র পর আর নাটিকাটি শেষ হয়নি। তবুও প্রকাশিত পাঁচটি দৃশ্যে তুরস্ক দেশের ছায়ায় ভারত বর্ষের মুসলিম নেতা ও নাট্যকারের স্বদেশ চেতনায় পরিচয় পাওয়া যায়। এ অংশের সাতটি চরিত্রই মুসলমান। নব্য তুর্কীর সুলতান গাজী মোস্তফা কামাল পাশা, মা জোবেদা, খালেদা - আদনান, আলি ফৌজ, ইসমত পাশা, আরিক কামালের সহযোগী অনুচর; স্টাফ অফিসার, কামালের প্রণয়িনী লতিফা ও তুরস্ক সুলতান ওহীদুদ্দীন। কামাল সুলতানের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, মা জোবেদা চিন্তিত। কিন্তু কামাল সমকালীন বঙ্গীয় যুবকের ন্যায় "পুরাতন আইন" নয় শাসন সংস্কারে "গণতন্ত্রের 'প্রতিষ্ঠায় দেশে শান্তি আসবে বলেছে"। আর সে একা নয়, "শত শত গুপ্ত সমিতি আজ" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মা "খোদার" উপর ভরসা করে সমর্থন করে। স্বদেশ রক্ষার্থে অনুরাগীদের নিয়ে সমবেত হয়ে কামাল " খোদার অনুগ্রহে" যুদ্ধে নেমে জয়ী হয়েছে। মহিমময়ী লতিফা ভালবাসার টানে জোবেদের মৃত্যু শয্যা পাশে এসে রাজী হয়েছে কামালকে বিয়ে করতে। তবে প্রচলিত মুসলমান সমাজে (এ নাট্যাংশের মত) নারীর এই স্বাধীন চলাফেরা ও মতপোষণ একটু অস্বাভাবিক। কামাল জিন্দাবাদ ধ্বনিতে সকলে বন্দী সুলতান ওহীদুদ্দীনের সিংহাসনের দিকে এগিয়ে চলেছে-। এরপর নাটকটির প্রকাশ অজ্ঞাত।

খ) পরবর্তী নাটক 'মসনদ' (১৯৪৮) : এর চার অঙ্কের ২৪ দৃশ্যে মুসলমান সমাজ পরিচয় বিস্তর। পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে মুসলমান সমাজ প্রথমে গ্রহণ করেনি, ফলে সভ্যতার সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি, গোঁড়ামি কুসংস্কারকে প্রাধান্য দিয়েছে। — একারণেই নাট্যকার ইতিহাস ও কল্পনার আশ্রয়ে 'মসনদ' নির্মাণ করেছেন। নাটকটি বঙ্গদেশে জনপ্রিয় হয়ে ছিল, চারটির বেশী সংস্করণই সে প্রমাণ দেয়। পটভূমি কাবুল - আফগানিস্থান হলেও বিষয় মূলত: ইসলামের উত্থান-পতন, মুসলমান সমাজ। আফগান বাদশা আমানুল্লা রক্ষণশীল সমাজ ভেঙে মৌলবাদী ধর্মীয় কুসংস্কার নিশ্চিহ্ন করে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার মাধ্যমে দেশ-জাতিকে উন্নত করতে সমস্তরকম প্রচেষ্টা চালান, নির্দেশ দেন। বেগমের আহ্বানেও নারীকুল এগিয়ে আসে। "মেয়েদের পর্দা আর বোরখা ছিন্ন" করে আধুনিক পোশাকে শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে আধুনিকা করা হবে। তারা শপথ নেয়" বোরখা পরবো না .... বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার করবো না। .... পুরুষের অধীনতা স্বীকার করবো কিন্তু যথেচ্ছাচার মানব না, স্কুল কলেজ নিয়মিত বিদ্যাভ্যাস করবো। ....পিতামাতার নির্বাচিত ব্যক্তিকে না দেখে বিবাহ করবো না।" (১/৬) ইত্যাদি। ব্যাধিগ্রস্থ সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে সুস্থ করতে মাদ্রাসা তুলে যথার্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া, শুধু " আরবী ফারসী" নয় ল্যাটিন শেখা, রেল প্রতিষ্ঠা, মোটর এরোপ্লেনের বিস্তর প্রচলন, নমাজের নামে সারাদিন ছুটির বদলে ২ঘন্টা ছুটি, বিনা ব্যয়ে বাধ্যতা মূলক শিক্ষা প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণে দেশ উন্নতির পথে। আমামুল্লার ভাষায় — এদেশের রক্ষণশীল মোল্লারা সভ্যতার পথে নয় "মোল্লা সেজে খোদার কলমা বিক্রী", বিবি তালাকের ফতোয়া জারী করছে।" বিশ্ব উন্নয়নশীল হলেও তারা প্রাচীন অন্ধকূপে বসে ঘোষণা করছে— "সঙ্গীত নিষেধ, ভাষ্কর্য, চারুশিল্প, সুদ গ্রহণ হারাম।" এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াতে মোল্লাপন্থীরা সমবেত হয়েছে, তারা "পবিত্র ইসলামের কোরাণ হাদিসের" অপমানের বিরুদ্ধে; "রসুলে করিমের পায়জামা, আচকান, কুর্তি, আরবি পারসি খোদার খাস্ জবান্, জেনানা আওরতের পর্দা পুশিদা" (২/১) নষ্ট করেছে। সে কারণে অশিক্ষিত প্রজাদের নিয়ে বিদ্রোহে আমানুল্লা পরাভূত হয়েছে। ধর্মের ভণ্ডামী করে হাবিবুল্লা মসনদে বসেছে। আল্লাহ্ প্রদত্ত স্বপ্নের গল্প ফেঁদে 'পয়গম্বর', 'পীর' হয়েছে, সকলে তার "পদতলে পড়িয়া সেজদা" অর্থাৎ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। হাবিবুল্লা বলে কোরাণের "দ্বিতীয় পারায় .... খোদা তালা" বলেছেন — "দেশ আল্লাহর সম্পত্তি এবং তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই দান করেন। আমার বক্তব্য সম্মন্ধে আপনারা খোদাকে সাক্ষ্য মানতে পারেন, আমি তাঁর প্রেরিত রসুল" (৪/২)। কিন্তু হাবিবুল্লার ধর্মীয় গোঁড়ামীর বাড়াবাড়ি, বাঈজী নৃত্য, গীত, মদে নিরীহ প্রজা অতিষ্ট হয়ে হিন্দুস্থানের পথে পা বাড়িয়েছে। জেনারেল নাদির, এনায়েতুল্লার মিলিত কান্দাহার

থেকে আনা, ইটালীর সাহায্যে বিদেশী হটাতে বদ্ধপরিকর। আনামুল্লা সব হারিয়েও জন্মভূমি তার "সূতিকাগার", সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেছে।

৮। নাট্যকার ইব্রাহিম খলিল :

'সমাধির' পর **"স্পেন বিজয়ী মূসা"** (১৯৪৫) খলিলের ২য় গ্রন্থ। স্বল্পকালে চারটি সংস্করণ নাটকটির গুরুত্ব - জনপ্রিয়তার প্রমাণ দেয়। নাটকে নাট্যকার খলিল স্পেন বিজয়ের মূল হোতা মহাবীর মূসার গৌরবমন্ডিত ঘটনাকে তুলে ধরেছেন। মূসার আদেশে তারিক মাত্র সাত হাজার সৈন্য নিয়ে কিভাবে অসংখ্য খৃষ্টান সৈন্যের মোকাবিলা করে স্পেন জয় করে ইসলামের প্রতিষ্ঠা করে — এটাই নাটকের মূল বিষয়বস্তু। এই কাহিনীতেই 'মুসলিম সমাজে রেনেসাঁ', মুসলমানের ধর্মবোধ, মানসিকতা, সমাজের চিত্র রয়েছে। 'বিজাতীয় আদর্শের নাটক দেখে দেখেই আমাদের মন ইসলামী আদর্শ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ফলে আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সুখ দুঃখ .... অতীত গৌরব গাথা ক্রমে ক্রমে ধারণা ও অনুধাবণের বাইরে চলে যাচ্ছে। .... মুসলমানেরা .... একেবারে উদাসীন'। এই পথে পা বাড়িয়ে লেখক সত্যই আমাদের ধন্যবার্দাহ হয়েছেন।[১৫] মুসলমান কবির এ বক্তব্য বাংলা নাটক ও বাঙালী মুসলমান সমাজের বাস্তব চিত্র। লেখক স্ত্রী বর্জিত এই নাটকে জাতীয় জীবনের জাগরণ স্বরূপ ইসলামের প্রথম জয়যাত্রার কাহিনী গঠনে দ্বাদশ শতকের ইতিহাস আশ্রয় করে, ভূমধ্যসাগরের পরপারের পটভূমি আনলেও দুনিয়ার মুসলমান সমাজ স্থান পেয়েছে নাটকে।

ভূমধ্যসাগরের বেলাভূমিতে আরব সেনাপতি মূসা, তার পালিত পুত্র তারিককে সামান্য অবস্থা থেকে সেনাপতি হবার ইতিহাস শোনাতে গিয়ে বলেছে — মুসলমান বীর, তারা বিশ্বজয়ী,কারণ "যুদ্ধজয় সংখ্যার বলে নয়, ঈমানের বলে। কতদিন মুসলমানের বুকে ঈমানের জোর থাকবে, ততদিন দুনিয়াতে সে থাকবে অজেয় — অপরাজেয়; .... কীর্তিমান - বিজয়ী।" (১/১) ইসলামের 'নবী' ব্যক্তিজীবন দিযে সেই আদর্শ রেখে গেছেন। খৃষ্টান মুসলমানকে ভয় পাই, ধর্মপ্রচারের জন্য সম্রাট পাদ্রীরা সমবেত হতে চাই। কিন্তু ফকীরের গানেও "কোরাণের আয়াৎ" ধ্বনিত হয় আকাশে বাতাসে। "আল্লাহ তালা কোন জাতির অবস্থা কোনদিনই বদললান না, যে পর্যন্ত সে জাতি নিজের অবস্থা নিজে না বদলায়।" (১/৩)। মুসলমানের মহত্ব প্রকাশ পেয়েছে মূসার সংলাপে — "নিখিলের সব সত্যেরই সমন্বয় হয়েছে কোরাণের পবিত্র আয়াতে।........ মুসলমান ভীরু জীবের দাসত্ব করেনা, তার নসীবই করে তার

১৫। নাটকে ৩য় সংকলনে 'পরিচারিকা' তে কবি গোলাম মোস্তাফা লিখেছেন — 'তাঁর সাহিত্যে দেখতে পেয়েছি একটা সৃষ্টির বেদনা, একটা সুদূর প্রসারী দৃষ্টি ভঙ্গী, আর দেশ ও জাতির প্রতি একটা আন্তরিক মমত্ব বোধ।'

গোলামী। অদৃষ্টের সমুদায় প্রতিরোধকে পদদলিত করে শক্তি ও সত্য প্রতিষ্ঠার নামই ইসলাম" (১/৩)। খৃষ্টান দুনিয়ায় মুসলমানের বীরত্বকে শ্রদ্ধা করে, যুদ্ধে হেরেও তার লজ্জা হয়না কারণ 'মুসলমানেরা বীরের জাতি"। সন্ধি প্রস্তাবে মূসা খৃষ্টান শিবিরে আসে, কেননা এরা "মানুষের মর্যাদা দিতে জানে।" মূসা ইসলামের প্রশংসায় বলে — "আল কোরআণের আদেশ কারুর ধর্মে আঘাত দেওয়া কোরআণের নিষেধ। ...... ইসলামের সৌন্দর্য্য দেখে কেউ সে ধর্ম গ্রহণ" করলে ইসলাম তাকে গ্রহণ করে"। তারিকের কথাতে — "ইসলাম সর্বমানুষকে এক করে দেয়। .... ইসলাম চায় শান্তি, ইসলাম চায় মানুষে মানুষে আত্মীয়তা, হৃদ্যতা আর সম্প্রীতি। .... মুসলিমের জন্য তামাম দুনিয়াই তার স্বদেশ।" তবে ইসলামের মহত্ব সর্বত্র যে বাস্তব নয় তারও নাট্যকার সাক্ষর রেখেছেন — তারিকের আহ্বানে খৃষ্টানের বিরুদ্ধে যুদ্ধোন্মাদ মরোক্কো অধিবাসী বলে যথার্থ কথা — "ধর্ম হ'ল আমাদের মত গরীবদের জন্য। যারা বড়লোক তারা ধর্মকে থোড়াই কেয়ার করে। বড়লোকেরা ধর্মের পেছনে ছুটে না, ধর্মই তাদের পেছনে কাতরে মরে।" মুসলমান সৈন্যদের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার সময়ের শপথে মুসলমানের কলমা — "কলমায় তৌহিদ — লা — ইলাহা ইলাল্লাহ" ধ্বনিতে সমাজ পরিচয়। যুদ্ধে স্পেন পরাজিত, মুসলমান জয়ী হয়ে "প্রজাদের আজাদী" দিয়েছে। পরবর্তী যুদ্ধে ইসলাম সৈন্যদের স্পেন সম্রাট সৈন্য ঘিরে ফেললে তারিক ইসলামের গৌরব গাথা গেয়েছে সৈন্যদের উত্তেজিত করতে "আজ যদি .... ইসলামী ঝাণ্ডা বিধর্মীর পদদলিত হয়, তবে বলুন, রোজ কিয়ামতের দিনে হযরতের কাছে এর কী জবাব দেব।" অবশেষে মূসা এসে সকলকে পরাজিত করে জয়ী হয়েছে। বিজিত দেশে মূসার ঘোষণা করেছে— "সমুদয় বন্দীই মুক্ত — আজাদ। .... রাজা, প্রজা, ব্যারণ, আমীর বিশপ কেউ কারুর চেয়ে ছোট বড় নয়। এদেশে সকলের অধিকার সমান। .... আজথেকে স্পেনে একটি মাত্র আইন বলবৎ থাকবে .... সাম্য। মৈত্রী! আর স্বাধীনতা।" (৩/৩)। সমগ্র নাটকে নাট্যকার ইসলামের জয়গান, মুসলমানের সাম্যপ্রীতির উল্লেখযোগ্য সাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু নাট্যকার উদার বাস্তব সম্মত দৃষ্টিতে সমাজ ব্যবস্থাকেও তুলে ধরতে দ্বিধা করেননি।

৯। মুনীর চৌধুরী :

এ অধ্যায়ের শেষ নাট্যকার অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর কতকগুলো নাটকে মুসলমান সমাজের পরিচয় রয়েছে, সমকালীন সমাজ বাস্তব পরিস্থিতির দৃষ্টিতে (১৯৫০ পরবর্তী নাটকে আলোচনায় গৃহীত হয়নি)। ছোট ছোট চিত্রে, আয়তনে মানব দরদী নাট্যকার সমাজের বিশেষতঃ মুসলমান সমাজের বিভিন্নদিকের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন।

ক) 'মানুষ' ছোট্ট নাটক "মানুষ"। ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য বহন করে নাট্যাকারে প্রকাশিত; রচনাকাল ৯ই মার্চ ১৯৪৭ সাল। পটভূমি ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। মাত্র ন'টি পাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বাস্তব মিলন চিত্র। আবার নিজের সন্তান মোর্শেদ হিন্দুর ছোরায় নিহত, জনৈক হিন্দু 'লোকটা' মেডিকেলের ছাত্র, হঠাৎ এসে স্মরণাপন্ন খোঁকাকে বাঁচিয়েছে — তার একমাত্র পরিচয় সে 'মানুষ', সে খোকার 'ভাই', আল্লার সন্তান। তাই সকলে ধর্ম- সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে উঠে পরিণত হয়েছে যথার্থ 'মানুষ'- এ।

ক্রুর- চক্রান্তকারী মুষ্টিমেয়র পঙ্কিল মানসিকতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেঁধেছে— নাট্যকারের পটভূমির নির্দেশেই সে চিত্র — "পর্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শোনা যাবে, দূরে বহুকণ্ঠের মিলিত ধ্বনি বন্দেমাতরম। এবং একটু কাছের প্রচণ্ড আল্লাহু আকবর রব। .... আবছা আলোতে আম্মাজানের ক্লান্ত উদ্বিগ্ন মুখে এক অদ্ভুত বিষাদ ভরা গাম্ভীর্যে স্তব্ধ। শিশুর অন্যপাশে পানির গ্লাস হাতে নিয়ে কিশোরী জুলেখা। .... টেবিলের সামনে খাটের দিকে পিছন ফিরে, কোমরের পিছনে দুহাত মুঠ করে দাঁড়িয়ে আছেন আব্বাজান। .... দ্বিতীয় ছেলে ফরিদ নিশাচর কোনো পশুর মতো সন্তর্পণে সামনে পায়চারী করছে। থমকে দাঁড়াচ্ছে। চোখে মুখে প্রতিহিংসার বাজি। দূরে ধ্বনি উঠল বন্দেমাতরম। তিনবার, হাজার কণ্ঠের আকাশ কাঁপানো হুংকার। তারপরই, তীব্রঅন্ধকার ছিন্ন ভিন্ন করে পাল্টা আহ্বান আল্লাহু আকবর"—দাঙ্গা বিধ্বস্থ মানসিকতায় বিমূঢ় পরিবার — বাইরের পরিস্থিতির ইঙ্গিতে নাটক শুরু। প্রায় অপ্রকৃতিস্থ আব্বাজান বড়পুত্র মোর্সেদের জন্য চিন্তিত যথার্থ পিতার মত। বাইরে দাঙ্গা, ছেলে ঘরে ফেরেনি। তাঁর বক্তব্য "সালাউলের ছুরির খোঁচার মরণ ওর তক্‌দীরে লেখা ছিল"। তিনি মনে করেন মোর্সেদকে কেটে ফেলেছে, পুত্রের কাটা মুণ্ডর বীভৎস মূর্তি তাঁর মানস পটে বিধৃত — "আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, ওরা ওর কাটা মুণ্ডকে কাঁসার থালায় সাজিয়ে ফেরি করে বেড়াচ্ছে, ... ফুর্তির খাতিরে মুঠো মুঠো টাকা পয়সা ছড়িয়ে দিচ্ছে আমার ছেলের নরম সাদা গলাকাটা লাশের উপর ...." ঠিক তখনই আম্মাজান শিশুর নীলমুখ দেখে "খো দা আ" উচ্চারণ করলে আব্বাজান ক্ষুব্ধ, ডাক্তার আনতে বলেও নিষেধ করেন — কারণ বাইরে দাঙ্গা। দরজায় করাঘাত হলে তারা ভাবে মোর্শেদ ফিরে এসেছে কিন্তু না, গ্রামবাসীরা এসে জানায় হিন্দু যুবক পাড়ায় এসেছে, তাকে পেলে "কচুকাটা" করা হবে। ফরিদ বাবাকে পিস্তল দিয়ে ছোরা হাতে বেরিয়ে পড়ে দাদার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে। বাবা চমকে উঠলে ফরিদ বলে, "যারা তার ভাইয়ের মাথা কাটে, দুধের বাচ্চাকে হত্যা করতে যারা হাতিয়ার তোলে সে সমাজের সঙ্গে লড়াই করতে হাতে ছোরা নিয়েছি"। ফরিদ বেরিয়ে গেলে রুগ্ন শিশুর অবস্থা খারাপের দিকে যায়। আব্বার প্রশ্ন "নিষ্পাপ শিশু কি দোষ করেছে যে তাকে মরতে হবে?" চিকিৎসার

সুযোগ নেই দাঙ্গার জন্যই। তখনই 'লোকটা' নামধারী হিন্দু ডাক্তার ছাত্রটি বাড়ীতে ঢোকে। তার পরিচয় — "আমি - মানুষ। আব্বা। মানুষ? লোকটা। মানুষ, হিন্দু।" সে বন্ধুর বাড়ী এসে দাঙ্গার ঝামেলায় পড়েছে, বন্ধু নিরাপত্তার ভার নিতে পারেনি তাই সে আশ্রয় প্রার্থী। পরে সে মৃত্যু ভয় উপেক্ষা করে ডাক্তারের ধর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে রুগ্ন শিশুর চিকিৎসা করেছে। বলেছে "দেখবেন ভাইটি আমার এখনই খলখল করে হেসে উঠবে।" আব্বাজান সবই 'খোদার করুণা' 'ইনসাফ বলে মনে করেছেন। ঠিক তখনই মুসলমানেরা লোকটাকে 'হিন্দু' অপরাধে হত্যা করতে এসেছে। গোসলখানা প্রত্যাগত 'লোকটাকে' আম্মাজান আশ্রিতের প্রতি মুসলমানের কর্তব্যে মশারীর মধ্যে রেখে পর্দানসিনতার পাঁচিল তুলেছে। যথার্থ মায়ের মতো সন্তানকে বাঁচিয়েছে। অভয় দিয়েছেন "তোমার কোনো ভয় নেই। শরীফ খানদানের পর্দানসিন মহিলা আমি, মশারীর ভেতর থেকে একবার কথা বললেই" সকলে ফিরে যাবে — গেছেও। এখানে ইসলামের 'পর্দা' যা মুসলমান নারীর 'আব্রু', সেই উন্মত্ত গামবাসীর হাত থেকে 'মানুষ' কে বাঁচিয়েছে। মানুষই বড় মানুষের কাছে, আম্মার কাছে বড় সন্তান -পর্দা নয়। ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধে উন্মত্ত ফরিদ এসে সব জেনেও তাকে মারতে পারেনি, সেও 'লোকটা' ও 'আম্মার' প্রভাবে 'মানুষ' হয়ে উঠেছে। এক মোর্শেদকে হারিয়ে আব্বাজান ও শোকার্ত পরিবার আর এক মোর্শেদকে পেয়েছে — সকলে যথার্থ "মানুষ" হয়ে উঠেছে।

খ) 'বেশরিয়তি' মুনীর চৌধুরীর আর একটি নাটক। ১৩৫৪-শ্রাবণ সংখ্যার 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত, নাটকে উচ্চশিক্ষিত যুবক শিক্ষিতা যুবতীর সঙ্গে শরিয়াতি রক্ষণশীলতার স্বপ্ন চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। গোঁড়ামীকে ভেঙে নব্যআধুনিক হবার শপথ গ্রহণই নাটকে মূল বিষয়। জাফর, লায়লা, আরবা, চাকর, দু'ভাই লায়লা, কে নিয়ে মুসলমান সমাজ পরিচয়ে নাটকটি গড়ে উঠেছে। নাট্যকার দৃশ্যও মঞ্চের নির্দেশ দিতে গিয়েই পর্দানসিন মুসলমান সমাজ, পরিচ্ছদ, শরিয়তি বিধানও তাকে ভেঙে ফেলার ইঙ্গিত রেখেছেন—" রঙ্গমঞ্চের একেবারে সম্মুখ ভাগে একটা বড় টেবিলের ঠিক মাঝখান দিয়ে একটা কাল পর্দা অত্যন্ত হেকমতের সঙ্গে ঝোলান, ... পর্দার দুপাশে বসে দুটি মানুষ, ... মেয়েটির বয়স আঠারো .... ফিকে সবুজ সাটিনের সেলওয়ার থেকে আরম্ভ করে গায়ের বুটীদার সাদা মুগা পাঞ্জাবীটার ভাঁজে ভাঁজে একটা জোর করে আয়ত্ত করা পরিপাট্যের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। .... এ মেয়ে নিতান্ত ক্ষনস্থায়ী সাজানো-গুছানো ঐ শান্তিময় আবহাওয়াটাকে যে কোন মুহুর্তে ভেঙ্গেচুরে একাকার করে দিতে পারে। চোখ জোর করে পর্দার উপর মেলে রাখা, হাতদুটো জোর করে টেবিলের ওপর শান্ত করা। যে কোন মুহূর্তে সব কিছু আলুথালু, বিস্ত্রস্ত ও বিবসনা হয়ে যেতে পারে। পর্দার এপাশের তরুণ মেয়েটির শিক্ষক.......

ফর্সা লম্বা মুখে কাল একপলতা চাপ দাড়ি, মাথায় কোকড়ানো সাদা পশমের টুপি, গায়ে কালো আচকান।" অর্থাৎ ঘনপর্দার আড়ালে বসে পড়াশোনা হলেও, পর্দার বাঁধন কেউই মানতে রাজী নয়। মেয়েটি লায়লা — খারিফকে জিজ্ঞেস করে 'টুপি পরেন কেন?" মাষ্টারের কৌতূহল "তুমি দেখলে কি করে?"। লায়লার উত্তর "গরাদের ফাঁদ দিয়ে .... চিড়িয়াখানায় খাঁচা বন্দী বাঘ" দেখার মতন করে "ঘরের দরজার পর্দার ফাঁদ দিয়ে" দেখেছি। মাষ্টার তাকে জাফর ভাই সম্মোধনের আদেশ দিয়ে টুপি পরার কারণ হিসেবে জানাই— 'টুপি পরি মুসলমান বলে। আর তুমি ঘাবড়ে গেছেলে কারণ এর আগে কোন বলিষ্ঠ তরুণ মুসলমান জ্ঞানী ছেলে তোমার সামনে টুপি মাথায় দিয়ে চলেনি বলে! বিকৃত সমাজের আওতায় গড়া তোমার মন মিথ্যেকে ভাববেসে এত অভ্যস্ত যে সবসময় সত্যকে সইতে পারবেনা — তাই।" কিন্তু লায়লার ধারণা— "বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম হয়ে .... ইকনমিক্সে এম. এ. পাশ" করেও এরূপ আচরণ" আপনি টুপি পরেছিলেন আব্বাকে কাবু করার জন্যে।" আসলে এরা শরিয়ত মানে, নিজেদের মুসলমান বলেই স্বীকার করে; কিন্তু শরিয়তের নামে 'গোঁড়ামী' আর 'সংস্কার' কে সহ্য করে না। তাই দুজনে ঠিক করে — এই পর্দার বাধা দূর করতে বিদ্রোহ করবে, দুজনে একে অপরের সাহায্যে হাত বাড়ায়। চাকর মাষ্টারের চা - খাবার নিয়ে এলে জাফর সাহেবের খোঁজ নিলে, চাকরের উত্তরে মুসলমান সরাসরি — "ফজরের নামাজ পড়ে ভোররাতে শুয়োর শিকারে" গেছেন। লায়লা জানাই "বন্দুক আর পর্দাতে তার একমাত্র নেশা", এখন অবধি একমাত্র তার আব্বা — "পুরুষকেই সামনা সামনি" দেখেছে। বাবার এভাবে পর্দা ঘিরে বাড়ীতে পড়ানোতে লায়লার সমর্থন ছিলনা। মেয়ে কলেজে ভর্তি হতে চেয়েছিল, কিন্তু পিতা জানিয়েছেন "লেখাপড়া শিখলে বেহায়া, বেআব্রু, বেশরম হবার প্রবল ইচ্ছা তার মেয়ের ও যে জাগতে পারে একথা নাকি তাঁর আগেই ভাবা উচিত ছিল।" অবশেষে তারা ঠিক করেছে পর্দাটিতে আগুন লাগিয়ে বিদ্রোহী হবে। জাফর বলে "আকাশচুম্বী লোহার কাপড়টাকে ডিঙ্গিয়ে" নারীর চোখের জল মুছতে সে বিদ্রোহিণীর পাশে দাঁড়াবেই। শুনে মুগ্ধ লায়লা বলেছে "দাও, জ্বালিয়ে দাও জাফর ভাই। দেশলাই দিয়ে আগুন লাগিয়ে দাও। আমাদের মাঝখানের কালো কুৎসিৎ দেওয়াল পুড়ে ছাই হয়ে যাক — চমৎকার হবে দেখতে"। কিন্তু আবার ভয় করলে জাফর যথার্থ বলেছে "একলা আছো বলেই ভয় করছে। দুজনে হাত ধরাধরি করে দাঁড়ালে ঐ কালো পর্দাটাই তখন হয়ে উঠবে বাইরের ঘন দুর্যোগের বিরুদ্ধে আমাদের কঠিন দুর্গ।" কেননা ইসলামেরই নির্দেশ - শিক্ষিত সাবালিকা নারীর অনুমতি ও পছন্দর পাত্রীর সঙ্গে ছাড়া বিয়ে জোর করে দেয়া যায়না। পিতা শিকার থেকে ফিরে এসে ক্রুদ্ধ হয়েছেন স্বাভাবিক ভাবেই; জাফর ইতিমধ্যে আজকের মত বাড়ী গেছে। আব্বা

জানায় — "লোকটা নাকি প্রবন্ধ লেখে বড় বেহুদা, বেফয়দা, বেশরিয়তী কথা নিয়ে।"— কিন্তু তিনি কি করবেন ভেবে পাননি। এ নাটকে বাঙালী মুসলমান সমাজের রক্ষণশীল শরিয়তীর বাড়াবাড়ি মানসিকতার গোঁড়ামীকে আঘাত হেনেছেন, যথার্থ নব্যচিন্তায় উদ্গত বাঙালী যুবক যুবতীর মানসিক চিত্র এঁকেছেন স্বনামধন্য নাট্যকার মুনীর চৌধুরী — সন্দেহ নেই।

গ) **'নষ্টছেলে'**-র রচনাকাল ২৩.০৮.১৯৫০। সামাজিক এই একাঙ্কের নটি চরিত্রই মুসলমান। ছোট দুটো দৃশ্যে একপরিবারের স্বদেশপ্রেমী কন্যাও তাতে প্রলুব্ধ কিশোর কিশোরী ভাইবোনের আত্মত্যাগের মহিমায় ঘটনা চিত্র মনে দাগ কাটে। ঘটনার আবর্তে ভেসে ওঠে মুসলমান সমাজ। দর্শনের অধ্যাপক এম্রান রাতে বই পড়তে বসে ১২ বছরের ভাইপো আমিনের কাছে জানতে পারেন। তার মা দিদির জন্য কাঁদছে। কারণ দিদি দেশের জন্য সরকারের চোখে শত্রু। এম্রান ক্ষুব্ধ মায়ের অবস্থা বর্ণনায় আমিনের মুখে মুসলমান সমাজ চিত্র "ঈদের চাঁদ দেখে সন্ধে বেলা মা যখন মোনা-জাত করছিল, আমি দেখেছি, যার চোখের পানি কনুই পর্যন্ত গড়িয়ে নাবছে। কাঁদছে আর কেবল আল্লাকে ডাকছে। "যুবক জাহাঙ্গীর মুসলমানী পোশাকে অর্থাৎ" পরনে কাবুলী পায়জামা, গরম শেরওয়ানী। মাথায় পশমের টুপি" পরে এসে, মুসলমানী অভিবাদন জানাই "আস্‌সালামো আলাই কুল।" এম্রান ব্যঙ্গ করে বলে — "দেখো তোমাদের কিন্তু আমি বড় ভয় করি। মোল্লারা দেশ সুদ্দো চ্যাঁচামেচি করেও আজকাল আর আমাদের বেশী ক্ষতি করতে পারবে না। সবাই ওদের ...... ভেতরের ন্যাংটা চেহারাটা দেখে নিয়েছে। কিন্তু তোমাদের এই নতুন আক্রমণ, বি. এ., এম. এ. শানানো নতুন কলাকৌশল, দেশটাকে ঘায়েল না করে ছাড়বে না।" — স্পষ্টই এম্রান মোল্লাদের ও অতি আধুনিকদের রক্ষণশীলতা এবং উশৃঙ্খলতাকে সমর্থন করেননা। আমিনের বাবা এরতাজুন করিম সাহেব অসাধু ব্যবসায়ী হয়েও, রক্ষণশীল — তিনি বাইরে পুলিশ দেখে ক্ষুব্ধ, উদ্বিগ্ন; নিজের মেয়েকেও স্বীকার করতে চাননা — "আল্লা রসুলের রাহে নয়, বাপ-মায়ের কল্যাণের জন্য নয়, যে মেয়ে কতগুলো শরিয়তী স্বদেশী বুলির মোহে বেহায়া বে-আব্রু হয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরে বেড়ায়, — এরতাজুন করিম তেমন মেয়েকে কন্যা বলে স্বীকার করে না।" পুলিশ খানাতল্লাসী করবে বলে করিম স্ত্রীকে 'বোরখা' পরার নির্দেশ দেয়। রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে খোকা বুঝি দিদি আসার অপেক্ষায় পাহারায় থাকে; বোঝা যায় চাচা এম্রান ও নীরবে তাদের সমর্থন করেন, একসময় 'আপা' অর্থাৎ দিদি আসে। সৎ-সত্যবাদী ভাই আমিনের জন্য ঈদের কোন উপহার আনেনি — বরং নিরস্ত্র মানুষের জন্য 'অনেক মহৎ' ঈদের উপহার চেয়েছে। নিম্নোক্ত সংলাপে মুসলমান সমাজ সহ তার প্রকাশ —" আগামীকাল ঈদ, হাজার হাজার লাখ লাখ

লোক কালও রোজা রাখবে। কারণ তাদের ঘরে খাবার নেই। নামাজ পড়তে যেতে পারবে না, কারণ কাপড় নেই। ঘর থেকে বেরুতে পারবে না ক্ষুধায় লজ্জায়। তাদের জন্য লড়াই করবি তুই।"— এখানেই নাটকের সার কথা। সমাজ বাস্তবতার জীবন্ত ছবি — আর তারই সঙ্গে ধর্ম- অর্থনীতির মিলনের অপরূপ ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে। এরপর পুলিশের চর শিক্ষিত জাহাঙ্গীর এসে আপার কাছে টাকা দাবী করে, অন্যথায় পুলিশে ধরিয়ে দেবার হুমকি দেয়, শান্ত আমিন পিছন থেকে জাহাঙ্গীরের মাথায় "পেপার ওয়েট" দিয়ে মেরে অজ্ঞান করে দেয়। পুলিশ বাড়ী ঘিরে ফেললে— অজ্ঞান জাহাঙ্গীরের পোষাক পরে আপা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশকে বিভ্রান্ত করতে বোরখা পরে দৌড়তে গিয়ে পুলিশের গুলী খায়। আহত অজ্ঞান "খোকার বোরখাবৃত দেহ কোলে নিয়ে" বাবা-মা-চাচা বসে থাকে। জ্ঞানফিরে জাহাঙ্গীর, "বোরখায় ঢাকা আমিনকে চিনতে পেরে চম্‌কে ওঠে"। আপাকে বাঁচতে কিশোর- কিশোরীর এই প্রয়াস সকলকে শুদ্ধ করে দেয়। আমিনের মাথা চাচার কোলে, "বাবার মুখে রা নেই", বে- বোরখা মা এক দৃষ্টিতে সামনের দিকে চেয়ে থাকে — নেমে আসে 'যবনিকা'।

আলোচ্য পর্বের নাট্যকাররা অনেকেই বেশ কিছু নাটক লিখেছেন, কিন্তু অনেক নাটক 'কালের' অতলে হারিয়ে গেছে। সেকারণেই সমস্ত নাটকের আলোচনার ও পূর্ণাঙ্গতার অভাব অস্বীকার্য নয়। তবুও মীরমশাররফ হোসেন, নজরুল ইসলাম এই দুই নাট্যকারদ্বয় মুসলমান হয়েও মুসলমানীকে প্রশ্রয় দেননি। জমিদার নন্দন হয়েও মশাররফ জমিদারদের নৃসংসতার দর্পণ রচনা করেছেন। তাঁর অন্যান্য রচনাদিও উদারনীতির সাক্ষ্যবাহী। নজরুল সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। আলোচ্য পাঁচটি নাটকে সে পরিচয় রয়েছে। তিনিও কোন গোঁড়ামীকে স্থান দেননি। সেকালের আঙিনায় দাঁড়িয়ে বাস্তবের ছবি এঁকেছেন। কিন্তু নাট্যকার খাজা তাঁর ছোট্ট নাটিকাটিতে স্পষ্টতঃই ইসলামের নিয়ম নিষ্ঠতার কানুনাদিকেই প্রকাশ করেছেন ধর্মীয় প্রাচীনপন্থী মানসিকতায়; মুসলমানের দায়িত্ব কর্তব্যর শিক্ষাতেই তিনি সীমাবদ্ধ। ইব্রাহিম খান, ওবায়েদ্-উল হক, আবুল্ ফজল, বন্দে আলিমিঞা, মুনীর চৌধুরী প্রমুখ মুসলমান নাট্যকারগণ গোড়ামী সংস্কারকে নয় — নব্যশিক্ষিত আধুনিক মন নিয়ে মুসলমান সমাজ বাস্তবকে প্রকাশ করেছেন। তাঁরা কোরান, হাদিসকে মেনেছেন, কিন্তু ধর্মের নামে নোংরামীকে সমর্থন করেননি। 'যুগসন্ধির' ঘটনা, নব্যশিক্ষা ও গোঁড়ামীর চরমতম বিরোধের অপরূপ এক মিলন চিত্র। আবুলফজল তাঁর রচনাতে যুক্তিবাদ, মানসিকতা, শিক্ষা কর্মকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। মুখের বাণীকে ব্যঙ্গ করে বাস্তব কাজের মধ্যদিয়ে ধর্মীয় গোঁড়ামীকে পরিহাস করেছেন, সত্যকে আলিঙ্গন করেছেন। আবার 'মসনদ'-এ ইসলামের অনুশাসন বিধৃত হয়েও গোঁড়ামী—নব্যতন্ত্রের দ্বন্দ্বে আধুনিক

মনই গৃহীত। সামাজিক পটের চিত্র। নাট্যকার ইব্রাহিম খলিলও অপরূপ ভঙ্গিমায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রচার করেছেন। মহত্বকে সম্মান জানিয়েছেন। কিন্তু অন্যায় অবিচার গোঁড়ামীকে বাস্তবতার দাঁড়িপাল্লায় ওজন করেছেন নিখুঁত ভাবেই। মুনীর চৌধুরীও আধুনিক মননে মুসলমান সমাজের ও সমকালীন বঙ্গের বাস্তবতাকে হুবহু ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর নাটকে। যুগানুসারে বিচ্ছেদ নয়, হিন্দু-মুসলমাদের মিলনই প্রাধান্য পেয়েছে। ধর্ম বড় নয়; মানুষ অনেক বড়। ধর্ম-সমাজকে রক্ষনশীলতার বেড়া না দিয়ে তিনি সমাজ-দেশ-মানুষের জয়গান গেয়েছেন, অন্যায় গোঁড়ামীকে ক্ষমা করেননি।

উল্লেখ্য, একরামুদ্দীনের 'অনধিকার প্রবেশ' আবুল কাশেম শিকদারের 'অদৃষ্টের পরিহাস', ইমদাদুল হকের ''আওরঙ্গজেব'', সাহাদাৎ হোসেনের 'আনারকলি' প্রভৃতি অনেক নাটক মুসলমান রচয়িতাদের লেখনীতে সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সেগুলো কালের স্রোতে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। ''বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী', গ্রন্থাগারের তালিকাতেই এদের সন্ধান মেলে। পরবর্তী কালেও (১৯৫০ পরবর্তী) মুসলমান নাট্যরচনার ধারা থেমে নেই, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। নুরুল মোমেন জসীমুদ্দিন, শওকত ওসমান, আসকার ইবলে শাইখ, আনিস চৌধুরী, আলিমনসুর, আবুজাফর, শামসুদ্দিন, আহম্মদ ইলিয়াস, খারুল ইসলাম প্রভৃতি নাট্যকারদের বিভিন্ন নাটকে মুসলমান সমাজ বিস্তৃত ভাবেই স্থান পাচ্ছে — এই ধারা ক্রমবর্ধমান। অনেকেই বাংলা নাটকের গতিকে অগ্রগতি দিচ্ছেন, বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রেও 'আলোচিত ভাবনা'র প্রেক্ষিত অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক।



মূল রচনা ও পাদটীকার উল্লেখ ছাড়াও যেসব গ্রন্থ, পত্রিকা ও রচনাকারের কাছে ঋণী

ড. অমলেন্দু দে — বাঙালী বুদ্ধিজীবি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ।
ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (১-৪খন্ড)।
অমিতাভ গুপ্ত — পূর্ব পাকিস্থান।
অমিতাভ মুখোপাধ্যায় — উনিশ শতকের সমাজ সংস্কৃতি।
ড. অরুণ কুমার মিত্র — অমৃতলাল বসুর স্মৃতি ও আত্মস্মৃতি।
অহীন্দ্র চৌধুরী — বাঙালীর নাট্যচর্চা।
ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য — বাংলা সাহিত্যে নাটকের বিবর্তন।
আব্দুল মওদুদ — মধ্যবিত্ত সমাজের আত্মবিকাশ ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর।
আনিসুজামান — মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য।
ঐ — মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র।
ঐ — মুনীর চৌধুরী।
আবুল ফজল — সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ।
আবুল হাসান — শচীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত।
আবুমুহাম্মদ হবিবুল্লাহ — ভারতে ওয়াহাবী আন্দোলন, সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস, ইসলাম ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থা।
আব্দুল করীম — ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম মানস।
আব্দুল মান্নান তালিব — বাংলাদেশে ইসলাম।
আব্দুল হাই — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত।
আমিন সিদ্দিকী — মোগল হারেমের অন্তরালে।
আলি আহসান — সতত স্বাগত।
আল হাজু শইখ শরফুদ্দিন — বাংলাদেশে সুফী-প্রভাব ও ইসলাম প্রচার, ঢাকা।
ইতিহাস রচনা সমিতি — স্বাধীনতা সংগ্রামে নদীয়া।
কাজী আব্দুল ওদুদ — আজকার কথা।
কাজি মোতাহার হোসেন — নির্বাচিত প্রবন্ধ।
কুমুদ বন্ধু সেন — গিরিশ চন্দ্র।

কে. আলী	—	বাংলাদেশ ও পাক ভারতের মুসলমানের ইতিহাস।
খগেন্দ্র নাথ সেন	—	সমাজ বিজ্ঞানের ভূমিকা (১ম খন্ড)।
ক্ষিতিমোহন সেন	—	জাতিভেদ।
গীতা সেনগুপ্ত	—	বিশ্ব রঙ্গালয় ও নাটক।
গীতা চট্টপাধ্যায়	—	বাংলা স্বদেশী গান।
গোপাল হালদার	—	'সংস্কৃতির বিশ্বরূপ'। 'সংস্কৃতির রূপান্তর'। 'বাঙালী সংস্কৃতির রূপ'।
গোলাম মুরশিদ	—	সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাটক।
গোলাম মোস্তাফা	—	ইসলাম প্রচার, ঢাকা।
জয়ন্ত গোস্বামী	—	সমাজচিত্রে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা প্রহসন।
জিয়া হায়দার	—	নাট্যবিষয়ক নিবন্ধ।
ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়	—	নাট্যতত্ত্ব বিচার।
ঐ	—	"দ্বিজেন্দ্রলাল-জীবন ও সাহিত্য"।
দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	—	শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রবন্ধ।
দেবনারায়ণ গুপ্ত	—	১০০ বছরের নাট্যপ্রসঙ্গ।
দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ	—	মধুসূদনের সাহিত্য প্রতিভা ও শিল্পী ব্যক্তিত্ব।
দেবকুমার রায় চৌধুরী	—	দ্বিজেন্দ্রলাল।
ধনঞ্জয় দাস মজুমদার	—	বঙ্গের অনন্ত সামন্ত চক্র ও ইসলাম রাষ্ট্রের ইতিহাস।
ধনঞ্জয় দাস (সম্পাদিত)	—	মাকর্সবাদী সাহিত্য বিতর্ক (২য় খণ্ড)।
নরহরি কবিরাজ	—	স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা।
নারায়ণ চৌধুরী (সম্পাদিত)	—	সংস্কৃতি অপসংস্কৃতি।
পবিত্র সরকার	—	নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ।
প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়	—	রবীন্দ্র জীবনী (১-২ খণ্ড)।
বদরুদ্দীন উমর	—	সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা।
বৈদ্যনাথ শীল	—	বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা।

বিনয় ঘোষ	—	'বাংলার বিদ্যুৎ সমাজ'। 'বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা'।
বিপানচন্দ্র	—	আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ।
বাসুদেব মোশেল	—	ভারতে ধর্মঘটের ইতিহাস।
ভবানী গোপাল সান্যাল	—	মাইকেল মধুসূদনের নাটক।
ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত	—	বাংলার ইতিহাস।
মন্মথ রায়	—	স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার নাটক ও নাট্যশালা।
মহঃ আব্দুল আউয়ান	—	মীর মোশারফের গদ্য রচনা।
মন্মথ মোহন বসু	—	বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ।
মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত)	—	থিয়েটার প্রসঙ্গে।
মাওলানা মোবারক করীম জওহর	—	কোরা-আন-শরীফ।
মুনীর চৌধুরী	—	তুলনা মূলক সমালোচনা।
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান	—	আধুনিক বাংলাকাব্যে হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক।
ঐ	—	আধুনিক বাংলা সাহিত্য।
মোহিত লাল মজুমদার	—	আধুনিক বাংলা সাহিত্য।
মৌলভী আব্দুল করীম	—	মুসলমান সমাজের শিক্ষা।
রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	—	বাংলা নাট্য নিয়ন্ত্রনের ইতিহাস
রমেশ চন্দ্র মজুমদার	—	বাংলাদেশের ইতিহাস (১-৪ খণ্ড)।
রফিক কাইসার	—	তিন পুরুষের রাজনীতি।
রশীদ-আল-ফারুকী	—	বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান।
শঙ্করীপ্রসাদ বসু	—	বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ (১-৫খণ্ড)।
শচীন সেনগুপ্ত	—	বাংলা নাটক ও নাট্যশালা।
শিবনাথ শাস্ত্রী	—	রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।
শিশির বসু	—	একশ বছরের বাংলা থিয়েটার।
সত্যজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়	—	দৃশ্য কাব্য পরিচয়।
শৈলেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (সংকলিত)	—	সংসদ বাংলা অভিধান।
সন্দীপ দত্ত	—	ভারতীয় সংস্কৃতি নিগ্রহের ইতিহাস।

স্বপন বসু — বাংলার নবচেতনার ইতিহাস।
সাধন কুমার ভট্টাচার্য — নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার (১-৪খণ্ড)।
সুকুমার সেন — বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-(১-৪খণ্ড), ইসলামী বাংলা সাহিত্য, নট-নাট্য নাটক।
সুনীতি কুমার চট্টপাধ্যায় — জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য।
সুনীল কুমার বসু — হিন্দু না মুসলিম?
সুরেশ চন্দ্র মৈত্র — বাংলা নাটকের বিবর্তন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঃ জীবনী ও সাহিত্য।
সুরজিৎ দাশগুপ্ত — ভারতবর্ষ ও ইসলাম, ইসলাম ও ভারত।
সুখময় মুখোপাধ্যায় — বাংলার মুসলিম অধিকারের আদি পর্ব।
ড. সুবোধ চৌধুরী — কবি ও নাট্যকার মনোমোহন বসু।
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য (সম্পাদিত) — বিনোদিনী দাসী ঃ আমার কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ।
সৌমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী — বাংলা ঐতিহাসিক নাটক সমালোচনা।
হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় — বঙ্গীয় শব্দকোষ (১-২খণ্ড)।
Muhammad A. Muhammad — 'Muslimes Religious Practice'.
Muhammad A. Muhammad — The Quram, Lebanan, 1980.
Hemendra Nath Das Gupta — The Indian Stage. (2nd Vol.) 1946
Manabendra Nath Roy — The Role of Islam History.
Rofiuddin Ahammed — The Bengal Muslim (1857-1960).
Jodunath Sarkar — The Histroy of Bengal (Mughal Priod). Patna-1977.
E. J. Brill's — First Encylopacdia of Islam. V-VI, New york 9187.
Thamas Patrick Huges — A dictionary of Islam. Delhi-1973.

বাংলা পত্রিকাপঞ্জী

'অরণি'	—	২৩শে জুন, ১৯৪৪।
'আনন্দবাজার পত্রিকা' (দৈনিক)	—	১৯.০২.১৯৮৯।
'ইতিহাস পত্রিকা'	—	৩য় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৬০।
'ইসলাম প্রচারক'	—	১৯০০, মার্চ-এপ্রিল; ১৯০৩, ডিসে.-জানু. ঃ সংখ্যা।
'এখন যেরকম'	—	সেপ্টেম্বর, ১৯৮২।
'কোরক'	—	শারদীয়, ১৯৮৭।
'গণশক্তি' (দৈনিক)	—	০৪. ০২. এবং ১০. ০৬. ১৯৯০।
'চতুরঙ্গ'	—	৫০ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৯৯০।
'জনযুদ্ধ'	—	১৩ই মে ১৯৪২।
'দেশ'	—	বিনোদন সংখ্যা, ১৯৮৯, বঙ্কিম সংখ্যা।
'নবনূর'	—	১৩১০ বৈশাখ — জৈষ্ঠ্য।
'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'	—	১৩২৭, ১৩২৮ সাল।
'বহুরূপী'	—	নবান্ন স্মারক, অক্টো: ১৯৬৯, মহর্ষি সংখ্যা, ১৯৭৭।
'বাংলা একাডেমী পত্রিকা'	—	২য় সংখ্যা, ১৩৭১, মাঘ-চৈত্র, ১৩৮৯।
'বঙ্গদর্শন'—(বঙ্কিম সম্পাদিত)	—	১৩৪৬ বঙ্গাব্দ।
'বিভাব'	—	শারদীয় সংখ্যা, ১৩৯৬।
'পশ্চিমবঙ্গ' (সাপ্তাহিক)	—	৯ই মে, ১৯৮৬।
'পরিচয়'	—	১৩৫১।
'প্রবাসী'	—	১৩১৭ কার্ত্তিক - চৈত্র।
'ভারতবর্ষ'	—	চৈত্র, ১৩২১, বৈশাখ - জৈষ্ঠ্য, ১৩২২।
'মধ্যস্থ'	—	১২৮১ জৈষ্ঠ্য - পৌষ সংখ্যা।
'মাসিক মোহাম্মদী'	—	১৩৪৭ বৈশাখ - কার্ত্তিক, ১৩৪৮ ফাল্গুন, ১৩৪৯ শ্রাবণ।
'শনিবারের চিঠি'	—	২৯ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা।
'সওগাত'	—	১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩২৫ মাঘ।
'সাহিত্য পত্রিকা'	—	১৩৭০ — ৭১।

সাপ্তাহিক বিচিত্রা — ঈদ সংখ্যা ১৯৭৬।
সাধারণী — ৭. ১২. ১৯৭৫।
সাধনা — ১৩০১ — ০২ সাল।
হাফেজ — জানু. ১৯৯৭।

সাক্ষাৎকার / আলোচনা

১। অধ্যাপক ড. রেজাউল করীম।

২। সৈয়দ আব্দুর রহমান ফেরদৌসী।

৩। সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ।

৪। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায।

৫। সুধী প্রধান।

৬। কবি আবুল হাসনাৎ।

৭। সনৎ গুপ্ত।

৮। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু।

৯। অধ্যাপক ড. বিমল কুমার মুখোপাধ্যায়।

১০। এবং সর্বক্ষেত্রের সহায়ক অধ্যাপক ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায।

পরিশিষ্ট / সময় সারণী

আলোচ্য সীমায় গৃহীত নাটকের নাম রচনাকালের সঙ্গে সমকালের ঘটনাবলীর একটা রূপরেখা রয়েছে পরিশিষ্ট অংশে। যে ঘটনাবলী সর্বত্র না হলেও অনেক নাটকের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়ে যায়। এ কারণেই তালিকার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে।

খ্রীষ্টাব্দ	রচিত/প্রকাশিত/অভিনীত নাটক	ঘটনা/ঘটনাবলী
১৮৫৮	'কলিকৌতুক'	সিপাহী বিদ্রোহ দমন, বিট্রিশ শাসন শুরু, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।
১৮৫৯-৬০	একেই কি বলে সভ্যতা? বুড় শালিকের ঘাড় রোঁ নীলদর্পণ	রয়টারের সংবাদ প্রদান সূচনা, নীলবিদ্রোহ, ধর্মঘট, ইণ্ডিয়ান পেনালকোডের উদ্ভব।
১৮৬৬	বিয়েপাগলা বুড়ো। সধবার একাদশী।	ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব, উড়িষ্যায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ-বাংলার সাহায্য, চৈত্রমাসে হিন্দুমেলার অধিবেশন, বোম্বাইয়ে প্রার্থনা সমাজ।
১৮৭২	জামাই বারিক।	'৭১ এ ওয়াহাবি আন্দোলন, তিন আইন পাশ, অনুর্দ্ধ ১৪ বছরের বালিকা বিবাহ নিষিদ্ধ।
১৮৭৩	পুরুবিক্রম।	'ভারত শ্রমজীবি' মাসিকের প্রকাশ।
১৮৭৫	বঙ্গের সুখাবসান, বসন্তকুমারী, সরোজিনী, জমিদার দর্পণ, ভারতে যবন, শরৎ সরোজিনী, বঙ্গের পুনরুদ্ধার, নগনলিনী, বীরনারী, সুরেন্দ্র বিনোদিনী, ভারতের সুখশশী যবন কবলে, পদ্মিনী, (মহেন্দ্র) ভারতবিজয়।	বিহারের দুর্ভিক্ষ ('৭৪), পাবনায় কৃষক বিদ্রোহ, রঙ্গমঞ্চে নারী অভিনেত্রী গ্রহণ, দাক্ষিণাত্যে কৃষক বিদ্রোহ, ইন্ডিয়ান লীগের প্রতিষ্ঠা।

খ্রীষ্টাব্দ	রচিত/প্রকাশিত/অভিনীত নাটক	ঘটনা/ঘটনাবলী
১৮৭৬	জয়পাল।	নাট্য নিয়ন্ত্রণ বিল, ইন্ডিয়ান অ্যাসো. প্রতিষ্ঠা, মাদ্রাজে. নেটিভ অ্যাসো. প্রতিষ্ঠা।
১৮৭৯	অশ্রুমতী।	অস্ত্রআইন, ভার্ণাকুলার প্রেস আইন।
১৮৮০	হামির।	কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত, পাঞ্জাবে শিখ আন্দোলন।
১৮৮১	কালাপাহাড় (হরিশ) আলাদীন, আনন্দরহো।	মাদ্রাজে মহাজন সভা, ভার্ণাকুলার প্রেস অ্যাক্ট প্রত্যাহার, ব্যাপক ধর্মঘট।
১৮৮২	'স্বপ্নময়ী'।	আনন্দমঠ বন্দেমাতরম প্রচার, হান্টার কমিশন নিয়োগ।
১৮৮৪	প্রকৃতির প্রতিশোধ।	শ্রীরামকৃষ্ণের 'চৈতন্যলীলা' দর্শন, বোম্বাইয়ে শ্রমিক আন্দোলন।
১৮৮৫	নিমাই সন্ন্যাস।	জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, প্রজাসত্ব আইন, ইলবার্ট বিল, প্রথম জাতীয় সম্মেলন।
১৮৮৯	কালাপাহাড় (গিরিশ)।	ইতিপূর্বে আয়কর আইন পাশ (৮৬), জাতীয় আন্দোলনের ক্রমবিকাশ।
১৮৯০	আনন্দময়।	সরকারী দমননীতির সূচনা, সরকারী কর্মীদের কং. অধিবেশনে যোগ নিষেধে সরকারী নির্দেশ।
১৮৯১	লয়লামজনু।	সহবাস সম্মতি আইন পাশ।
১৮৯২	আবুহোসেন।	ভারতীয় কাউন্সিল আইন, বিধানসভা আইন।

খ্রীষ্টাব্দ	রচিত/প্রকাশিত/অভিনীত নাটক	ঘটনা/ঘটনাবলী
১৮৯৩	বেনজীর বদরে মুনীর।	পুনায় গোবধ নিবারণ সমিতি, জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন বন্ধ।
১৮৯৭	আলিবাবা।	রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা।
১৮৯৯	আবুলকাশেম, জুলিয়া।	নাসিকে মিত্রমেলা।
১৯০১	মনের মতন।	যতীন্দ্রনাথ কর্তৃক অমরেন্দ্রনাথকে অভিনয়ের স্বীকৃতিতে স্বর্ণপদক প্রদান, নবপর্যায়ে বঙ্গদর্শনের প্রকাশ।
১৯০২	ভ্রান্তি, বেদৌরা।	বিবেকানন্দেব দেহত্যাগ।
১৯০৩	প্রতাপআদিত্য, রঘুবীর।	ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্সর্ফোড ও কেমব্রিজে বক্তৃতা।
১৯০৫	রাণাপ্রতাপ সিংহ।	বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, রাখীবন্ধন উৎসব।
১৯০৬	সৎনাম, সিরাজদৌল্লা (গিরিশ), পদ্মিনী (ক্ষীরোদ), দুর্গাদাস, নূরজাহান, সোরাব রুস্তম।	ঢাকায় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা।
১৯০৭	মীরকাশিম (গিরিশ), ছত্রপতি শিবাজী, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, চাঁদবিবি।	কং. দ্বিধাবিভক্ত, ময়মনসিংহ-জামালপুরে দাঙ্গা, পাবনায় মুসলীমের ফতেয়া জারি।
১৯০৮	মেবারপতন, মুকুট।	লর্ড মর্লের পৃথক লীগের প্রতিনিধিত্ব স্বীকার।
১৯০৯	সাজাহান, প্রায়শ্চিত্ত।	মর্লে-মিন্টো শাসন সংস্কার, মুসলিমের পৃথক নির্বাচনে অধিকার।
১৯১০	বাঙ্গালার মসনদ।	পেশবারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, প্রেস আইন পাশ, বাংলার অন্তরায়িত নেতাদের মুক্তি।

খ্রীষ্টাব্দ	রচিত/প্রকাশিত/অভিনীত নাটক	ঘটনা/ঘটনাবলী
১৯১১	পলিন।	বঙ্গভঙ্গ রদ, কলকাতা থেকে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তর, ১৭ জন গভর্ণরের শাসনে বাংলা, বোম্বাইয়ে দাঙ্গা।
১৯১২	মিডিয়া, খাঁজাহান।	দিল্লীতে হার্ডিং- এর হাতির উপর বোমা নিক্ষেপ।
১৯১৩	রূপের ডালি।	রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তি।
১৯১৫	আহেরিয়া, বাদশাজাদী।	কংগ্রেসে মডারেট্দের প্রাধান্য, বাঘা যতীন নিহত, গান্ধীর ভারতে আগমণ, ভারত রক্ষা আইন।
১৯১৭	বঙ্গে রাঠোর।	কংগ্রেস-লীগ চুক্তি, ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মন্ত্রীর প্রথম ভারতে পদার্পণ।
১৯২০	বাবরের ব্রতগ্রহণ।	কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন, বোম্বাইএ খিলাফত আন্দোলন।
১৯২:	আলমগীর, অযোধ্যার বেগম।	রাওলাট আইন, জালিয়ানওয়া-লাবাগ হত্যাকান্ড, অধ্যাপনা ছেড়ে শিশির ভাদুড়ীর নাটকে যোগদান, প্রিন্স- অব- ওয়েলস্ এর ভারতে আগমণ।
১৯২২	আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপ।	খিলাফৎ আন্দোলন (২১-২২) অসহযোগ আন্দোলন, ১৯২২-২৭-এ কলকাতায় দাঙ্গা।
১৯২৪	ইরানের রাণী।	ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, কানপুরে ষড়যন্ত্র মামলা, দিল্লীতে গান্ধীর অনশন, হিন্দুসভা গঠন।

খ্রীষ্টাব্দ	রচিত/প্রকাশিত/অভিনীত নাটক	ঘটনা/ঘটনাবলী
১৯২৫	গোলকুণ্ডা।	দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দল প্রতিষ্ঠা।
১৯২৭	ঝিলিমিলি।	সাইমন কমিশন।
১৯২৮	শিল্পী, পুতুলের বিয়ে, ঈদ, শ্রীমন্ত।	কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা।
১৯৩৪	মারাঠামোগল।	১৯২৯-৩৪ মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব, আইন অমান্য, গান্ধী আরউইন চুক্তি, গোলটেবিল বৈঠক।
১৯৩৫	কবির বিড়ম্বনা, ভাই ভাই, বোরকা, প্রগতি, আবুল হাসান।	সংবিধান রচিত, ভারত শাসন আইন, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা বিধি রহিত, ঋণ শালিসী বোর্ড আইন।
১৯৩৮	গৈরিক পতাকা, সিরাজদ্দৌলা (শচীন), উদ্ধার, মীরকাশিম (মন্মথ)।	জিন্নার ১১ দফা দাবী, আব্দুল লতিফের মুসলিম সংস্কৃতি ও অধিকার রক্ষার পুস্তিকা প্রচার।
১৯৩৯	কালাম আতাতুর্ক।	মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণ খসড়া শাসনতন্ত্রের প্রস্তাব পেশ, লীগের পাকিস্থান প্রস্তাব ('৪০)
১৯৪১	যুগসন্ধি।	'জননাট্য সংঘ' তৈরী, 'ফ্যাসী বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ' বঙ্গীয় মহাজনী আইন।
১৯৪৩	জবানবন্দী, ক্ষণস্বপ্ন, বসুন্ধরা।	চাষীআইন সংশোধনী, ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। IPTA - এর প্রতিষ্ঠা।
১৯৪৪	নবান্ন, হোমিওপ্যাথি, দুঃখীর ঈমান।	নবনাট্য আন্দোলনের সূত্রপাত।
১৯৪৫	স্পেন বিজয়ী মূসা।	১৯৪৫-৪৬ ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর আন্দোলন, বোম্বাই-এ নৌ বিদ্রোহ, ক্যাবিনেট মিশন।

খ্রীষ্টাব্দ	রচিত/প্রকাশিত/অভিনীত নাটক	ঘটনা/ঘটনাবলী
১৯৪৬	তরঙ্গ।	নোয়াখালি, কলকাতায় দাঙ্গা, বিধান পরিষদ নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়।
১৯৪৭	বাস্তুভিটা, মানুষ, বে শরিয়তি।	মাউন্টব্যাটেনের ঘোষণা পাকিস্থান সৃষ্টি, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত-খ্রীষ্টান আইন বিল পাশ, দেশ বিভাগ, ১৫ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা লাভ।
১৯৪৮	মসনদ, কাফেলা, ছেঁড়াতার, মশাল।	মহাত্মা গান্ধী গুলিতে নিহত।
১৯৫০	নষ্টছেলে, মাষ্টারেব মেয়ে।	ভারতের সংবিধান গৃহীত।